

থ্রি
ডেইজ অভ

হ্যাপিনেস

সুগারু মিয়াকি

অনুবাদঃ নজরুল ইসলাম



থ্রি ডেইজ অভ হ্যাপিনেস

সুগারু মিয়াকি

অনুবাদঃ নজরুল ইসলাম

চ্যাপ্টার ১ : অ্যা প্রমিজ ফর টেন ইয়ার'স টাইম

আয়ুষ্কাল বিক্রি করা যায়, এই কথাটা প্রথমবারের মতো জানার পরে, আমার এলিমেন্টারি স্কুলে শেখানো নৈতিক শিক্ষার কথা মনে পড়ে গেল।

আমাদের বয়স ছিল তখন দশ বছর। কিভাবে নিজেদের ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবো সেটা আমাদের মাথায় ছিল না। সুতরাং আমাদের থেডের শিক্ষিকা, বিশের শেষের দিকের বয়সের একজন মহিলা, আমাদের এমন কিছু একটা জিজ্ঞেস করলঃ

“এতদিন তোমরা জানতে, মানুষের জীবন কোনো কিছুর বিনিময়েই বদলানো যায় না। মানুষের জীবন সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান। এখন ধরো, যদি জীবনের বিনিময়ে আর্থিক মূল্য ধরা হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের কী মনে হয়। কত টাকা মূল্য হওয়া উচিত?”

উনি এরপরে চিন্তিত ভঙ্গিতে চুপ করে রইলেন। ব্যক্তিগতভাবে, আমি মনে মনে ভেবেছিলাম উনার প্রশ্ন করার ধরনটা একেবারেই অযৌক্তিক। উনার হাতে তখনো চক ধরা। ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন ছাত্রদের দিকে পিঠ করে। প্রায় বিশ সেকেন্ডের মতো চুপ করে ছিলেন তিনি।

এই যখন পরিস্থিতি, ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহের সাথে প্রশ্নটা নিয়ে ক্লাসরুম গরম করে ফেলল। তাদের অনেকেই সুন্দরী এই তরুণী শিক্ষিকাকে পছন্দ করতো। সুতরাং তারা এমন কোনো ভালো কথা বলতে চাইল যাতে তাদের প্রশংসা করা হয়।

একটা চালাক চতুর ছেলে হাত তুলল।

“আমি একবার একটা বইতে পড়েছিলাম, একজন চাকুরীজীবীর জীবনযাপনের খরচ প্রায় দুইশ মিলিয়ন থেকে তিনশ’ মিলিয়ন ইয়েন। তাই আমার মনে হয় একজন সাধারণ মানুষের মূল্য এর আশপাশেই হবে।”

অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী বিস্ময়সূচক ধ্বনি করল। বাকি অর্ধেক কিছুটা বিরক্ত

এবং উদাস হয়ে গেল। তবে বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই চালাক ছেলেটাকে ঘৃণা করা শুরু করল।

শিক্ষিকা হেসে মাথা নাড়লেন। “বিষয়টা মোটামুটি সত্যি। সম্ভবত বয়স্করাও একইরকম উত্তর দিতো। একটা উত্তর হতে পারে ‘এক জীবনে যে পরিমাণ টাকাপয়সা খরচ করা হয় সেটা জীবনের মূল্যের সমান।’ কিন্তু আমি চাই তোমরা এই চিন্তাধারা থেকে সরে আসো। রূপক অর্থে ধরা যাক। সচরাচর আমরা যে রূপক অর্থ ধরি।”

বোর্ডে নীল চক দিয়ে শিক্ষিকার আঁকা রেখাটি যে কী সেটা কেউই বুঝতে পারল না। এটাকে মানুষ হিসাবে ধরে নেওয়া যায় অথবা রাস্তার গামের পৌঁচও ধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু এটাই ছিল উনার আসল উদ্দেশ্য।

“এই ‘অজানা সৃষ্টি’র কাছে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি টাকা আছে। এটা মানুষের মতো লম্বা সময় বাঁচতে চায়। ফলে সেটা অন্য কারো জীবন কিনে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ধরো একদিন তুমি সেই কিছু একটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে। তখন সেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘এই যে, তুমি কি আমার কাছে তোমার আয়ুষ্কালটা বিক্রি করবে?’”

উনি গল্পটা সেখানেই কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দিলেন।

“যদি আমি সেটা বিক্রি করি, তাহলে কী ঘটবে?” একজন বেশ সিরিয়াস ধরনের ছেলে হাত তুলে জিজ্ঞেস করল।

“নিশ্চিতভাবেই, তুমি মারা যাবে।” শিক্ষিকা মজা করে উত্তর দিলো। “তুমি কিছু সময়ের জন্য সেই কিছু একটাকে মানা করে দিলে। কিন্তু ওটা তোমার পেছনে লেগে রইল। ঠিক আছে, শুধু অর্ধেকটা বিক্রি করলে তেমন কিছু হবে না। শুধুমাত্র তোমার ষাট বছর থেকে ত্রিশ বছর বিক্রি করতে চাও নাকি? জানোই তো, আমার সত্যিই খুব দরকার।

আমার মনে পড়ে থুতনির নিচে হাত দিয়ে আমি উনার কথা শুনতে শুনতে ভেবে নিয়েছিলাম, “আমি ধরতে পেরেছি”। অবশ্যই, যদি অজানা সৃষ্টিটা এরকম করে তাহলে, আমি সত্যিই বিক্রি করার মন-মানসিকতায় থাকবো। আমার সীমাবদ্ধতা আছে। আপাতভাবে বেশ হুঁপুট ছোট জীবন, দীর্ঘ এবং অভাবের জীবন থেকে অনেক ভালো।

“এখন, প্রশ্নে আসি। এই কিছু একটা যা কিনা মানুষের মতো জীবনযাপন

করতে চায়, তার তো তোমার বাকি জীবনের একটা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, তাই না? আমি আগেই বলে দিচ্ছি, এর কোনো সঠিক উত্তর নেই। আমি শুধু জানতে চাই তোমরা কী ভাবছ এবং কিভাবে তোমরা সে-সিদ্ধান্তে এলে। এখন তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।”

সম্পূর্ণ ক্লাসরুম আলাপ-আলোচনা মুখোর হয়ে উঠল। আমি এসবের কোনোটাতেই যুক্ত হলাম না। স্পষ্ট করে বললে, যুক্ত হতে পারলাম না।

কারণ, আয়ুষ্কালের ব্যয় নিয়ে উত্তর দেওয়া সেই ছেলেটির মতো, আমিও ছিলাম ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ

আমি ভান করলাম, আমি এ-বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী নই; তাই সময় অতিবাহিত করার জন্য অপেক্ষা করছি।

আমার সামনে বসা একটা দলকে বলতে শুনলাম, “যদি একটা সম্পূর্ণ জীবন তিনশো মিলিয়ন ইয়েন হয়...”

আমি ভাবতে লাগলাম, যদি সেটা তিনশ’ মিলিয়ন হয়ে থাকে, তাহলে... আমার দাম যদি তিন বিলিয়ন হয় তাহলে এটাউদ্ভট লাগবে না।

আলোচনার ফলাফল কী হয়েছিল সেটা আমি মনে করতে পারছি না। তবে এটুকু নিশ্চিত যে, শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য ছিল সেটা।

এলিমেন্টারি স্কুলের বাচ্চারা সামলাতে পারবে এমন কোনো সহজ বিষয় ছিল না সেটা। আর যদি কোনোভাবে হাই স্কুলের কতগুলো ছাত্র-ছাত্রীকে এর সাথে যোগ করে দেওয়া হয়, ওরা সম্ভবত এর সাথে সেক্স ঢুকিয়ে ফেলবে।

স্পষ্টভাবে একটা মেয়ের কথা মনে আছে আমার। যে কিনা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ভীষণভাবে জোরাজুরি করতে লাগল, “কিছুতেই একটা জীবনের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।”

আমি ভাবলাম, হ্যাঁ, কেউ যদি মেয়েটার মতো জীবনযাপনের সুযোগটা কাজে লাগিয়ে থাকে তবে আমি সেটাকে কোনো মূল্য দিবো না। হয়তো বা সত্যি-সত্যিই ক্ষতিপূরণের টাকাও চাইতাম।

প্রায় প্রতিটি ক্লাসেই রসিকতা করে এমন ধরনের ভাঁড় কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবেই; যে কিনা অন্যদের মতো করে একই ধারায় চিন্তা করছে। “আমি যদি আমার জীবনের মতো ঠিক একই রকম জীবনযাপনের জন্য নিজেকে বিক্রি করি, তাহলে কেউই এমনকি তিনশ’ ইয়েনও দিবে না, তাই না?” অন্যদের হাসিয়ে ছেলেটা বলল।

আমি ওর চিন্তা-ধারার সাথে একমত। ছেলেটা জানে আশপাশের গম্ভীর গর্দভগুলোর চেয়ে ওর দাম বেশি হবে, তবুও বিনয়ীর হাসি হাসছে। এই ব্যাপারটা আমার কাছে বিরক্তিকর লাগছে।

বলে রাখি, শিক্ষিকা সেদিন বলেছিল এর কোনো সঠিক উত্তর নেই। কিন্তু এক প্রকার সঠিক উত্তর সত্যিই আছে।

কারণ, দশ বছর পরে, আমার বয়স যখন বিশ, সত্যি বলতে, আমি নিজেই আমার আয়ুষ্কাল বিক্রি করে মূল্য পেয়েছিলাম।

যখন ছোট ছিলাম, আমি ভাবতাম বড় হয়ে বিখ্যাত কেউ একজন হবো। আমি ভেবেছিলাম আমার যুগের বাকি সবার চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে ছিলাম আমি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যে ছোট নরকে আমি বাস করতাম তাতে বাবা-মায়েরা ছিল বিরক্তিকর এবং অকর্মণ্য। যারা বিরক্তিকর বাচ্চাকাচ্চা জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। তাদের অকর্মণ্য ছেলেমেয়েরাই হচ্ছে আদর্শ।

এটাই আমাকে এই ভুল ধারণার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

আমার চারপাশের ছেলে-মেয়েদের আমি নিচু চোখে দেখতাম। বলার মতো কোনো গুণ কিংবা ভদ্রতা আমার ছিল না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই, আমার ক্লাসমেটরা আমার প্রতি সহানুভূতিশীলও ছিল না।

দল থেকে আমাকে বের করে দেওয়া তেমন দুর্লভ কিছু ছিল না। অথবা আমার জিনিসপত্র চুরি করা কিংবা লুকিয়ে রাখা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

টেস্টে আমি সবসময়ই নিখুঁত স্কোর করতাম। এক্ষেত্রে আমিই একমাত্র ছিলাম না। হিমেনোও নিখুঁত স্কোর করতো। হ্যাঁ, উপরে বলা সেই “চালাক চতুর” মেয়েটাই হচ্ছে হিমেনো।

ওকে অশেষ ধন্যবাদ, আমি সত্যিকারের এক নাম্বার হতে পারিনি। সেইসাথে আমাকেও ধন্যবাদ, হিমেনোও সত্যিকারের এক নাম্বার হতে পারেনি।

সুতরাং, অন্ততপক্ষে উপরে উপরে আমরা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বা এরকম কিছু একটা ছিলাম। আমরা একে অন্যকে পিছনে ফেলে আগে বাড়ার চিন্তা করতাম।

অন্যদিক দিয়ে দেখলে, আমরা যে একে অন্যকে ভালো বুঝতে পারি এটা ছিল তার প্রমাণ। আমাকে কোনো প্রকার ভুল না বুঝে আমি কী বলতে চাচ্ছি; সেটা একমাত্র ও-ই সবসময় বুঝতে পারতো। হয়তোবা এর বিপরীতটাও সত্যি

ছিল।

একারণেই, শেষ পর্যন্ত আমরা দুজনই সবসময় একসাথে থাকতাম।

গোড়া থেকে বলতে গেলে, আমাদের দুজনেরই বাসা ছিল একদম কাছাকাছি। সুতরাং, শৈশব থেকেই আমরা প্রায়ই একসাথে খেলতাম। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে “বাল্যবন্ধু” শব্দটাই উপযুক্ত।

আমাদের বাবা-মায়েরা ছিল একে অপরের বন্ধু। এলিমেন্টারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত, আমার বাবা-মা ব্যস্ত থাকলে ওর বাসায় আমাকে দেখাশোনা করার জন্য রেখে যাওয়া হতো। আর ওর বাবা-মা ব্যস্ত থাকলে হিমনোকে আমার বাসায় রেখে যাওয়া হতো।

যদিও আমরা একে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখতাম। তবে আমাদের বাবা-মায়ের সামনে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করার মৌন সম্মতিতে পৌঁছেছিলাম।

সত্যি বলতে, বলার মতো তেমন কোনো কারণও ছিল না। আমরা কেবল ভেবেছিলাম এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। যদিও টেবিলের তলায় আমাদের সম্পর্ক ছিল ঠ্যাঙাঠেঙি এবং খোঁচাখুঁচির। অন্ততপক্ষে আমাদের বাবা-মায়েরা যখন সামনে থাকতো, আমরা ছিলাম ছোটবেলার বন্ধু।

হয়তোবা আমরা সত্যিই তাই ছিলাম।

হিমনোকে ঠিক আমার মতো একই কারণে ক্লাসের কেউ পছন্দ করতো না। ও নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করতো। সেজন্য ওর আশপাশের সবাইকে নিচু চোখে দেখতো। যেহেতু আচরণটা খুবই অশোভন ছিল; তাই ক্লাসরুমে ওকে এড়িয়ে যাওয়া হতো।

আমার এবং হিমনোর বাড়ি একটা পাহাড়ের চূড়ায় ঠিক পাশাপাশি ছিল। অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ির চেয়ে অনেক দূরে।

ব্যাপারটা আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। অন্যান্যদের সাথে বাইরে না মিশে, বাসায় ঘরকুণো হয়ে বসে থাকার জন্য দূরত্বটাই আমাদের জন্য ছুতা হিসাবে কাজ করতো।

একমাত্র চরম মাত্রায় বিরক্ত হলেই কেবল ঠেকায় পড়ে আমরা একে অন্যের বাসায় যেতাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে আভাস দিতাম “আমি এখানে এসেছি মানে এই না আমি আসতে চেয়েছি।”

সামার ফেস্টিভ্যাল এবং ক্রিসমাসের মতো দিনগুলোতে, আমাদের বাবা-

মায়েদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে, আমরা বাইরে বের হতাম। একসাথে সময় নষ্ট করতাম। প্যারেন্ট-চাইল্ড এন্টিভিটি এবং ক্লাস ভিজিটের সময় আমরা মিলেমিশে চলার ভান করে যেতাম।

আমরা ভান করতাম যেন ব্যাপারটা ঠিক এমন “আমরা দুজনে একসাথে থাকতে পছন্দ করি, তাই আমরা নিজ ইচ্ছায় এসব করছি।” আমরা তখন ভাবতাম; অন্ততপক্ষে অন্যান্য ক্যাবলা বন্ধুদের চেয়ে ঘৃণ্য বাল্যবন্ধুর সাথে থাকাই ভালো।

আমাদের কাছে, এলিমেন্টারি স্কুল ছিল এমন একটা জায়গা যেখানে আমাদের জন্য প্রেরণা মরে ভূত হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই আমাদের দু’জনকে সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা হতো। আর আমাদের ক্লাস কাউন্সিল করতে হতো।

যে মহিলা আমাদের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ গ্রেড পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন; উনার এই ধরনের সমস্যা সম্পর্কে ধারণা ছিল। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা-মা’কে ফোন না করে থাকতে পারতেন; ততক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে থাকতেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের যে বুলিং করা হচ্ছে সেটা যদি আমাদের বাবা-মায়েরা জেনেও যায়, তবে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। আমাদের শিক্ষিকা বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের অন্তত একটা নিজস্ব জগৎ থাকা প্রয়োজন যেখানে আমাদের প্রতি করা নিষ্ঠুর আচরণ ভুলে যেতে পারি আমরা।

কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন, হিমেনো এবং আমি সবসময়ই বিরক্ত থাকতাম। বাকি সবাইও মোটামুটিভাবে আমাদের প্রতি বিরক্ত ছিল। যেহেতু “বিরক্ত হওয়া” ছিল ওদের সাথে আমাদের একমাত্র সম্পর্ক

আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল; আমাদের ভাঙারে সুন্দর হাসি ছিল না। সবাই একসাথে হাসি দেওয়ার “সময়”টা কিছুতেই ঠিকমতো ধরতে পারতাম না আমি।

যখনই আমি মুখের মাংসপেশি নড়াচড়া করানোর চেষ্টা করতাম, আমার অন্তরের একদম ভিতর থেকে কোনো একটা সুর কেটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেতাম। হিমেনোও নিশ্চয় এরকমই অনুভব করে থাকবে।

এমনকি কোনো কিছুর অনুমোদনের হাসি দেওয়ার সময়ও, আমরা আমাদের চোখের দ্রুপ পর্যন্ত নাড়াতাম না। না, বরং বলা ভালো, নাড়াতে পারতাম না।

রুক্ষ এবং দাম্ভিকতার জন্য আমাদের উপহাস করা হতো। সত্যিই আমরা রুক্ষ ছিলাম। একইসাথে দাম্ভিকও ছিলাম।

কিন্তু অন্যদের সাথে হাসতে না পারাটা আমাদের একমাত্র ভুল ছিল না। হিমেনো এবং আমি একদম গোঁড়া থেকেই ভুল পথে ছিলাম। যেন ভুল ঋতুতে ভুল ফুল ফোটার চেষ্টা করছে।

সেই গ্রীষ্মে যখন আমার দশ বছর বয়স হয়েছিল। হিমেনোর কাঁধে ছিল প্রায় এক ডজনবার আবর্জনায় ফেলে দেওয়ার মতো ব্যাগটা। আমি পরে ছিলাম কেচি দিয়ে অনেকবার কাটা জুতাটা। লালচে বর্ণ ধারণ করা অসুগত সূর্যটা দেখতে দেখতে আমরা মঠের সিঁড়িতে বসে কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

যেখানে আমরা বসেছিলাম, সেখান থেকে নিচে ফেস্টিভ্যালের মাঠ দেখা যাচ্ছিল। মঠে আসার সরু রাস্তাটা কাঁট দিয়ে বোঝাই ছিল। দুই সারি কাগজের লণ্ঠন রাস্তার লাইটের মতো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। লাল আলোতে চারপাশ আলোকিত হয়ে ছিল।

পাশ কাটিয়ে যাওয়া সবাইকেই হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। একারণেই আমরা নিচে যেতে পারতাম না।

আমরা দুজনেই চুপ করে ছিলাম। কারণ, আমরা জানতাম যদি আমরা মুখ খুলি, আমাদের কণ্ঠ আন্তে-আন্তে মিইয়ে যাবে। ধৈর্যসহকারে, দৃঢ়ভাবে আমাদের মুখ বন্ধ রেখে চুপ করে বসে রইলাম।

হিমেনো এবং আমি “কিছু একটা”র জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যা আমাদের অস্তিত্বকে মেনে নিবে এবং আমাদের সম্পূর্ণভাবে বুঝবে।

যেহেতু আমরা এমন একটা মঠে ছিলাম যার আশাপাশে অবিরাম ঘুঘুরে পোকা ডেকে চলেছে। তাই আমাদের প্রার্থনা করার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না।

সূর্যটা অর্ধেকের মতো অস্ত গিয়েছে। এমন সময় হিমেনো হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে স্কাট থেকে ময়লা পরিষ্কার করে সোজা সামনের দিকে তাকাল।

“আমাদের ভবিষ্যৎ দারুণ হবে” ওর মোলায়েম কণ্ঠে বলল। শুনে মনে হচ্ছিল ও এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছে যা কিনা এইমাত্র ও বুঝতে পেরেছে।

“...ঠিক কতটুকু সামনের ভবিষ্যতের কথা বলছি আমরা?” আমি জিজ্ঞেস

করলাম।

“অত সামনেও না। কিন্তু আবার খুব বেশি দূরেও না। সম্ভবত, এই ধরো দশ বছর।”

“দশ বছর পরে” আমি পুনরাবৃত্তি করলাম। “তখন আমাদের বিশ হবে।”

দশ বছর বয়স্ক আমাদের কাছে, বিশ বছর বয়স ছিল সত্যি বেড়ে ওঠার মতো বয়স। সুতরাং আমি ধরে নিলাম হিমেনোর দাবিতে কিছুটা সত্যতা আছে।

ও বলে যেতে লাগল, “হ্যাঁ, সেই ‘কিছু একটা’ অবশ্যই গ্রীষ্মে ঘটবে। আজ থেকে দশ বছর পরের গ্রীষ্মে আমাদের ভাগ্যে খুব ভালো কিছু একটা ঘটবে; আর তখন বেঁচে থাকার জন্য আমরা সত্যিই আনন্দ অনুভব করবো। আমরা বড়লোক আর বিখ্যাত হবো। এলিমেন্টারি স্কুলের দিকে পিছন ফিরে তাকালে, আমরা বলবো... ‘এই স্কুল আমাদের কিছুই দেয়নি। সব ছাত্র-ছাত্রীরা একদম নির্বোধ। এখান থেকে এমনকি ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতোও কিছু ছিল না। সত্যিই খুব বাজে এলিমেন্টারি স্কুল।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্কুলটা তো সত্যিই কতগুলো নির্বোধ দিয়ে ঠাসা। সত্যি খুব ফালতু স্কুল” আমি বললাম।

সেসময়ে এই দৃষ্টিকোণটা আমাদের জন্য উপন্যাসের মতো ছিল। একজন গ্রেডের ছাত্রের জন্য তাদের স্কুলই তাদের দুনিয়া। এর আগপিছু কিছু চিন্তা করাও যেত না।

“সুতরাং দশ বছরের মধ্যে আমাদের অনেক ধনী এবং বিখ্যাত হতে হবে। এতটাই বিখ্যাত যে আমাদের সহপাঠীদের ঈর্ষায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।”

“যাতে ঈর্ষায় ওরা ওদের ঠোঁট কামড়ে ধরে” আমি একমত হলাম।

“যদি ওরা সেটা না করে, তবে সেটার গুরুত্ব থাকবে না।” ও হাসল।

আমি এটাকে আশ্বাসের বাণী হিসাবে চিন্তা করিনি। যে মুহূর্তে কথাটা হিমেনো’র মুখ থেকে বের হয়েছে, আমি প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম এটাই আমাদের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। এটা অনেকটা ভবিষ্যৎবাণীর মতো মনে হতে লাগল।

হয়তো বা যেরকম বলা হচ্ছে সেরকম বিখ্যাত কেউ হবো না আমরা। কিন্তু দশ বছর পরে, আমরা ওদের পেছনে ফেলে দিবো। আমাদের সাথে এরকম ব্যবহারের জন্য ওরা কবর পর্যন্ত অনুতাপ করবে।

“... তবুও, বিশ বছর হওয়া নিশ্চয় দারুণ কিছুই হবে” অস্তগত সূর্যের

দিকে তাকিয়ে এবং হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে হিমেনো বলল। “দশ বছর পরে বিশ...”

“আমরা ড্রিঙ্ক করতে পারবো। সিগারেট ফুঁকতে পারবো। আর বিয়ে করতে পারবো... দাঁড়াও, দাঁড়াও এটা তো আরও আগেই করা যায়” আমি বললাম।

“ঠিক, মেয়েরা ষোলো বছর বয়সেই বিয়ে করতে পারে।”

“আর ছেলেরা আঠারো বছর বয়সে... কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি কখনই বিয়ে করতে পারবো না।”

“কেন?”

“আমি পছন্দ করি না এমন জিনিসের সংখ্যা অনেক। এই পৃথিবীতে ঘটে চলেছে এমন অনেক জিনিস আছে যা আমার পছন্দ না। তো আমার মনে হয় না আমি বিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারবো।”

“হুহ, হ্যাঁ। আমার ভাগ্যেও মনে হয় একই ঘটনা ঘটবে।” হিমেনো মাথা নিচু করে বলল।

সূর্যাস্তে রঙিন হওয়ার কারণে ওর মুখটা স্বাভাবিকের চেয়ে অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে আরও বেশি পরিণত, কিন্তু একই সাথে আরও বেশি ভঙ্গুর।

“...শোনো, তাহলে” হিমেনো বলল, আমার চোখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে। কিন্তু দ্রুতই ও চোখ সরিয়ে নিলো। “বিশ বছর বয়সে আমরা যখন বিখ্যাত হয়ে যাবো... যদি, লজ্জাজনকভাবে এখনকার মতো অবস্থায় থাকি। বিয়ে করার মতো কাউকে খুঁজে না পাই...” ও ধীরে-ধীরে কাশতে লাগল। “যদি এমন হয় আমাদের নিজেদের ছাড়া আর কেউই নেই, তাহলে তুমি কি চাও আমরা একসাথ হই?”

“কী বলছ তুমি?” আমি ভদ্রভাবে উত্তর দিলাম।

“...ঠাট্টা করলাম। ভুলে যাও” হিমেনো হাসল। যেন সে কথাটা এড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। “শুধু নিজেই এই কথাটা শুনতে চেয়েছিলাম। এমন না যে আমার কোনো গতি হবে না।”

তাহলে ঠিক আছে, আমি হাসলাম।

কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা শুনতে বেকুবের মতো মনে হবে; যদিও হিমেনো এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলাম। আমি সবসময়ই এই প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখেছিলাম। এমনকি মোটামুটি চলনসই কোনো মেয়ে যদি আমার প্রতি অনুরাগ দেখাতোও, তবুও আমি ওদের ফিরিয়ে দিতাম। মিডেল স্কুলে, হাই স্কুলে,

এমনকি কলেজেও।

যাতে আবার যখন ওর সাথে আমার দেখা হবে, আমি যাতে ওকে দেখাতে পারি, আমি এখনোও “আগের মতোই আছি।”

হ্যাঁ, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে। আমিও জানি ব্যাপারটা নির্বোধের মতো হয়ে যাচ্ছে।

সেসময়ের পর থেকে দশ বছর হয়ে গিয়েছে।

এখন যদি পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার মনে হয় সেটা ছিল চমৎকার সময়। ঠিক ওই সময়ের মতো করে।

চ্যাপ্টার ২ : দ্য বিগিনিং অভ দ্য এন্ড

সেদিনের মতো উনিশতমবার; মাথা ঝাঁকিয়ে বো করে “আমি দুঃখিত” বলার পর, আমার মাথা ঘুরতে লাগল। মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারালাম তৎক্ষণাৎ।

এটা ঘটেছিল আমার বিয়ার গার্ডেনের পার্ট-টাইম জবের সময়। কারণটা ছিল স্পষ্ট। যে কেউই গনগনে সূর্যের নিচে এত অল্প আহার করে কাজ করলে জ্ঞান হারাতে বাধ্য।

নিজেকে কোনোরকমে অ্যাপার্টমেন্টে টেনেটুনে আনার পর, আমার চোখ এমনভাবে ব্যথা করতে লাগল; যেন ওগুলো উপড়ে ফেলে হয়েছিল। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত আমাকে হাসপাতালে যেতেই হলো।

ইমার্জেন্সি ক্লিনিকে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করতে আমার ওয়ালেটের উপর দিয়ে আরেকটা ঝড় গেল। তার উপর, আমার বস আমাকে বলল কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে।

আমি জানি আমাকে খরচ কমাতে হবে। কিন্তু আর কিভাবে খরচ কমাতে পারি সে বিষয়ে কোনো ধারণাই নেই আমার।

ঠিক কবে মাংস খেয়েছিলাম আমার মনে নেই। প্রায় চার মাস ধরে চুল কাটাইনি। গত শীতে কোট টা কেনার পর আর কোনো কেনাকাটা করিনি। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে কারও সাথে দেখা পর্যন্ত করতে যাইনি। বাবা-মায়ের প্রতি নির্ভর করার কোনো উপায় নেই, সুতরাং আমাকে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

বই এবং সিডি হাতছাড়া করতে আমার অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল। এগুলো সবগুলোই অনেক যাচাই বাছাইয়ের পরে সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিলাম, কিন্তু আমার অ্যাপার্টমেন্টের এগুলোই একমাত্র বস্তু; যা আমাকে কিছু টাকা-পয়সা এনে দিতে পারে। আমার এমনকি কম্পিউটার অথবা টিভিও নেই।

সিদ্ধান্ত নিলাম সবগুলো সিডিকে বিদায় জানানোর আগে আরেকবার শুনে নিবো। হেডফোন কানে দিয়ে, ম্যাটের উপরে শুয়ে প্লা বাটনে চাপ দিলাম।

সেকেডহ্যান্ড দোকান থেকে কেনা নীল ব্লেডের ফ্যানটা চালু করে দিয়ে, এক কাপ ঠান্ডা পানির জন্য আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গেলাম।

কলেজে ওঠার পর এই প্রথমবারের মতো কলেজ ফাঁকি দিচ্ছি। কিন্তু কারোই আমার অনুপস্থিতিতে কোনো পরোয়া নেই। ওরা কেউই হয়তো খেয়ালই করবে না আমি যে আজকে যাইনি।

অ্যালবামের পর অ্যালবাম আমার ডান পাশের টাওয়ার থেকে বাম পাশের টাওয়ারে স্থানান্তরিত হতে লাগল।

এটা ছিল গ্রীষ্মকাল, আর আমার বয়স ছিল বিশ বছর। কিন্তু পল নিজানের মতো, আমি কাউকে এ-কথা বলতে দিবো না এটা তোমার জীবনের সেরা সময়।

“আজ থেকে দশ বছর পরের গ্রীষ্মে আমাদের জীবনে সত্যিই দারুণ কিছু একটা ঘটবে, আর তখন অবশেষে বেঁচে থাকার জন্য আমরা সত্যিই আনন্দ অনুভব করবো।”

হিমেনোর ভবিষ্যৎবাণী ভুল ছিল। অন্ততপক্ষে আমার ক্ষেত্রে ভালো কোনো কিছুই হচ্ছে না। আর সামনেও ভালো কিছু হওয়ার আভাস নেই।

মাঝে-মাঝে ভাবি ও এখন কী নিয়ে আছে। ও ফোর্থ গ্রেডে স্কুল পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সুতরাং আমাদের আর দেখা হয়নি।

ঠিক এরকমটা হওয়ার কথা ছিল না। অন্যদিক দিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় যা হয়েছে সবচেয়ে ভালো হয়েছে। আমাকে মিডেল স্কুল, হাই স্কুল এবং কলেজে অনুসরণ না করার ফলে, একজন নিয়মিত গড়পড়তা এবং বিরক্তকর মানুষ হিসাবে রূপান্তরিত হতে দেখতে হয়নি।

যদিও এভাবেও চিন্তা করা যায়ঃ যদি আমার ছোটবেলার বন্ধু আমার সাথে একই স্কুলে পড়ত, আমি সম্ভবত শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় উপনীত হতাম না।

যখন ও আমার আশপাশে থাকতো, আমার মধ্যে একটা চাপ কাজ করতো। আমি যদি লজ্জাজনক কিছু করি, ও আমাকে নিয়ে হাসবে। আমি যদি দারুণ কিছু করি, ও আমাকে অভিশাপ দিবে।

সম্ভবত ওর কারণে একটা আলাদা উত্তেজনা অনুভব করতাম বলেই আমার মাঝে সবসময় সেরাটা দেওয়ার ব্যাকুলতা থাকতো।

গত কয়েক বছর ধরে আমি নিয়মিতভাবেই প্রভাবটা অনুভব না করার জন্য অনুশোচনা করে যাচ্ছি। দশ বছরের সেই আমি, বর্তমানের আমাকে নিয়ে কী ভাববে?

একনাগাড়ে তিনদিন প্রায় সবগুলো সিডি শোনার পরে, কয়েকটি অপরিহার্য অ্যালবাম বাদে বাকিগুলো একটা পেপারের ব্যাগে প্যাকেট করলাম। আরেকটি ব্যাগ ইতোমধ্যে বোঝাই করে ফেললাম বই দিয়ে। দুটো ব্যাগই তুলে নিয়ে গেলাম শহরে।

সূর্যের নিচে যাওয়া মাত্রই আমার কান ঝালাপালা করতে শুরু করল। ঘুঘুরে পোকার অনিয়মিত ডাকের কারণে আমি হয়তো বা উল্টাপাল্টা জিনিস শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে মনে হচ্ছিল ওগুলো আমার কানের ঠিক পাশেই আছে।

এই নির্দিষ্ট বইয়ের দোকানটাতে আমি প্রথমবার গিয়েছিলাম গত গ্রীষ্মে, কলেজে প্রবেশ করার কয়েক মাস পরে।

আমার তখনো শহরের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল না। খুব সহজে আমি হারিয়ে যেতাম। তাই সবসময়, হাঁটার সময় কোথায় যাচ্ছি সেটা নজর রাখতে হতো।

কয়েকটা সরু গলি পেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে উঠার পরে আমি বইয়ের দোকানটা খুঁজে পেলাম। এরপরে বহুবার আমি ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু জায়গাটা ঠিক কোথায় মনে করতে পারিনি। এমনকি যখন আমি বিষয়টার দিকে নজর দিতে চেষ্টা করতাম; সবসময়ই দোকানের নাম ভুলে যেতাম।

সুতরাং ব্যাপারটা আমার সাথে এভাবে কাজ করতো যে, ঠিক যখনই আমি পথ ভুল করে হারিয়ে যেতাম, আমি ওইখানেই পৌঁছে যেতাম। যেন প্রায় ঝোঁকের বশে বইয়ের দোকানের রাস্তা আপন খেয়ালে বদলে যেত।

মাত্রই এ-বছর আমি হারিয়ে না গিয়ে দোকানটায় যেতে পেরেছি।

দোকানের সামনে মর্নিং-গ্লোরি ফুল ফুটে আছে। অভ্যাসবসত আমি দোকানের বাইরের সস্তা বইয়ের সেলফে খুঁজে দেখলাম। সেখানে ভিন্ন ধরনের কোনো বই নেই দেখে নিশ্চিত হয়ে ভিতরে গেলাম।

বিল্ডিংয়ের ভেতরে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। তাতে পুরাতন কাগজের দুর্বীর ঘ্রাণ। পেছনে একটা রেডিও চলতে শুনলাম।

সাইডওয়ে'কে পাশ কাটিয়ে একটা সরু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দোকানের মালিককে ডাকলাম। বুড়ো মিয়া বইয়ের টালের মাঝ দিয়ে তার ক্লান্ত বলিরেখাযুক্ত মুখটা বাড়িয়ে দিলো। দোকানের মালিক বুড়ো মিয়া কাউকেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন না। উনি সাধারণত মাথা নিচু করে থেকে নিজের কাজ করে যান।

কিন্তু আজকের দিনটা ভিন্ন ছিল। আমি যখন একগাদা বই নিয়ে আসলাম বিক্রি করার জন্য, উনি মাথা তুলে আমার চোখের দিকে তাকালেন।

লোকটার চেহারা বিস্ময় ভাব দেখতে পেলাম। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি।

যে বইগুলো আমি বিক্রি করছি সেগুলো এমন ধরনের বই; যার মূল্য লুকিয়ে আছে বারবার পড়ার মধ্যে। এগুলো হাতছাড়া করা একজন বইপ্রেমীর জন্য খুবই কঠিন।

“তুমি কি বাসা পাল্টাচ্ছে বা এমন কিছু করছো নাকি?” লোকটি বিস্ময়কর কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

“না, এমন কিছু না।”

“আচ্ছা, ঠিক আছে” এক টাল বইয়ের দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল।
“তাহলে অযথা এসব করছো কেন?”

“খাবার হিসাবে কাগজ তেমন পুষ্টিকর ভালো কিছু না।”

বুড়ো মিয়া মনে হচ্ছে আমার রসিকতা ভালোমতোই বুঝতে পেরেছে।
“হাতে টান পড়েছে” তার মুখটা বেঁকে গেল।

আমি মাথা ঝাঁকালাম, লোকটা তার হাত দুটো একসাথ করল যেন গভীরভাবে কিছু একটা চিন্তা করছে।

তার পরে মত পরিবর্তন করে দম নিয়ে বললেন, “হিসাব করতে আধা ঘণ্টার মতো লাগবে” তারপরে বইগুলো নিয়ে পিছনে চলে গেলেন।

বাইরে বের হয়ে রাস্তা শেষের একটা পুরাতন বিলবোর্ডের দিকে তাকালাম।
ওতে আমার ফেস্টিভ্যাল, জোনাকি-দেখা, তারা-দেখা এবং বইয়ের ক্লাবের পোস্টার লাগানো।

বেড়ার অপরপাশ থেকে, গাছের গন্ধের সাথে মিশে ধূপ এবং তাতামি ম্যাটের গন্ধ পেলাম; সামগ্রিকভাবে একটা নস্টালজিক ঘ্রাণ। দূরের একটা ঘর থেকে বাতাসের একটানা সুর ভেসে আসতে লাগল।

হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়ার পরে দেখা গেল আমি যা আশা করেছিলাম এর তিন ভাগের দুইভাগ দাম পেলাম। বুড়ো মিয়া বলল, “শোনো, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।”

“জি?”

“তোমার টাকার প্রয়োজন, ঠিক কি-না?”

“ব্যাপারটা এমন না যে সেটার প্রয়োজন এখনই শুরু হয়েছে।” আমি সন্দেহের সাথে উত্তর দিলাম। বৃদ্ধ লোকটি মাথা নাড়ল, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে মনে হয়।

“তো, তুমি ঠিক কতটা গরীব অথবা ঠিক কতটা গরীব হয়ে গিয়েছে; সেটা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি শুধু তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।”

বুড়ো মিয়া কিছুক্ষণের জন্য থামল।

“তুমি কি তোমার আয়ুষ্কাল থেকে কিছুটা বিক্রি করতে চাও?”

আমার উত্তর দিতে কিছুটা দেরি হলো। সাথে কয়েকটি অস্বাভাবিক শব্দ যুক্ত হলো।

“আয়ুষ্কাল?” ঠিক শুনেছি কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য, আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

“হ্যাঁ, আয়ুষ্কাল। না, আমি কিনছি না। যদিও, আমি জানি বেশ চড়া দামে বিক্রি হয় এটা।”

দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে না প্রচণ্ড গরমে আমার কান আমার সাথে ছলনা করছে।

আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করলাম।

শেষ বয়সের ভয় বুড়ো মিয়াকে সম্ভবত একটা ঝটকা দিয়েছে। প্রথমে এটাই ছিল আমার চিন্তা-ভাবনা। আমার চেহারা দেখে, বুড়ো মিয়া বলল, “বুড়ো শালাকে ভীমরতি ধরেছে অথবা আমি রসিকতা করছি, এমনটা ভাবতে হচ্ছে বলে তোমাকে দোষারোপ করতে পারি না। যদি তুমি আমার কথাবার্তা নিয়ে মজা নিতে চাও, যাও দেখে এসো। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কোথায় যেতে হবে। তাহলে তুমি বুঝতে পারবে আমি মিথ্যা বলছি কিনা।”

আমি উনার ব্যাখ্যা শুনলাম। সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত না তখনো। সংক্ষেপে, তিনি আমাকে এই কথাগুলোই বললেন।

এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় এমন একটা বিল্ডিংয়ের চার তলায়, একটা দোকান আছে; যারা কিনা তোমার আয়ুষ্কাল কিনে নেবে। কত দামে বিক্রি হবে সেটা আসলে লোকজনের উপর ভিত্তি করে। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে যদি বেশি সফলতা পাও তবে বেশি দাম পাবে।

“ওরা ঠিক কত টাকা দেয় আমি জানি না, কিন্তু তোমাকে দেখে খারাপ লোক মনে হচ্ছে না, আর আমার মনে হয় তুমি বই পছন্দ করো। নিশ্চয় বেশ ভালো

দাম হবে?”

আমার নস্টালজিকভাবে এলিমেন্টারি স্কুলের সেই শিক্ষার কথা মনে পড়ে গেল, আর ভাবতে লাগলাম ঠিক কতটা পরিচিত ঠেকছে সেটা।

লোকটার ভাষ্যমতে আয়ুষ্কাল বাদেও, সময় এবং স্বাস্থ্যও বিক্রি করা যায় ওখানে।

“আয়ুষ্কাল এবং সময়ের মধ্যে পার্থক্য কী?” আমি প্রশ্ন করলাম। “আয়ুষ্কাল এবং স্বাস্থ্যের পার্থক্য নিয়েও কোনো ধারণা নেই।”

“বিস্তারিত কিছু জানি না। এমন না আমি নিজে কিছু বিক্রি করেছি। কিন্তু ভয়ঙ্কর অসুস্থ মানুষ কয়েক দশক পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। আর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষ হঠাৎ মরে যেতে পারে; এটা একটা পার্থক্য, তাই না? যদিও, সময়ের হিসাবনিকাশ কিভাবে হবে সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

বুড়ো মিয়া আমার জন্য একটা রোড ম্যাপ এঁকে একটা নাম্বার লিখে দিলো। আমি উনাকে ধন্যবাদ দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু আমি একদম নিশ্চিত এই “আয়ুষ্কাল কেনা-বেচা করার দোকান” বুড়ো মিয়ার নিজেকে খুশি রাখার জন্য কল্পনা ছাড়া কিছুই না।

মৃত্যু এগিয়ে আসছে বলে ভয়ে পেয়ে, শেষ পর্যন্ত আয়ুষ্কাল বেচা-কেনার ধারণা উদয় হয়েছে উনার মনে।

আসলে, আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ঘটনাটা সত্যি হওয়ার পক্ষে একটু বেশি বাড়াবাড়ি না?

আমার প্রত্যাশা অর্ধেক পূরণ হয়েছিল।

কথাটা সত্যি হওয়ার পক্ষে আসলেই একটু বেশিই ছিল।

কিন্তু একই সাথে আমার প্রত্যাশা অর্ধেক পূরণ হয়নি।

সত্যি সত্যিই আয়ুষ্কাল নিয়ে ব্যবসা করে এমন দোকান আছে।

বইগুলো বিক্রি করার পরে, আমার পা আমাকে সিডির দোকানে বয়ে নিয়ে গেল।

রাস্তায় সূর্যের বিচ্ছিরিরকম প্রতিফলন হচ্ছিল, ঘামের ফোঁটা আমার মুখ বেয়ে পড়তে লাগল। সাথে বেশ তৃষ্ণাও পেল আমার। কিন্তু ভেড়িং মেশিন থেকে জুস কেনার মতো অতিরিক্ত টাকা আমার কাছে ছিল না। অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোমতে সহ্য করে যেতে হবে।

বইয়ের দোকানের ঠিক বিপরীতে, সিডির দোকানে ভালো এয়ার-কন্ডিশন

আছে। অটোমেটিক দরজা খুলে গেলে এয়ার কন্ডিশনটা আমাকে ঠান্ডা হাওয়ায় গোসল করিয়ে দিতেই, নিজেকে সেখানে ভাসিয়ে দিতে মনে চাইল।

দীর্ঘ একটা দম নিয়ে শরীরে বাতাস টেনে নিলাম। দোকানে গ্রীষ্মের একটা জনপ্রিয় গান বেজে চলছে। যেটা আমি মিডেল স্কুলে থাকা অবস্থা থেকেই জনপ্রিয় ছিল। কাউন্টারে যাওয়ার পরে, সচরাচর যে ক্লার্ককে ডাকি, তাকে ডাক দিলাম। তারপরে আমার ডান হাতের ব্যাগের দিকে নির্দেশ করলাম। সে আমার দিকে সন্দেহজনকভাবে তাকাল।

তার মুখটা ধীরে-ধীরে এমনভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেল যেন আমি তার সাথে বেশ কয়েকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। ওর চেহারাটা হয়তো আমাকে বলছে, “কিভাবে তুমি এই সিডিগুলো বিক্রি করে দিতে পারো?” বলতে গেলে প্রতিক্রিয়াটা বইয়ের দোকানের সেই বুড়ো মিয়ার মতো।

“কী হয়েছে?” স্বর্ণকেশী লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করল। লোকটার বয়স বিশের শেষের দিকে, চোখগুলো ঈষৎ নত। লোকটা রক ব্যান্ডের টি-শার্ট পরেছে, সাথে ডেনিম প্যান্ট। তার আঙুলগুলো সবসময়ের মতো কাঁপছে।

বইয়ের দোকানের মতো এখানেও আমাকে ব্যাখ্যা করতে হলো, কেন আমি সিডিগুলো বিক্রি করছি। লোকটা তখন হাত জড়ো করে বলল, “সেক্ষেত্রে...”

“আপনার জন্য আমার কাছে দারুণ একটা খবর আছে। হয়তো এটা আপনাকে আমার একদমই বলা উচিত না। কিন্তু আপনার মিউজিকের টেস্টের সাথে আমার টেস্ট একদম মিলে যায়, ভায়া। এটা শুধু আপনার আর আমার মধ্যেই গোপন থাকবে, ঠিক আছে?”

জোচ্চররা নিজেদের মধ্যে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, লোকটার কথাগুলো শুনে সেরকম কিছু মনে হচ্ছে। স্বর্ণকেশী লোকটি বললঃ “শহরে একটা দোকান আছে যেখানে আপনার আয়ুষ্কাল কিনে নিতে পারে!”

“আয়ুষ্কাল!” আমি প্রশ্ন করলাম। আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছি জিনিসটা একটু আগের কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। কিন্তু আমাকে পুনরায় প্রশ্নগুলো করতে হবে।

“হ্যাঁ। আয়ুষ্কাল” সে গম্ভীর হয়ে নিশ্চিত করল।

এটা কি গরীব লোকদের সাথে মজা করার জন্য কোনো খোশখোয়াল নাকি? কিভাবে উত্তর দিবো এ-নিয়ে যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলাম, সে আমাকে খুব দ্রুত ব্যাখ্যা করল। বলতে গেলে তার বলা গল্পটা বইয়ের দোকানের বুড়ো মিয়ার

গল্পের সাথে বেশিরভাগ মিলে যায়। কিন্তু এই লোকের ক্ষেত্রে, মনে হয় লোকটি নিজেই কিছুটা আয়ুষ্কাল বিক্রি করেছে। যখন আমি তাকে কত টাকায় বিক্রি করেছে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনাকে ঠিক বলতে পারবো না” বলে পাশ কাটিয়ে গেল।

স্বর্ণকেশী একটা ম্যাপ আঁকল। আর একটা ফোন নাম্বার লিখে দিলো। আগেই বলে নেয়া উচিত বুড়ো মিয়া আমাকে যে ম্যাপ আর ফোন নাম্বার দিয়েছিল তার সাথে হুবহু মিলে গিয়েছে।

আমি ধন্যবাদের ভঙ্গি করে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

সূর্যের নিচে আসতেই, ভারী গরম বাতাস আমার শরীরের সাথে জড়িয়ে গেল।

‘শুধুমাত্র আজকের জন্য’ কাছের ভেভিং মেশিনে কয়েন ঢুকাতে-ঢুকাতে নিজেকে প্রবোধ দিলাম। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সিডার নিলাম।

দুই হাতে ঠান্ডা ক্যানটা কিছুক্ষণের জন্য ধরে রেখে, অবশেষে আমি ট্যাব টান দিয়ে সময় নিয়ে পান করলাম।

সতেজ সফট ড্রিংকসয়ের মধুরতা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। বেশ অনেকদিন যাবৎ আমি কার্বোনেট জাতীয় কিছু পান করিনি, সুতরাং প্রতিটি ঢোক আমার গলায় কম্পন এনে দিলো।

পুরোটা শেষ করে খালি ক্যানটা ট্র্যাশে ফেলে দিলাম।

দুই ক্লার্কের দেওয়া ম্যাপগুলো পকেট থেকে বের করে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিশ্চিতভাবেই সেটা হাঁটা দূরত্বে অবস্থিত। মনে হচ্ছে ওই বিল্ডিংয়ে গিয়ে আয়ুষ্কাল, সময় কিংবা স্বাস্থ্য বিক্রি করে আসবো আমি।

আমি এতটাই নির্বোধ!

চোখ ডলে ম্যাপটা বলের মতো দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আমি আবিষ্কার করলাম সেই বিল্ডিংয়ের সামনে। বিল্ডিংটা পুরাতন। দেয়াল এতটাই কালো যে আসলে ঠিক কী রংয়ের ছিল সেটা এখন আর বলা যাচ্ছে না। সম্ভবত বিল্ডিংটার নিজেরও এখন আর মনে নেই। বিল্ডিংটা বেশি প্রশস্ত না। আমার মনে হচ্ছিল দুই পাশের বিল্ডিং এটাকে মাঝখানে দুই পাশ থেকে চেপে ধরেছে।

এলিভেটর কাজ করছিল না। সুতরাং আমাকে চারতলায় যেতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হলো। ফ্লুরোসেন্ট লাইটের আলোতে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস টেনে

নিতে লাগলাম। প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে সাথে ঘামতে লাগলাম আমি।

আয়ুষ্কাল বিক্রির গল্পটা আমি একদমই বিশ্বাস করিনি।

বরং, দুই ক্লার্ক মিলে সরাসরি বলতে না পেরে রূপক অর্থে লোভনীয় কোনো কাজের কথা বলছিল এমনটা ভাবলাম আমি। যেমন ধরুন, “আয়ুষ্কাল কমে যাওয়ার জোরাল সম্ভাবনা আছে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।”

“ঠিক কত টাকা দেয় ওরা আমি জানি না, কিন্তু তোমাকে দেখে খারাপ লোক মনে হচ্ছে না। আর আমার মনে হয় তুমি বই পছন্দ করো। নিশ্চয় বেশ ভালো দাম হবে, তাই না?”

চতুর্থতলার খুঁজে পাওয়া দরজায় কিছুই লেখা নেই। কিন্তু কিভাবে যেন আমি নিশ্চিত ছিলাম ওরা এই জায়গার কথাই বলেছিল।

দম বন্ধ করে ডোরনবের দিকে পাশ্চাৎ পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে রইলাম। তার পরে কোনোরকম দ্বিধা না করেই সেটা ধরলাম।

দরজার পিছনের রুমটা বিল্ডিংয়ের বাইরের অংশের তুলনায় অকল্পনীয়ভাবে পরিষ্কার। আমি তেমন একটা বিস্ময় দেখালাম না।

রুমের ঠিক মধ্যখানে খালি শোকেস। দেয়ালের পাশে খালি শেলফ। কিন্তু কিভাবে যেন আমার কাছে স্বাভাবিকই মনে হলো।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও এটা বেশ অদ্ভুত একটা ঘর। যেন অলঙ্কার ছাড়া অলংকারের দোকান, চশমা ছাড়া একজন চশমীশ, বই ছাড়া বইয়ের দোকান।

আমার মনে এর চেয়ে ভালো তুলনা এলো না।

আমার পাশেই যে কেউ একজন ছিল; সেটা উনার কথা বলে উঠার আগ পর্যন্ত খেয়াল করিনি।

“স্বাগত।”

কণ্ঠটা অনুসরণ করে ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম একটা মেয়ে স্যুট পরে বসে আছে। সে আমার দিকে সরু ফ্রেমের চশমার নিচ থেকে দেখতে লাগল; যেন নিঃশব্দে হিসাব-নিকাশ করছে।

“এটা কোন ধরনের ঘোড়ার ডিমের জায়গা?” প্রশ্নটা করতে ব্যর্থ হলাম আমি। কারণ, আমি মুখ খোলার আগেই মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, “আপনার সময়? আপনার স্বাস্থ্য? নাকি আপনার আয়ুষ্কাল?”

চিন্তা করতে করতে ত্যক্ত হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

যদি আমার সাথে মজা নিতে চাও, ঠিক আছে তাহলে। নাও মজা “আয়ুষ্কাল” আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম।

আমি ভাবতে লাগলাম, কিছুক্ষণ খেলা খেলাই যাক না। আমার হারানোর মতো আর কিইবা আছে?

কোনো কিছুই সঠিকভাবে বলা যায় না। ধরে নিলাম আমার আরও ষাট বছর বাকি আছে। আমার হিসাব মতে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ইয়েন হওয়ার কথা।

এখন এলিমেন্টারি স্কুলের মতো এতটা অহংকারী না আমি। কিন্তু আমি এখনো বিশ্বাস করি সাধারণ মানুষের তুলনায় আমার মূল্য অনেক বেশি। তো আমি ধরে নিলাম এক বছরে ১০ মিলিয়ন করে বিক্রি করতে পারবো।

এমনকি বিশ বছর বয়সেও, নিজেকে ‘বিশেষ কিছু একটা’ ভাবার ধারণা থেকে বের হতে পারিনি। অবশ্যই বিশ্বাসটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য না। আমি আগের গৌরবকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম।

বাস্তবতা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম আমি। যা পরিবর্তন হওয়ার কোনো লক্ষণই ছিল না। নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছি যে কোনো একদিন, আমি অবশ্যই এতটা সফল হবো; মনে হবে মূল্যহীন এই বছরগুলো যেন কখনই আমার জীবনে ঘটেনি।

বছর ঘুরে আরেক বছর এলো, সেই সাথে আমার বয়সও বাড়তে লাগল। যে সাফল্যের স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম; তার পাল্লাও সেইসাথে বড় হতে থাকল। যতই কোণঠাসা হতে লাগলাম; ততই পাশার দান ঘোরানোর মরিয়া চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখলাম।

কিন্তু এমনটাই তো হবার ছিল। খেলার শেষার্ধ্বে যখন প্রতিপক্ষের চেয়ে দশ পয়েন্ট পিছিয়ে থাকে কেউ, তখন প্রার্থনাকে না কাজে দেয় না। সপাটে ব্যাট ঘোরাতে হবে, বল যেরকমই হোক না কেন

কিছুক্ষণের মধ্যেই অমর হবার স্বপ্ন ভেসে উঠলো আমার মনের পর্দায়। আমি যদি পুরো বিশ্বের তোলপাড় ফেলে দেয়ার মতো কিছু না করি, কেউ মনে রাখবে না আমাকে।

ঠিক দিশা খুঁজে পাওয়ার একটাই উপায় আছে এখন। এমন কাউকে দরকার যে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করবে আমাকে। পালাবার কোনো পথ থাকবে না এবং নিজেকে বাঁচাতেও পারবো না। চোখ দিয়ে পানি গড়ানো অবধি মার সহ্য করতে হবে।

এভাবে ভাবলে আমার আছু বিক্রি করে দেয়াই একমাত্র উত্তর।

তাহলে শুধুমাত্র আমার অতীত জীবনই নয় ভবিষ্যৎ জীবনকেও সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হবে।

মেয়েটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝলাম, ওর বয়স খুবইও কম। শুধু বাহ্যিক উপস্থিতি দেখে আমার মনে হচ্ছে আঠারো থেকে চব্বিশ-এর মধ্যে।

“আপনার মূল্য নির্ধারণ শেষ হতে তিন ঘণ্টা লাগবে” মেয়েটি বলল। ওর হাত ইতোমধ্যে কিবোর্ডে টাইপ করতে শুরু করেছে।

আমি ভেবেছিলাম বিরক্তিকর কোনো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে হয়তো। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাকে আমার নামটা পর্যন্ত বলতে হয়নি। মাত্র তিন ঘণ্টায় মানুষের অপূরণীয় জীবনের মূল্যে জানা যাবে এটা না হয় বাদই দিলাম।

অবশ্যই, মূল্যটা ওরাই নির্ধারণ করে দিবে। সর্বজনীন হবে না। কিন্তু এটাও তো আসলে একটা মানদণ্ড।

বিল্ডিংটা থেকে বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে লাগলাম। আকাশটা ইতোমধ্যে রং হারাতে শুরু করেছে। পা’দুটো ক্লান্ত হয়ে গেল। একইসাথে খিদেও পেল। একটা রেস্টুরেন্টে টুঁ মারতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু আমার কাছে খরচ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না।

শপিং ডিস্ট্রিক্টের বেঞ্চে আমি এক প্যাকেট সেভেন স্টারস এবং একশ’ ইয়েনের লাইটার পড়ে থাকতে দেখলাম। আশাপাশে তাকালাম। কিন্তু এগুলোর সম্ভাব্য মালিক হতে পারার মতো এমন কাউকে দেখতে পেলাম না।

বেঞ্চে বসে স্বাভাবিকভাবে সেগুলো পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপরে গলিতে ফিরে গেলাম। গাদা করে রাখা একটা কাঠের টুকরোর পিছনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে লম্বা করে একটা টান দিলাম। বেশ অনেকদিন হয়ে গিয়েছে শেষবারের মতো সিগারেট টেনেছিলাম। তাই গলা ব্যথা করতে লাগল।

সিগারেট পায়ের তলায় পিষে ট্রেন স্টেশনের দিকে গেলাম। গলা আবারো শুকিয়ে গেল।

প্লাজার একটা বেঞ্চে বসে কবুতর দেখতে লাগলাম। একজন মধ্যবয়সী মহিলা ঠিক তার বিপরীতে বসে ওদের খাওয়াচ্ছিলেন।

বয়সের তুলনায় উনার ফ্যাশনটা কম বয়সীদের মতো মনে হচ্ছে। উনি বিরতিহীনভাবে খাবার ছুড়ে দিচ্ছিলেন। উনাকে দেখে আমার মনের মধ্যে এমন একটা অনুভূতি হলো; যেটাকে আমি ঠিক কী বলবো তা নিয়ে নিশ্চিত নই।

সেই সাথে, কবুতরগুলোকে রুটিতে ঠোকর দিতে দেখে, আমার খিদে চাগিয়ে তোলার জন্য ঘৃণা করতে লাগলাম। আমি ঠিক অতটা ক্ষুধার্ত ছিলাম না। কিন্তু ওদের সাথে মাটিতে ঠুকরে খাবার খাওয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে চলে গিয়েছি আমি।

...আশা করছি, আমার আয়ুষ্কাল বেশ ভালো দামে বিক্রি হবে।

জিনিসপত্র বিক্রির সময় মানুষজন যা করে, সত্যিকারের মূল্য দেখার আগ পর্যন্ত ঠিক কত মূল্য আসতে পারে তার একটা আনুমানিক হিসাব করার চেষ্টা করলাম।

প্রাথমিকভাবে আমি ৬০০ মিলিয়ন রাজত্বের একটা চিন্তা করলাম, কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণের জন্য দাম নিয়ে তর্কাতর্কি এড়াতে, আমি সবচেয়ে খারাপ চিন্তাটাই করলাম।

সে হিসাবে, আমি ৩০০ মিলিয়নের চিন্তা করছিলাম। যখন আমি ছোট ছিলাম, আমি ভাবতাম আমার দাম প্রায় ৩ বিলিয়ন; তো সেই হিসাবে তুলনা করলে, বলা যায় মূল্যটা খুবই কম ছিল।

কিন্তু আমি আমার জীবনের মূল্য নিয়ে অতিরিক্ত অনুমান করছি। একজন সাধারণ সেলসম্যানের ব্যয় হচ্ছে ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন। হিমেনোর পরামর্শ এখনো মনে আছে আমার।

যদিও এলিমেন্টারি স্কুলে থাকার সময় যখন প্রথমবারের মতো একটা মেয়ের কাছ থেকে জীবনের মূল্য সম্পর্কে শুনেছিলাম। ও বলেছিল, “কেউ কখনই মানুষের জীবনে সুযোগের কোনো মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না।” আর আমি এর জন্য ক্ষতিপূরণও চেয়েছিলাম! কথাটা আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম।

দোকানটায় একটু আগেভাগেই ফিরে এসে সোফাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। একটা মেয়ে আমার নাম ধরে ডাকাতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হচ্ছে হিসাবনিকাশ শেষ হয়েছে।

“মি. কুসুনোকি” মেয়েটি বলল। নিশ্চিতভাবেই মেয়েটি এই নামটিই বলেছে। ওদেরকে আমার নাম বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না। কিংবা শনাক্ত করার কোনো আইডিকার্ডও দেইনি। কিন্তু তারা যে-কোনোভাবে সবকিছু জানে।

সত্যি-সত্যি এই জায়গাটি; নিশ্চয় সাধারণ বিচারবুদ্ধির বাইরে কোনোভাবে পরিচালিত হয়।

অদ্ভুতভাবে যে সময়ে আমি বিল্ডিংটায় ফিরে এলাম, আয়ুষ্কাল বিক্রির

সন্দেহজনক গল্পটা বিশ্বাস করার জন্য স্বেচ্ছায় রাজি ছিলাম।

কেন এমন হলো, সে সম্পর্কে আমি অনেক অনেক জটিল কারণ দেখাতে পারি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত কারণ যেটা, তা হলো-সেই মেয়েটি।

প্রথমবারে মতো দেখা হওয়া কারও প্রতি এরকম অনুভূতি হওয়াটা সম্ভবত অদ্ভুত-ই। কিন্তু...আমার মনে হচ্ছে এই মেয়েটা যেসব কিছুতে জড়িত; সেটা কখনই মিথ্যা হতে পারে না।

....হিসাবনিকাশে ফিরে যাওয়া যাক।

যে মুহূর্তে মেয়েটার মুখ থেকে “তিন” শব্দটা শুনতে পেলাম, আমার হৃদয়ের গভীরে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠল। আমার মনে হয়েছে, আমার চেহারা প্রত্যাশার আলো জ্বলে উঠেছিল। স্বভাবতই আমার মনে হলো, ছোটবেলার করা আমার তিন বিলিয়নের হিসাবটা ঠিক ছিল।

মেয়েটা আমার চেহারা দেখে, অপ্রতিভভাবে তাকিয়ে মধ্যমা আঙুল দিয়ে ওর চিবুক চুলকাতে লাগল। দেখে মনে হচ্ছে আমাকে কিছু একটা সরাসরি বলতে পারছে না। সে কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ধুমধাম করে কয়েকটি ‘কী’ চাপতে লাগল। অতঃপর কাউন্টারে একটা প্রিন্ট করা কাগজ রাখল।

“হিসাবনিকাশের পরে এটাই হচ্ছে আপনার ফলাফল। আপনি কী করতে চান এখন?”

প্রথমে, ফর্মের “৩০০,০০০” নাম্বারটা দেখে ভাবলাম এক বছরের মূল্য এটা।

আশি বছরের জীবনকালে, সবমিলিয়ে চব্বিশ মিলিয়ন হবে।

“চব্বিশ মিলিয়ন” আমার মাথায় বারেবারে ঘুরতে লাগল।

মনে হচ্ছে শরীর থেকে সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে। যে কোনো মূল্যেই এটা কম দাম।

দ্বিতীয়বারের মতো দোকানটা নিয়ে আমার সন্দেহ হতে লাগল। হয়তো বা এটা কোনো টিভি শো-এর সেটআপ। কিংবা কোনো সাইকোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। না, হয়তো কোনো জঘন্য কৌতুক....

কিন্তু যতই আমি কোনো ছুতা বের করি না কেন, সবই বৃথা। আমার সহজাত-প্রবৃত্তিকে কঠিন সময় পার করতে হচ্ছিল। নতুবা আমার সমস্ত প্রবৃত্তিই আমাকে বলছে “মেয়েটা ঠিকই বলেছে।”

যে কোনো মূল্যেই, আমাকে এই চব্বিশ মিলিয়ন সংখ্যাটাকে মেনে নিতেই হবে। আর এটা মানতে দৃঢ় মনোবল প্রয়োজন।

কিন্তু মেয়েটা আমার মুখোমুখি হয়ে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্যিটাই বলল।

“সবকিছু দেখে শুনে এটাই জানা গেল, আপনার প্রতি বছরের মূল্য ১০,০০০ ইয়েন। যে কারো জন্য সর্বনিম্ন মূল্য এটাই। যেহেতু আপনার আয়ুষ্কালের ৩০ বছর ৩ মাস বাকি আছে, আপনি সবমিলিয়ে পাবেন ৩০০,০০০ ইয়েন।”

আমি তখন হাসতে লাগলাম। মেয়েটার কথাগুলোকে রসিকতা হিসাবে নিয়েছি বলে না। বরং বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে কিছুতেই না হেসে পারলাম না।

ফর্মে আমার ফলাফল লেখা আছে। সেটা আমার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক অনেক নিচে।

“অবশ্যই কোনো প্রকার সর্বজনীন মূল্যের দিকে ইঙ্গিত করার কোনো উপায় নেই। এটা সম্পূর্ণই আমাদের মানদণ্ড অনুযায়ী ফলাফল” নিজের কথাকে সমর্থন করার জন্য মেয়েটি বলল।

“প্রকৃত হিসাব করেছে অন্য একজন পরামর্শক। তো আমি আসলে সঠিক জানি না। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে সুখের মাত্রা, কার্য বাস্তবায়ন, কোনো কিছুতে অবদান রাখা মূল্যের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। সংক্ষেপে, মূল্যটা নির্ধারণ করা হয় আমাদের পরবর্তী জীবন ঠিক কতটা সুখের হবে, কিভাবে অন্যকে সুখী করবে, এর মধ্যে কতগুলো স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে, সমাজে ঠিক কতটুকু অবদান রাখতে পারবে ঠিক এগুলোর উপর।”

ন্যায়পরায়ণতা আমাকে আবারো সম্পূর্ণভাবে ছিটকে ফেলল।

আমি যদি সুখী না হই, অথবা কাউকে সুখী করতে না পারি, অথবা কোনো স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে না পারি অথবা সামাজে কোনো অবদান না রাখতে পারি; যদি আমি এসব ক্যাটাগরিতে একেজো বলে প্রমাণিত হই, আমার তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু আমি যদি নিজে সুখী না হতে পারি, অন্য কাউকে সুখী করতে না পারি, অথবা কোনো স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে না পারি, আর সামাজে কোনো অবদান না রাখতে পারি; আমি জানি না ঠিক কোথায় আমি মুক্তি খুঁজে পাবো।

অন্যদিকে, বিশ বছরের পর থেকে ত্রিশ বছর তো খুবই অল্প সময়। আমি নিশ্চয় বড়োসড়ো অসুখে ভুগবো, তাই তো? নাকি কোনো দুর্ঘটনায় পড়বো?

“আমার আয়ুষ্কাল এতো ছোট কেন?” আমি প্রশ্ন করলাম, ভেবে দেখলাম

অন্ততপক্ষে ওকে এটা জিজ্ঞেস করা উচিত।

“আমি খুবই দুঃখিত” মাথাটা কিছুটা নামিয়ে মেয়েটি বলল। “যারা তাদের সময়, স্বাস্থ্য অথবা আয়ুষ্কাল বিক্রি করেছে; তাদের ব্যতীত অন্য কারো কাছে কোনো তথ্য ফাঁস করতে পারবো না।”

দ্রু কুঁচকে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম।

“আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন।”

“যত ইচ্ছে সময় নিন,” সে উত্তর দিলো। কিন্তু ওর কণ্ঠ শুনে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে মন চাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত, শুধুমাত্র তিন মাস রেখে, আমি সম্পূর্ণ ত্রিশ বছর বিক্রি করে দিলাম।

পার্ট-টাইম জবে দৌড়ঝাঁপের মধ্যে থাকা, বইয়ের দোকান এবং সিডি দোকানের ঘটনাটা আমার মধ্যে অন্যায় চুক্তি সহ্য করার শক্তি গড়ে তুলেছে।

মেয়েটি যখন আমাকে চুক্তিপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিচ্ছিল, আমি প্রায় সবগুলোর ক্ষেত্রেই চিন্তা না করেই হ্যাঁ বলে দিচ্ছিলাম। এমনকি যখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, আমি বললাম, তেমন কিছু নেই।

আমি কেবল প্রক্রিয়াটা শেষ করে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। এই দোকান থেকে, এই জীবন থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম।

“আপনি তিনবার পর্যন্ত লেনদেন করতে পারবেন” মেয়েটি বলল। “তার মানে, আপনি আরও দু’বার আপনার আয়ুষ্কাল, স্বাস্থ্য অথবা সময় বিক্রি করতে পারবেন।”

এনভেলাপে ৩০০,০০০ ইয়েন নিয়ে আমি দোকান থেকে বের হয়ে আসলাম।

যদিও আমার কাছে চামুচ কোনো প্রমাণ কিংবা কোনো ধারণা ছিল না কিভাবে সেটা হয়েছিল। আমি নিশ্চিতভাবেই অনুভব করতে পারছিলাম আমি আয়ুষ্কাল হারিয়েছি। আমার শরীরের একদম গভীর থেকে ৯০ শতাংশের মতো কিছু একটা বের হয়ে গিয়েছে।

বলা হয়ে থাকে মাথা কেটে ফেলার পরেও মুরগি বেশ কিছুক্ষণ দৌড়াতে পারে। আমি ধারণা করলাম এটা সম্ভবত সেরকম অনুভূতি। সম্ভবত চাইলে আমাকে এই মুহূর্তে লাশ বলা যাবে।

আশি বছর টিকে থাকবে আশা করা একটি শরীর একুশ বছরও দেখতে পারবে না, এমন একটা শরীরে আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি। প্রতিটি সেকেন্ডের ভারত্ব আগের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে।

ওই সময় আমি অবচেতন মনে এটাও ভেবেছিলাম, “আরে, আমার তো এখনো ষাট বছর বাকি আছে।” কিন্তু এখন তিন মাস বাকি থাকা অবস্থায় আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি; যেন আমাকে কিছু একটা করতে হবে।

বাসায় ফেরার সময় আমি একজন উদ্ভট মানুষকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল বিশের শেষের দিকে বয়স। একটা বিস্তর হাসি মুখে নিয়ে একা একা হাঁটছিল। যেন নিজেকে উপভোগ না করে পারছে না। ব্যাপারটা আমাকে ভীষণভাবে বিরক্ত করল।

শপিং ডিস্ট্রিক্টের একটা মদের দোকানে থেমে চারটা বিয়ারের ক্যান কিনলাম। আরেকটা দোকান থেকে পাঁচ পিস গ্রিল চিকেন কিনলাম। অতঃপর বাসায় যেতে যেতে সেগুলো পেটে চালান করে দিলাম।

তিন মাস মাত্র বাকি আছে। তাই টাকার চিন্তা করে লাভ নেই।

অনেক অনেক দিন হয়ে গিয়েছে আমি অ্যালকোহল গিলেছি। পানীয়টা আমাকে শান্ত করল। হয়তো এটা তেমন কোনো ভালো আইডিয়া না।

কারণ, খুব দ্রুতই আমি অসুস্থ অনুভব করতে লাগলাম। বাসায় পৌঁছানো মাত্রই বমি করা শুরু করলাম।

এভাবেই আমি শুরু করলাম আমার জীবনের শেষ তিনটে মাস।

বলতে গেলে প্রায় সবচেয়ে বাজে উপায়ে।

চ্যাপ্টার ৩ : দ্য অবজার্ভার উইথ হার নি'স আপ

খারাপ লাগটাই শেষ ছিল না। রাতটা ছিল গরম এবং অস্বস্তিকর। পুরো ব্যাপারটাকে ধন্যবাদ। আমি একদম স্পষ্ট একটা স্বপ্ন দেখলাম।

এমনকি জেগে উঠেও, আমার ম্যাট্রেসে বসে স্বপ্ন রোমন্থন করতে লাগলাম। এটা খারাপ কোনো স্বপ্ন ছিল না। সত্যি বলতে সুখী স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সুখের স্বপ্নের চেয়ে নিষ্ঠুর কিছু নেই।

স্বপ্নে আমি একটা পার্কে ছিলাম। আমি হাইস্কুলে পড়ি। পার্কটা আমার পরিচিত না। কিন্তু আমার এলিমেন্টারি স্কুলের ক্লাসমেটরা সেখানে ছিল। মনে হচ্ছে কোনো ধরনের ক্লাস রিইউনিয়ন।

সবাই আতশবাজি দেখে আনন্দ পাচ্ছিল। আতশবাজির আলোটা লাল বর্ণের। আমি পার্কের বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ হিমেনোকে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ও যখন আমাকে জিজ্ঞেস করল, হাইস্কুল কেমন চলছে?

আমি ওর দিকে তির্যকভাবে তাকালাম। কিন্তু ওর চেহারাটা অস্পষ্ট। ওর দশ বছর বয়সের পর থেকে আর কিছুই জানি না। ও দেখতে কেমন হতে পারে সেটা সত্যিই কল্পনা করতে পারলাম না।

তবে আমার স্বপ্নে মনে হলো ওর চেহারাটা একদম মনোমুগ্ধকর। এত বছর ধরে ওর সাথে পরিচয় থাকার জন্য নিজেকে গর্বিত মনে হতে লাগল।

‘খুব উপভোগ করছি তা বলতে পারবো না’ আমি সত্যি কথাই বললাম। ‘এটা জঘন্য থেকেও জঘন্য।

‘আমার উত্তরটাও অনেকটা এরকমই হবে হিমেনো মাথা ঝাঁকাল।

ও আমার মতো বয়ঃসন্ধি পার করেছে বলে গোপনে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

ও বলল, ‘জানো, ভেবে দেখলাম, আগের দিনগুলো বেশ মজারই ছিল।’

‘কোন আগের দিনের কথা বলছ তুমি?’ আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

হিমেনো উত্তর দিলো না। উরু হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কুসুনোকি, তুমি কি এখনো আগের মতোই আছো?’

‘আমার তাই মনে হয় আমি উত্তর দিয়েছিলাম, ওর কী প্রতিক্রিয়া হয় সেদিকে নজর দিয়ে।

‘আচ্ছা’ হিমেনো বলল বিস্মিত হওয়ার হাসি দিয়ে। ‘আসলে, জানো তো, আমিও তাই আছি।’

তারপরে, লাজুক হয়ে, ও আরও যোগ করল, ‘ভালো, একদম নিখুঁত।’

‘হ্যাঁ, দারুণ’ আমি সায় জানিয়েছিলাম।

এটাই ছিল স্বপ্ন।

এটা এমন কোনো স্বপ্ন নয় যা কেউ বিশ বছর বয়সে দেখবে। এরকম শিশুসুলভ স্বপ্ন দেখার জন্য আমি নিজেকে ভৎসনা করলাম। একই সাথে স্বপ্নটাকে আমার স্মৃতিতে রাখতে চাচ্ছি। যদি পরে ভুলে যাই তবে অনুশোচনা হবে।

আমি নিশ্চিত, যখন আমার বয়স দশ বছর ছিল, হিমেনোর প্রতি আমার তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। হয়তো বা সামান্য পরিমাণে ছিল। সমস্যা হচ্ছে এরপর থেকে আমি অন্য কারো প্রতি সেই “সামান্য পরিমাণে”ও আকর্ষণ অনুভব করিনি।

সম্ভবত সেই ক্ষুদ্র পরিমাণ আকর্ষণই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কিছু ছিল। যা কিনা ও চলে যাওয়ার অনেক বছর পরে বুঝতে পেরেছি।

হিমেনোকে নিয়ে দেখা স্বপ্নের খুঁটিনাটি স্মৃতিতে গেঁথে রেখেছিলাম আর একইসাথে গতকালকের ঘটনার কথা শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিলাম। তিন মাস বাদে আমার বাকি আয়ুষ্কাল জরাজীর্ণ পুরাতন বিল্ডিংয়ে বিক্রি করে দিয়ে এসেছি।

গতকালকের কথা চিন্তা করার সময় আমার একবারও মনে হলো না, ওহ, এটা তো দিবাস্বপ্ন ছিল। আমি ঘটনাটা একদম বাস্তব বলেই ধরে নিলাম।

আমি বলছি না, আমার আয়ুষ্কালের বেশিরভাগ মুহূর্তের উত্তজেনায় বিক্রি করে দিয়ে অনুশোচনায় ভুগছি। আমি বলছি না যে, হারিয়ে ফেলার পরে এখন আমার যা কিছু ছিল তার গুরুত্ব বুঝতে পারছি। তার বদলে, এটা আমার কাঁধে ভার হয়ে চেপে আছে বলে মনে হলো।

এতদিন পর্যন্ত আমাকে যেটা জীবনের সাথে জড়িয়ে রেখেছিল তা হলো,

‘কোনো একদিন ভালো কিছু ঘটবে’ এই ক্ষুদ্র আশা। এটা ছিল ভিত্তিহীন আশা। এটাকে বাতিল করে দেয়া ছিল কঠিন কাজ।

কেউ যতই অকর্মণ্য হোক না কেন, তাদের উপর যে সৌভাগ্য কৃপা করবে না; সেটা কে বলতে পারে? আর আগে এসব কিছুই ঘটেনি এমনটা ভেবে নিয়ে নতুন করে সবকিছু লেখার অনুমতি পেতে কতক্ষণ।

এটা ছিল আমার মুক্তি। একই সাথে এটা ছিল একটা ফাঁদ। যে কারণে নিজেকে আমি স্পষ্টভাবে বললাম “তোমার জীবনে ভালো কিছুই ঘটবে না” আমি এটাকে আশীর্বাদ হিসাবে দেখছি।

আমি এখন শান্তিতে মরতে পারবো।

আশা করছি আমার জীবনের শেষ তিন মাস উপভোগ করতে পারবো। সময়টাকে এমনভাবে ব্যয় করতে চাই যেন ভাবতে পারি, “আমার জীবনটা হতাশাজনক, অন্ততপক্ষে একবার মৃত্যুকে স্বীকার করে নিলে আমার জন্য সুখী তিনটে মাস অপেক্ষা করছে।”

প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিলাম, বইয়ের দোকানে যাব। ম্যাগাজিন পড়ব, তারপরে ভাববো এরপরে কী করা যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই, ডোরবেল বেজে উঠল।

আমি কোনো দর্শনার্থী আশা করছিলাম না। গত কয়েক বছরে আমার কাছে তেমন কেউ আসেনি। এবং গত কয়েক মাসে তো নিশ্চিতভাবেই কেউ আসেনি। ওরা কি ভুল রুমে ডোরবেল বাজাল? ঋণ সংগ্রাহক? ব্যাপারটা সুবিধার লাগছে না।

ডোরবেল আবারো বেজে উঠল। বিছানা থেকে উঠার সাথে সাথেই গতকালকের বমি-বমি ভাব, হ্যাংওভার ফিরে এলো। তবুও, জোর করে নিজেকে দরজায় নিয়ে গেলাম। একটা অপরিচিত মেয়েকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তার পাশেই একটা লাগেজ রাখা; যাতে মনে হচ্ছে মেয়েটার জিনিসপত্র আছে।

“...আপনি কে?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আমার দিকে মেয়েটা অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাগ থেকে চশমা বের করে পরল। তারপরে আমাকে “এখন ঠিক আছে?” ধরনের জিজ্ঞাসুর চাহনী দিলো।

তখনই আমি মেয়েটাকে চিনতে পারলাম, “আমার হিসাবনিকাশ করেছিলে যে, তুমি সেই মেয়েটা না...” নিজের অজান্তেই তুমিতে নেমে এলাম আমি।

“হ্যাঁ” মেয়েটি বলল।

আমার মনে স্যুট পরিহিত দৃশ্যটার কথা ভেসে উঠল। ক্যাজুয়াল পোশাকে ওকে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে। ও একটা কটন ব্লাউজ এবং স্যাক্স ব্লু স্কার্ট পরেছে।

কাঁধ সমান লম্বা চুল একদম শেষে ভিতরের দিকে কিছুটা কুঁচকে পিছনে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমি গতকাল ব্যাপারটা খেয়াল করিনি।

চশমার ভিতর দিয়ে তার চোখের দিকে খেয়াল করে দেখলাম, চোখ দুটোতে কিছুটা বিষাদমাখা।

ওর সরু মসৃণ পায়ের দিকে তাকাতেই, ওর ডান হাঁটুতে বড়ো ব্যান্ড এইড দেখতে পেলাম।

ওর সাথে প্রথম দেখায়, বয়সটা আনুমানিক আঠারো থেকে চব্বিশ বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন সম্পূর্ণভাবে ওর বয়স ধরতে পারলাম। ও হয়তবা আমার বয়সি-ই। উনিশ কিংবা বিশ হবে। কিন্তু সবকিছু বাদ। ও এখানে কেন এসেছে? প্রথমেই যে ধারণাটা আমার মাথায় আসল সেটা হলো ‘হিসাবনিকাশে কোথাও ভুল হয়েছে’ কথাটা বলতে এসেছে।

ওরা এক কিংবা দুই ডিজিট ভুল করেছে। অথবা ওরা ভুলক্রমে অন্য কারো সাথে আমার হিসাব গুলিয়ে ফেলেছে। আমার কাছে ক্ষমা চাইলে এসেছে এই আশাটা কিছুতেই ছাড়তে পারছিলাম না।

মেয়েটা চশমা খুলে ব্যাগে ভরে রেখে আমার দিকে আবেগশূন্য চোখে তাকাল।

“আমি মিয়াগি। আজকে থেকে আমি আপনার পর্যবেক্ষক। “

মিয়াগি নামের মেয়েটা আমার দিকে সামান্য বো করল।

পর্যবেক্ষক... আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ। মেয়েটা এরকম কিছু একটা বলেছিল বটে।

মিয়াগির সাথে বলা গতকালকের কথাবার্তা মনে করতে চেষ্টা করছিলাম এমন সময় বমি-বমি ভাবটা ফিরে এলো। দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে আবারো সব উগড়ে দিলাম।

পাকস্থলী খালি করে বাথরুমে থেকে বেরিয়ে আসতেই, মিয়াগিকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা হোঁচট খেলাম। ধরে নিলাম এটা তার দায়িত্ব। তবে ও কিছুতেই লাজুক মেয়ে নয়।

ওকে গ্রাহ্য না করে আমি সিন্ধের দিকে গেলাম। মুখ ধুলাম, গড়গড়া করলাম, একটা কাপ থেকে পানি পান করলাম, তারপরে আবারো বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার ভয়ঙ্কর রকম মাথা ব্যথা করছিল। আর অতিরিক্ত তাপমাত্রা এটাকে বাড়তে সাহায্য করছে।

“গতকাল যখন আপনাকে ব্যাখ্যা করেছিলাম” মিয়াগি বলল। হঠাৎ আমার বিছানার পাশে ওকে দেখতে পেলাম, “যেহেতু আপনার আয়ুষ্কাল এক বছরের কম সময় বাকি আছে, আজকের পর থেকে আমি আপনাকে পর্যবেক্ষণ করবো। অতএব...”

“এসব কি আপাতত বন্ধ রাখা যায় না?” আমি বিরক্তি নিয়ে কাঠখোঁটাভাবে বাধা দিয়ে বললাম।

“বুঝতে পেরেছি, তাহলে পরেই বলি।”

মিয়াগি ওর লাগেজ রুমের কর্ণারে নিয়ে গেল। তারপরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে, হাঁটু উঁচু করে বসে পড়ল।

এরপরে, ও শুধু আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার উদ্দেশ্য সম্ভবত যতক্ষণ আমি অ্যাপার্টমেন্টে থাকি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দিকে নজর রাখা।

“ধরে নিন আমি এখানে নেই” মিয়াগি ঘরের কোণা থেকে বলল। “আপনি একা থাকলে যা করতেন সেটাই করুন।”

আমার চেয়ে দুই বছরের বড় কিংবা ছোট একটা মেয়ে আমার দিকে সর্বদা তাকিয়ে আছে, ওর মুখের কথাতে এই বাস্তবতার কোনো হেরফের হচ্ছে না।

কিছুতেই অস্বস্তি কাটাতে পারছিলাম না, বারেবারে মিয়াগির দিকে চোখ চলে যাচ্ছিল। ও মনে হচ্ছে নোট বইতে কিছু একটা লিখছে। হয়তো এটা পর্যবেক্ষণ লগ ধরনের কিছু একটা। একতরফা নজরদারি বিরক্তিকর। আমার যে অর্ধেক অংশের দিকে ও তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছিল ওর নজরে সেই অংশটুকু ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। অবশ্যই, আমাকে গতকাল এই “পর্যবেক্ষণ” বিষয়টা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

মিয়াগির কথা মতো, আয়ুষ্কাল বিক্রির পরে এক বছরের নিচে সময় চলে আসলে অনেক মানুষই মরিয়া হয়ে ওঠে। আর যদি একা থাকে তাহলে থাকলে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করে। কী ধরনের ঝামেলা সেটার ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম না। কিন্তু আমি কিছুটা কল্পনা করতে পারি। কারণ মানুষজন নিয়মাবলি অনুসরণ করবে এই বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি হলো বেঁচে থাকা। যদি

কেউ নিশ্চিত হয়ে যায় খুব শীঘ্রই তার জীবন শেষ হতে চলেছে; তাহলে সবকিছু বদলে যাবে। পরকালে কেউ নিশ্চয় বিশ্বাস নিয়ে যেতে পারে না।

তখন পর্যবেক্ষণ সিস্টেমের সূচনা করা হলো। যাতে মরিয়া মানুষজন অন্যের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

মূলত, যাদের আয়ুষ্কাল এক বছরের নিচে থাকে তাদেরকেই পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়। যদি অনুচিত কাজ কারবার করে তাহলে পর্যবেক্ষক দ্রুত হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করেন। এবং স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল বাদ দিয়ে, তাদের জীবন সেখানেই শেষ করে দেওয়া হয়।

এর অর্থ হচ্ছে কোণায় হাঁটু উঁচু করে বসে থাকা মেয়েটার একটা ফোন কল মুহূর্তেই আমার জীবন শেষ করে দিতে পারে।

মৃত্যুর তিন দিন আগে, মানুষ অন্যের বিষয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করে দেয়; এটা সম্ভবত পরিসংখ্যান দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং আয়ুষ্কালের তিনদিন বাকি থাকা অবস্থায় পর্যবেক্ষক চলে যায়।

জীবনের শেষ তিন দিন একা থাকা যায়।

আমি সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠার পর দেখলাম আমার মাথাব্যথা এবং বমি-বমি ভাবে চলে গিয়েছে। ঘড়িতে সন্ধ্যা সাতটা দেখাচ্ছে। বলা যেতে পারে আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তিন মাসের প্রথম দিন প্রায় জঘন্যভাবে কাটালাম। মিয়াগি আগের মতোই কোণা থেকে তাকিয়ে আছে। ওর উপস্থিতি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে, সচরাচর যা করি তাই করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম।

ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে, আমার রুমেই জামা-কাপড় ছাড়লাম। বহু আগেই নীল রং হারানো একটা জিন্স এবং একটি ছেঁড়া টি-শার্ট পরে ডিনার করতে বের হলাম।

আমার পর্যবেক্ষক মিয়াগি পাঁচ কদম পিছন থেকে আমাকে অনুসরণ করতে লাগল।

পশ্চিমের উজ্জ্বল আকাশ আমাকে বলসে দিতে লাগল। আজকের সূর্যাস্তটা পুরোদস্তুর হলুদ।

দূরের ঝোপে সন্ধ্যার ঘুঘুঁরে পোকাকার ডাক শুনতে পেলাম। রাস্তার পাশের ট্রাক দিয়ে অবিন্যস্তভাবে রেলকার যেতে লাগল।

আগে জাতীয় হাইওয়ে ছিল এমন একটা রাস্তার পাশের অটো-রেস্টুরেন্টে

পোঁছালাম আমি। বিল্ডিংটা বিশাল। এর পেছনের বেড়ে উঠা গাছ ছাদটা ঢেকে ফেলেছে।

রেস্টুরেন্টের ভিতরে সারিতে এক ডজন করে ভেভিং মেশিন আছে, প্রত্যেকটার সামনে দুই চেয়ার বিশিষ্ট সরু টেবিল পাতা। টেবিলে গোলমরিচ এবং অ্যাশট্রে রাখা।

কোণায় এক দশক আগের পুরনো আর্কেড ক্যাবিনেট রাখা। যার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক জনশূন্য জায়গাটার আবহাওয়া কিছুটা রাঙিয়ে তুলেছে।

আমি নুডলসের ভেভিং মেশিনে ৩০০ ইয়েন রাখলাম। তার পরে পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করে ধূমপান করতে লাগলাম। মিয়াগি একটা টুলে বসে ঝিকিমিকি জ্বলতে থাকা লাইটের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলে ও খাবে কীভাবে? আমার মনে হয় না ও খাওয়াদাওয়া ছাড়া থাকতে পারে। কিন্তু ওর মধ্যে একটা ভুতুড়ে ভাব আছে। যদি ও বলে ওর খাওয়াদাওয়ার প্রয়োজন নেই, মনে হয় আমি সেটাও মেনে নিবো।

বলা যায়, ওকে দেখে মানুষের থেকে বরং অনেকটা যন্ত্রের মতো মনে হয়।

গরম এবং সস্তা স্বাদের তেম্পুরা সোবা গোথাসে খাওয়ার পরে, আরেকটা ভেভিং মেশিন থেকে কফি নিলাম। আইস কফির মিষ্টতা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

যদিও আর তিন মাস বেঁচে আছি, আমি এখনো ভেভিং মেশিনের অপুষ্টিকর সস্তা খাবার খাচ্ছি কারণ, কেবলমাত্র এটা সম্পর্কেই জানাশোনা আছে আমার।

অল্প কয়েকদিন আগেও জাহির করে দামী হোটেলে খাওয়াদাওয়া করা আমার জন্য কেবলই দুঃস্বপ্ন ছিল। আমি অনেকগুলো বছর দারিদ্রের সাথে বসবাস করে আসছিলাম। সে সময়ে নিশ্চয় সব কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

খাওয়াদাওয়ার পরে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে একটা কলম নিয়ে নোটবুক খুললাম। তারপরে কী কী জিনিস করবো তার একটা তালিকা করলাম।

যদিও প্রথমদিকে কোন কোন জিনিস করবো না; সেটার তালিকা করা সহজ ছিল। যতই হাত ঘোরাতে লাগলাম; ততই যে জিনিস করতে চাই তা মনে আসতে লাগল।

মৃত্যুর আগে যে জিনিস করতে চাইঃ

-স্কুলে যেতে চাই না

-কাজে যেতে চাই না

-কোনো আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখতে চাই না
-মজার কিছু খেতে চাই
-সুন্দর জিনিস দেখতে চাই
-নিজের উইল লিখে যেতে চাই
-নারসেসের সাথে দেখা এবং কথা বলতে চাই
-হিমেনোকে আমার অনুভূতি জানাতে চাই
“আমি এটার বিপক্ষে।”

আমি ফিরে তাকালাম। মিয়াগি আর কর্ণারে বসে নেই। ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে কী লিখছি সেটা দেখছে।

সে বিশেষভাবে শেষের লাইনের দিকে আঙুল তুলল, “হিমেনোকে আমার অনুভূতি জানাতে চাই।”

“পর্যবেক্ষকদের কি এরকম কে নো কিছুর মাঝে নাক গলানোর অধিকার আছে?” আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

মিয়াগি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলো না। তার বদলে আমাকে বলল,

“...মিস হিমেনোর ব্যাপারে বলে রাখি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা উনাকে সতেরো বছর বয়সে বাচ্চা জন্ম দিতে বাধ্য করেছে। এরপরে উনি হাই স্কুল ছেড়ে দিয়ে আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। কিন্তু এক বছর পরেই ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে উনার। বর্তমানে বিশ বছর বয়সে উনি একা একা বাচ্চা বড় করছেন। দুই বছর পরে, একটা করুণ সুইসাইড নোট রেখে লাফ দিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। আপনি যদি এখন উনার সাথে দেখা করতে যান তাহলে ভালো কোনো কিছুই হবে না। দিন শেষে, মিস হিমেনো আপনাকে বলতে গেলে মনেই রাখেনি। অবশ্যই, দশ বছর বয়সে আপনারা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেটাও এর মধ্যে আছে।”

আমার গলার স্বর সরছে না। মনে হচ্ছে ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের হয়ে গিয়েছে।

“...তুমি আমার সম্পর্কে এত কিছু জানো?” অবশেষে দম নিতে পারলাম। আমি যে কেঁপে উঠেছি সেটা লুকাতে চেষ্টা করতে লাগলাম। “যেভাবে তুমি কথা বলছ... তবে সামনে কী ঘটবে সব কি তুমি জানো?”

মিয়াগি কয়েকবার চোখ পিটপিট করল, তারপরে মাথা নাড়ল।

“আমি শুধুমাত্র আপনার এবং আপনার জীবনকে ঘিরে ঘটা সমস্ত সম্ভাবনা

সম্পর্কে জানি, মি. কুসুনোকি। অবশ্যই, এখন এগুলো সব মূল্যহীন তথ্য। যেহেতু আয়ুষ্কাল বিক্রির পরে আপনার ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে বদলে গিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলোর মাঝেও আমি কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো জানি।”

তখনো ওর নোটবুকের দিকে তাকিয়ে মিয়াগি ধীরে-ধীরে ডান হাত তুলে চুলগুলো কানের পিছনে ঝুঁজে দিলো।

“দেখা যাচ্ছে মিস হিমেনো আপনার জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ, মি. কুসুনোকি। আপনার জীবনের ‘সারাংশ শুধুমাত্র উনাকে দিয়েই পরিপূর্ণ।”

“এটা তাত্ত্বিক কথাবার্তা” আমি অস্বীকার করলাম। “যেমনটা অন্য সবকিছুর মতো এটাও আমার কাছে খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না, তাই না?”

“এটাও হতে পারে” মিয়াগি বলল। “যাহোক, আপনি যদি আমার কাছে পরামর্শ নেন তো বলতে পারি, মিস হিমেনোর সাথে দেখা করা আপনার জন্য সময়ের অপচয় হবে। তার যে স্মৃতি আপনার কাছে আছে; সেটা নষ্ট হয়ে যাবে।”

“আমাকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এটা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।”

“কিন্তু আপনার তো সময়টা সঠিকভাবে বিবেচনা করে ব্যবহার করা উচিত, তাই না?”

“হ্যাঁ, হয়তো। তুমি কি সত্যিই আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে এভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারো?”

মিয়াগি মাথা কাত করল। “বরং আপনাকে আমি প্রশ্ন করি, আপনার কেন মনে হচ্ছে আমি পারবো না?”

আমার কাছে এর কোনো উত্তর নেই। এমনকি যদি কোনো ঝামেলা বাধাই, মিয়াগি পট করে হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করে আমার জীবন শেষ করে দিবে।

“আমরা মন থেকে চাই, যে আপনি শান্তিপূর্ণভাবে আপনার জীবন শেষ করবেন” মিয়াগি বলল। “এর জন্য, আমি আপনার ভবিষ্যৎ আন্দাজ করে আপনাকে সতর্ক করে দিতে পারবো।”

আমি মাথা চুলকাতে লাগলাম। মেয়েটাকে কিছু একটা বলে উত্তর দিতে চাইছিলাম।

“দেখো হয়তো বা তুমি আমাকে একথা বলছ কারণ, তুমি ভাবছ আমি আঘাত পেয়ে আশা হারিয়ে ফেলবো। কিন্তু আমার আঘাত পাওয়ার এবং আশা হারানোর কারণ কিছুতেই বলতে পারো না তুমি? হ্যাঁ... যেমনটা, আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি ভাবছ আমি যদি তোমার কাছ থেকে সরাসরি না শুনে হিমেনোর কাছ থেকে শুনি, আমি আরও বেশি আঘাত পাবো। তুমি খুব বেশি অনধিকারচর্চা করে ফেলছ।”

মিয়াগি ক্লান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। “তাই নাকি। ঠিক আছে, আমার উদ্দেশ্য ভালোই ছিল। কিন্তু এটাই যদি ঘটনা হয় তাহলে... হয়তো আমি জোরপূর্বক বেশি অনধিকারচর্চা করে ফেলেছি। আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।”

ও খুব দ্রুত বো করল।

“...কিন্তু আমি একটা কথা বলবো। সামনে যা ঘটবে তা নিয়ে খুব বেশি কিছু আশা করবেন না। নিজের আয়ু বিক্রি করে দিয়েছেন। ফলে আপনার সামনে যে জগতটা অপেক্ষা করছে সেখানে যুক্তির কোনো বালাই নেই। মুক্ত চিন্তা কিংবা স্বাধীন সিদ্ধান্তের আশা করাটাও বোকামি। কারণ, স্বেচ্ছায় এই পথটা বেছে নিয়েছেন আপনি” এটুকু বলে ঘরের কোণায় ফিরে গেল মিয়াগি।

“আপনাকে আর জ্বালাতন করবো না। আপনার এই ‘কষ্ট আর আশাহীনতার কারণটা দূর করার জন্যেই এসেছিলাম। তালিকার বাকি কাজগুলো যেভাবে ইচ্ছে করতে পারেন। অন্যদের যাতে অসুবিধে না হয়, সেই বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।”

আমাকে বলতে হবে না, আমি ভাবতে লাগলাম।

মিয়াগির মলিন চেহারাটা আমি ভুলে যাইনি।

কিন্তু সেটার মানে কী হতে পারে, এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিনি আমি।

চ্যাপ্টার ৪ : লেট'স কম্পেয়ার আঙ্গার'স

মিয়াগিকে বললাম, “একটা কল করবো, এই যাবো আর আসবো,” তারপর ইচ্ছে করেই অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে গেলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল ফোনে কথা বলার সময় ও যাতে না শোনে। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না মিয়াগি পিছে পিছে ঠিকই চলে এসেছে। বেশ অনেকদিন হয়ে গিয়েছে আমি কাউকে ফোন করেছি। ফোনের স্ক্রিনের “ওকান্ডা” নাম্বারটা দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। অ্যাপার্টমেন্টের পেছনের ঝোপ থেকে গ্রীষ্মকালীন পোকামাকড়ের উচ্চস্বরের আওয়াজ আসছিল।

আমি ফোনে অতিমাত্রায় নার্ভাস হয়ে যাই। আসলে, একদম ছোটবেলা থেকেই এরকম ছিলাম। আমি কখনই কাউকেই নিমন্ত্রণ করিনি। অথবা হঠাৎ করেই কারো সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করিনি।

এটা সত্যি, এই কারণে আমি অনেক সুযোগ হারিয়েছি। কিন্তু এটা আমাকে সমপরিমাণ দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলতে সাহায্য করেছে। এ-ব্যাপারে অনুতপ্ত কিংবা সন্তুষ্ট নই আমি।

চিন্তার ট্রেন থামিয়ে দিয়ে, চিন্তাহীন কয়েকটি মুহূর্তকে কল বাটনে প্রেস করার কাজে ব্যবহার করলাম। আমাকে শুধু একটা কল করতে হবে। সত্যিকারের কথোপকথন যা হবার তা হবে

ডায়ালটোন আমার স্নায়ুর উপর চাপ ফেলল। একবার, দু'বার, তিনবার। সেই মুহূর্তে, ‘ও ফোনটা নাও ধরতে পারে’ সম্ভাবনাটা আমার মনে উদয় হলো। অনেকদিন হলো আমি কাউকে ফোন করিনি। আমার জানা মতে মানুষজন সবসময়ই ফোনের উত্তর দেয়।

চার, পাঁচ, ছয়। মনে হচ্ছে না ও “অতি শীঘ্রই” ফোনটা ধরবে। আমার মনের একাংশ নির্ভর হয়ে গেল। অষ্টমবারের সময়, আমি হাল ছেড়ে দিয়ে এন্ড বাটনে ক্লিক করলাম।

ওকান্ডা হচ্ছে কলেজের পরিচিত একটা মেয়ে। আমার চেয়ে বয়সে ছোট।

আমি ওকে ডিনার করাবো কিংবা এরকম কিছু একটার পরিকল্পনা করেছি। এবং যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, বাকি যে কয়দিন বাকি আছে সে কয়টা দিন ওর সাথে কাটাতে চাই।

সেই মুহূর্তে, হঠাৎ নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে লাগলাম আমি। প্রথম পরিবর্তনটা বুঝতে পেরেছিলাম যখন আমার জীবনের শেষটা নিশ্চিত হয়ে গেলে। সেই মুহূর্তে অন্য কারো সাথে থাকার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। অন্ততপক্ষে কারো সাথে কথা বলার প্রচণ্ড তাড়না জেগে উঠল।

ওকান্ডা হচ্ছে একমাত্র মানুষ যে কিনা কলেজে আমার প্রতি কিছুটা হলেও অনুরাগ দেখিয়েছে। ওর সাথে আমার এই বসন্তে বইয়ের দোকানে দেখা হয়েছিল। ও তখন সবে স্কুলে উঠেছে।

ওকান্ডাকে পুরাতন ধুলোবালিযুক্ত বই একাগ্রভাবে নাড়াচাড়া করতে দেখে, “এই যে ভদ্রমহিলা, সরে দাঁড়ান” ধরনের দৃষ্টি দিয়েছিলাম। কিন্তু সচরাচর যে ধরনের ভুল হলে মানুষজন অন্য একজনের জীবনে প্রবেশ করে সেরকম কিছুর মতো হয়ে গেল। ও ভেবেছে “এমন কঠোর দৃষ্টির কোনো ছেলেকে তো আমার মনে পড়ছে না, হয়তো বা আমাদের আগে কোথাও দেখা হয়েছিল?”

“এই যে... এক্সিউজ মি...আমাদের কি আগে কোথাও দেখা হয়েছিল?” ওকান্ডা ত্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করল।

“না” আমি উত্তর দিলাম। “আজকের আগে কখনো দেখিনি আপনাকে।”

“ওহ, আচ্ছা আচ্ছা...আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত” ভুল বুঝতে পেরে ওকান্ডা বলল। অপ্রস্তুত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। কিন্তু তারপরেই ও হেসে ফেলল, দ্বিতীয় আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে বলে হয়তো।

“তো, তাহলে আমাদের এই বইয়ের দোকানেই দেখা হয়েছে?”

এবার আমার বিরক্ত হওয়ার পালা। “আপনি ঠিকই বলেছেন।

“আমি জানি আমি ঠিকই বলছি। ব্যাপারটা দারুণ” একটা পুরাতন বই সেলফে রাখতে রাখতে বলল ওকান্ডা।

কিছুদিন পরে, আমরা কলেজে পুনরায় মিলিত হলাম। এরপর থেকে, আমরা একত্রে বেশ কয়েকবার লাঞ্চ করেছি, বই এবং মিউজিক নিয়ে অনেক বিশাল-বিশাল আলাপ-আলোচনা করেছি। এবং আমাদের সম্পর্কটা আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে।

“আমার প্রজন্মে আমার চেয়ে বেশি বই পড়েছে এমন কারো সাথে আমার

এর আগে দেখা হয়নি।” ওকাভা বলল জ্বলজ্বলে চোখে।

“আমি শুধুই পড়ি। এর থেকে কিছুই অর্জনের চেষ্টা করি না” আমি উত্তর দিলাম। “বইয়ের প্রকৃত মূল্য বের করে আনার ক্ষেত্রে আমার কোনো যোগ্যতা নেই। আমি শুধু পাত্র থেকে ছোট প্লেটে সুপ ঢালছি। ওটা যদি আবার প্লেট ছাপিয়ে উপচে পড়ে, তবে এটা কোনো পুষ্টি যোগাবে না।”

“তুমি কী বলছ এসব?” ওকাভা মাথাটা একটু হেলিয়ে বলল। “এমনকি যদি এটা পুষ্টিকর হিসাবে নাও দেখা যায়। আর তুমি যদি সাথে সাথে ভুলেও যাও, আমি মনে করি তুমি যা পড়েছ তা তোমার মস্তিষ্কে থেকে যাবে। আর সময়মতো ওগুলোকে কাজে লাগাবে। এমনকি যদি তুমি নাও লক্ষ্য করো তবুও।”

“আসলে, হয়তো এটা সত্যি। আমার শুধু মনে হয়েছে...আমার মনে হয় না যৌবন থাকা অবস্থায় বইয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়া খুব একটা স্বাস্থ্যসম্মত ব্যাপার। বই পড়া হচ্ছে তাদের জন্য; যাদের এছাড়া আর কিছু করার নেই।”

“তোমারও কি আর কিছুই করার নেই না-কি, কুসুনোকি?”

“পার্ট-টাইম জব ছাড়া, সত্যিই কিছু করার নেই” আমি উত্তর দিলাম।

ওকাভা কিছুতেই হাসি আটকাতে পারল না। আমার কাঁধে হালকা চাপড় মেরে বলল, “তাহলে, তোমাকে কিছু কাজ দিতে হয়।” এরপর ও আমার সেলফোনটা তুলে নিয়ে ওর নাম্বার সেইভ করে দিলো।

যদি সেই মুহূর্তে আমি জানতাম হিমেনো ইতোমধ্যে প্রেগন্যান্ট হয়েছে, বিয়ে করেছে, বাচ্চা জন্ম দিয়েছে, ডিভোর্স হয়েছে, এবং ততদিনে আমাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলেও গিয়েছে। আমি ওকাভার সাথে আরেকটু রোম্যান্টিক হতাম।

কিন্তু আমি আমার কৈশোরে হিমেনোকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প ছিলাম এবং একা থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইলাম। তাই আমি কখনই ওকাভাকে ফোন করিনি। যদিও দুই একটা মেসেজ আর কল পেয়েছিলাম। সেগুলোও খুব শীঘ্রই বন্ধ হয়ে গেল। আমি তখন ভেবেছিলাম, আমি ওকে মিথ্যা আশা দিতে পারি না।

সত্যি বলতে, আমি এমন একজন মানুষ ছিলাম যে কিনা নিজেই নিজেকে বাঁচানো কঠিন করে তুলেছিলাম।

অ্যাপারিং মেশিনে মেসেজ রেখে দেওয়া আমার ধাতের না। তার বদলে আমি ওকে ফোন করেছিলাম এই কথা লিখে, টেক্সট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

“দ্রুত সবকিছু ঘটছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু তুমি কি আগামীকাল কোথাও যেতে চাও?” এটা খুবই স্পষ্ট, কিন্তু আমার প্রতি ওকাভার অনুভূতি যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রেখে টেক্সটটা পাঠিয়ে দিলাম।

উত্তরটা সাথে-সাথেই এলো। আমি নিঃসন্দেহে স্বস্তি অনুভব করেছিলাম। এখনো কেউ একজন আছে যে আমাকে গুরুত্ব দেয়।

আমি নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে তখনই উত্তর দিতে গেলাম। আর তখনই আমার ভুল বুঝতে পারলাম।

টেক্সটটা ওকাভার থেকে আসেনি। সেটা হলেও কোনো সমস্যা ছিল না। স্ক্রিনের ইংলিশ আমাকে বলছে এরকম কোনো প্রাপকের অস্তিত্ব নেই।

বাস্তবতা আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিলো। ওকাভা ওর ঠিকানা পরিবর্তন করেছে। কিন্তু আমাকে এই ব্যাপারে জানায়নি। এর মানে হচ্ছে ও আমার সাথে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

ও দুর্ঘটনাবসত কাজটা করে ফেলেছে, এই একটা সম্ভাবনা অবশ্যই থেকে যায়। আমাকে হয়তো বা ওর নতুন ঠিকানাটা খুব দ্রুতই জানিয়ে দিবে।

কিন্তু আমার সহজাত প্রবৃত্তি বলে দিচ্ছে সত্যিটা কী। সেসময়টা অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছে।

স্ক্রিনের দিকে আমার শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকা দেখে মিয়াগি হয়তো পরিস্থিতি আঁচ করে নিয়েছে। ও দ্রুত বেগে আমার পাশে হেঁটে এসে ফোনের দিকে তাকালো।

“এখন তাহলে, চলুন উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক” সে বলল।

“যে মেয়েটাকে আপনি একটু আগে ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন, উনি ছিল আপনার শেষ আশা। মিস ওকাভাই শেষ ব্যক্তি যে কিনা আপনাকে ভালোবাসে বলে ভেবেছিলেন। আমার মনে হয়, গত বসন্তে উনি যখন আপনার প্রতি আগ্রহ দেখায়, আপনি যদি তখন কোনো পদক্ষেপ নিতেন তাহলে এই মুহূর্তে আপনারা বেশ ভালো একটা অবস্থানে থাকতেন। সেটা যদি হতো, আপনার আয়ুষ্কালের দাম এত কম হতো না... কিন্তু আপনি একটু বেশিই দেরি করে ফেলেছেন। মিস ওকাভা আপনার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছেন। না, এর চেয়েও বেশি। সম্ভবত উনার আকর্ষণ উপেক্ষা করার জন্য মি. কুসুনোকির প্রতি কিঞ্চিৎ বিদ্বেষ পোষণ করেছেন। এমনকি উনার নতুন বয়ফ্রেন্ডের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়েও দিতে পারে।”

মিয়াগি এমন স্বরে কথা বলছে যে সেটা শুনে কিছুতেই বোঝা যাবে না; ও সামনে দাঁড়ানো কারো সম্পর্কে কথা বলছে কিনা।

“শেষ পর্যন্ত, আপনাকে ভালোবেসে এগিয়ে আসার মতো আর কেউ নেই। সত্যি বলতে আপনি মানুষকে আপনার একাকিত্ব দূর করার উপকরণ হিসাবে দেখেন।”

আমি পাশের বাসা থেকে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। শুনে মনে হচ্ছে একদল কলেজের বাচ্চা। ওদের জানালা দিয়ে আসা আলোটা পর্যন্ত আমার ঘরের আলোর সাথে তুলনা করা যায় না।

আমি এর আগে এই সম্পর্কে খুব একটা পাত্তা দেইনি। কিন্তু এখন বিষয়টা তীব্রভাবে আমার হৃদয়ে আঘাত করল।

আমার ফোনটা সবচেয়ে বাজে সময়ে বেজে উঠল। ওকান্ডার ফোন। উপেক্ষা করবো কিনা চিন্তা করলাম। কিন্তু ও পরে ফোন করতে পারে এই বিরক্তি নিতে চাচ্ছি না। সুতরাং ফোনটা ধরলাম।

“কুসুনোকি! তুমি কি একটু আগে ফোন করেছিলে নাকি? কী হয়েছে?”

ও সম্ভবত স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথা বলছে। হয়তো ওর সাথে পূর্বে কথা হয়েছে বলেই; আমার মনে হলো ওকান্ডা আমার সমালোচনা করছে। যেন ও বলতে চাইছে, “এতদিন পরে আমাকে ফোন করার বিশাল কারণটা কী?”

“দুঃখিত, আমি ভুল করে ফোন দিয়েছিলাম” প্রফুল্ল কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলাম।

“সত্যি? তাই হওয়ার কথা। তুমি এমন মানুষ নও; যে কিনা প্রথমে কল করবে, তাই না কুসুনোকি?” ওকান্ডা হাসল। ওর হাসিও বিদ্রূপের মতো শোনাচ্ছিল। “যে কারণে আমি তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছি।”

“হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।” ফোন করার জন্য ওকে ধন্যবাদ দিয়ে রেখে দিলাম।

কয়েক সেকেন্ড পরেই পাশের ঘরের পার্টি আওয়াজ বেড়ে গেল।

আমার ভেতরে যেতে মনে চাচ্ছিল না। তাই সেখানে দাঁড়িয়েই একটা সিগারেট ধরলাম।

দু’টো সিগারেট ফুঁকে, একটা লোকাল সুপারমার্কেটের উদ্দেশ্যে গেলাম। সেখানে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আমার বাস্কেটে একটা ছয় প্যাকের বিয়ার, ফ্রাইড চিকেন এবং কাপ রামেন রাখলাম।

আয়ুষ্কাল বিক্রি করে পাওয়া ৩০০,০০০ ইয়েন থেকে এই প্রথমবার খরচ করলাম। আমি খুব সাবধানে কিনতে চাচ্ছিলাম। আমার আসলে কোনো ধারণাই নেই কী কিনবো।

মিয়াগি ওর নিজের বাস্কেট বহন করছিল। তাতে ক্যালরি মেইটস এবং মিনারেল ওয়াটার দিয়ে ভর্তি করে ফেলল। ও এভাবে কেনাকাটা করছে দেখে অদ্ভুত লাগল না। কিন্তু ও কেনা জিনিস খাচ্ছে এমন কল্পনা করতে কষ্টই হচ্ছে আমার।

ওকে দেখে মানুষ বলে মনে হয় না। তাই মানুষের মতো আচরণ যেমন খাওয়াদাওয়াটা ওকে ঠিক মানায় না।

তবুও...আমাদের দেখতে একসাথে থাকা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো লাগছে। মনে মনে নিজেই কথাটা ভাবলাম। এটা সত্যিই হাস্যকর কিন্তু কল্পনার দিক থেকে সুখকর।

আমি এমনকি এটাও ভাবতে লাগলাম অন্য মানুষরা আমার মতো একই হ্যালুসিনেশন দেখলে ভালোই হতো।

বলার জন্য বলছি আরকি; আমার জীবনে মিয়াগির মতো একটা মেয়ের উপস্থিতির জন্য অনেকদিন ধরে লালায়িত ছিলাম। একটা মেয়ের সাথে থাকার খায়েশ অনেক দিন ধরেই ছিল আমার। লাউঞ্জওয়ার পরা অবস্থায় খাবার দাবার এবং বিয়ার কেনাকাটা করতে যাবো।

প্রতিবারই যখন আমি কোনো যুগলকে এটা করতে দেখি, ঈষৎ দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে। এমনকি যদিও ওর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে পর্যবেক্ষণ করা, তবুও গভীর রাতে একজন তরুণী মেয়ের সাথে কেনাকাটা করাটা আমি উপভোগ করছিলাম বেশ ভালোভাবেই।

সম্ভবত, এটা অন্তঃসারশূন্য সুখ। কিন্তু আমাকে বিচার করতে আসবেন না। আমার জন্য এটাই বাস্তব।

আমার আগে খুব দ্রুতই মিয়াগি নিজের কেনাকাটা সেরে ফেলল। নিজ নিজ ব্যাগে বয়ে নিয়ে আমরা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ফিরে এলাম।

পাশের বাসার হইচই এখনো চলছে। দেয়ালের এপাশ থেকেও পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি।

সত্যি কথা বলতে, আমি ওদের প্রতি ঈর্ষান্বিত। আমার কখনই এরকম অনুভব হয়নি। যখন আমি একদল মানুষকে নিজেদের উপভোগ করতে দেখতাম,

আমি শুধু ভাবতাম “এতে মজা পাওয়ার কী আছে?”

কিন্তু মৃত্যুর চিন্তা আমার বিকৃত মূল্যায়নের উপায়টা সংশোধন করেছে। আমি অন্য সকলের মতো সাহচর্যের কাঙাল হয়ে গিয়েছি।

বেশিরভাগ মানুষই এ-সময়ে পরিবারের দিকে চেয়ে থাকে। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, মানুষ সবসময়ই পরিবারের উপর ভরসা করতে পারে। দিন শেষে এটাই হচ্ছে ফিরে আসার শেষ জায়গা। আমার জানামতে এটাই হচ্ছে বেশি প্রচলিত চিন্তাধারা।

কিন্তু “পরিবার” সবার জন্য আরামদায়ক কোনো জায়গা না। ধরা যাক, আমার কোনো পরিকল্পনাই নেই জীবনের শেষ তিন মাসে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার। কারণ, আমার হাতে এত অল্প সময় বাকি আছে যে, আমি পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে চাচ্ছি।

আমি যখন একদম ছোটো ছিলাম, আমার ছোটো ভাই নিয়মিতভাবে বাবা মায়ের স্নেহ কেড়ে নিত। প্রথম থেকেই সব দিক দিয়ে ও আমার চেয়ে এগিয়ে ছিল।

ও ছিল সৎ, লম্বা, সুদর্শন। ওর বারো থেকে এখনকার উনিশতম বছর পর্যন্ত কখনই গার্লফ্রেন্ড খরায় ভোগেনি। ও আমার চেয়েও ভালো কলেজে গিয়েছে। এমনকি ওর রিফ্লেক্সও ভালো। ন্যাশনাল হাই স্কুল বাস্কেটবল পর্যন্ত খেলেছে।

আমি ওর বড় ভাই হয়েও, কোনো ক্ষেত্রেই ওকে হারাতে পারিনি। আমি কিছুটা ধীরে শুরু করেছিলাম। ও নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর দ্রুত পার্থক্যটা বাড়িয়েই চলেছে।

স্নেহ প্রাকৃতিকভাবেই ছোটদের দিকে স্থানান্তরিত হয়। আমার সাথে অকৃতকার্যের মতো আচরণ করার জন্য আমি এমনকি বাবা-মাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলতে পারি না।

ওর সাথে তুলনা করলে আমি যে ব্যর্থ সেটা একদম সত্যি। বরং আমরা যদি একই পরিমাণ স্নেহ লাভ করতাম তবে সেটা পক্ষপাতদুষ্ট হতো।

উনাদের জায়গায় আমি হলেও একই কাজ করতাম। যে যোগ্য তাকে ভালোবাসা এবং যে অযোগ্য তাকে বাতিল করে দেওয়ার মাঝে দোষের কী আছে?

আমি যদি বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাই, তাহলে শান্তিতে পিতা-মাতার নিঃশর্ত ভালোবাসায় বসবাস করার সম্ভাবনা একদম শূন্য। এর চেয়ে বরং যদি আমি পাশের বাসার পার্টিতে হুট করে ঢুকে পড়ি, ওরা আমাকে সাথে নিয়ে

নিবে ।

মিয়াগি কোণায় বসে ওর নোটবুকে লিখছে এমতাবস্থায় আমি ওর দিকে গেলাম । “খাবে নাকি?” আমি ওকে আমন্ত্রণ জানালাম । মিয়াগি মেয়েটা কে সেটা আমি পরোয়া করি না । আমি শুধু কোন একজনের সাথে ড্রিন্ক করতে চাই । “আমি এখন ডিউটিতে আছি” মিয়াগি এমনকি না তাকিয়েই প্রত্যাখ্যান করে দিলো ।

“তুমি কী লিখছ?”

“আপনার কার্যকলাপের বিস্তারিত ।”

“ওহ, আমি এখন মাতাল ।”

“হ্যাঁ, আমি তা দেখতেই পাচ্ছি ।” মিয়াগি অসন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল ।

“শুধু তাই নয়, আমি তোমার সাথে ড্রিন্ক করতে চাই ।”

“হ্যাঁ, আমি শুনেছি” একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ও ।

চ্যাপ্টার ৫ : এভিথিং টু কাম

আমি লাইট বন্ধ করে পান করা শুরু করলাম। সৌভাগ্যক্রমে, অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ নিজেকে আরও বেশি মাতাল করতে সক্ষম হলাম।

এরকম সময়ে নিজের পায়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, নিজের অনুভূতি বিরুদ্ধে না যাওয়া। বরং হতাশা এবং নিজের প্রতি করুণার জলাশয়ে ডুব দেওয়া।

আমার চিরপরিচিত অ্যাপার্টমেন্টটা স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা অন্যরকম লাগছিল।

জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরটাকে নীল রঙে রাঙিয়ে তুলল। রাতের গ্রীষ্মের মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। কোণে মিয়াগির উপস্থিতি প্রহরীর মতো মনে হতেই, এটাকে আগের চাইতেও বেশি অতিপ্রাকৃত লাগছে। আমার অ্যাপার্টমেন্টের এরকম কোনো দিক যে আছে তা জানা ছিল না আগে।

মনে হতে লাগল আমি স্টেজের একটা উইণ্ডে আছি। যখনই এর থেকে বেরিয়ে আসবো, ঠিক তখনই আমার ক্রিয়াকলাপ দেখানোর সময় হবে।

হঠাৎ আমার মনে হতে লাগল আমি সব কিছু করতে পারবো। এটা আসলে মাতাল হওয়ার কারণে আমার প্রতিভাহীন অবস্থার কথা ভুলে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু আমি এটাকে অন্তরের কোনো পরিবর্তন বলে ধরে নিলাম।

আমি মিয়াগির দিকে ঘুরে গর্ব করে ঘোষণা করলামঃ

“আমার শেষ তিন মাসে ৩০০,০০০ ইয়েন দিয়ে আমি কিছু একটা পরিবর্তন করবো।”

এই বলেই, আমি সর্বশেষ বিয়ারটা শেষ করলাম এবং ঢকাস করে টেবিলে ক্যানটা রাখলাম।

মিয়াগিকে তেমন একটা প্রভাবিত মনে হলো না। ওর দৃষ্টি সর্বোচ্চ কয়েক ইঞ্চি তুলে বলল, “আচ্ছা” তারপরে ওর চোখ আবার নোটবুকে ফিরে গেল।

আমি কোনো কিছু মনে না করে বলে যেতে লাগলাম, “এটা তেমন বড় কিছু

না। কিন্তু এটা আমার জীবন। আমি ৩০০,০০ ইয়েনকে ৩ বিলিয়ন মূল্যে রূপান্তর করবো! পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য আমি কাজ করে যাবো। “

মাতাল হয়ে আমি ভেবেছিলাম কথাগুলো বেশ দারুণ শোনাচ্ছে।

কিন্তু মিয়াগি আমাকে করুণা করতে লাগল। “সবাই এই কথাই বলে।”

কলম একপাশে সরিয়ে রেখে হাঁটু জড়িয়ে ধরে তাতে চিবুক রাখল সে।

“আমার পর্যবেক্ষণের সময়ে অন্তত পাঁচবার একই কথা শুনেছি। মৃত্যু নিকটবর্তী হলে সবাই চরমপন্থী কথাবার্তা বলে। বিশেষত সেসব লোকজন, যারা বলতে পারবে না এই পর্যন্ত ওদের জীবন পরিপূর্ণ ছিল। একই যুক্তিতে, যে যুক্তিতে হারতে থাকা জুয়াড়ি পাশার দান ঘুরে যাবার আশায় খেলেই যেতে থাকে। যারা জীবনে প্রতিনিয়ত হারতে থাকে; তারা অবাস্তব সুখের আশা করে। মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে জীবনের দ্যুতিতে অনেকেই উজ্জীবিত অনুভব করে। তারা বিশ্বাস করে তারা এটা করতে পারবে, ওটা করতে পারবে; কিন্তু এসব লোকজন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুল করে। তারা মাত্রই শুরু করেছে। তারা মাত্রই অনেকদিনের বিরতির পরে আত্মত্যাগ ফিরে পেতে শুরু করেছে। এই সুযোগকে সবকিছু আমূল বদলে দেওয়ার সুযোগ মনে করাটা বিরাট ভুল এবং এটা তাদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না।”

“...তাই প্লিজ, মি. কুসুনোকি। এভাবে চিন্তা করুন। আপনার বাকি ত্রিশ বছরের এত কম মূল্য হওয়ার কারণ ওই সময়ে আপনি কিছুই অর্জন করেননি। আপনি ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন তো?” মিয়াগি আমাকে স্পষ্ট করে মনে করিয়ে দিলো “যে লোকটা ত্রিশ বছরে যা করতে পারেনি; সে কীভাবে মাত্র তিন মাসে সেটা করবে?”

“... ‘চেষ্টা’ করার আগ পর্যন্ত তো আমাদের জানার উপায় নেই” আমি তর্ক করলাম। আমার কথাগুলো কতটা ফাঁপা এমনকি আমি নিজেও সেটা বুঝতে পারলাম। ও যে সত্যি কথাই বলেছে তার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই।

“একটা সাধারণ পরিতৃপ্তি খোঁজার চেষ্টা করাটাকেই আমি বুদ্ধিমানের কাজ বলবো।” মিয়াগি বলল। “কিছুই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না। কোনো কিছু পরিবর্তন করার জন্য তিন মাস অনেক কম সময়। সবচেয়ে বড় কথা কিছু না করাটাই বরং পরিতৃপ্তি কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। আপনি কি একমত না যে, সুখকে ব্যাখ্যা করার জন্য ছোট ছোট আনন্দ জমানো বিচক্ষণের কাজ? মানুষ হেরে যায়

কারণ, তারা শুধু বিজয়ের কথা চিন্তা করে। ব্যর্থতার ফলাফলে মাঝে বিজয় খুঁজে পাওয়া হচ্ছে আসল ব্যাপার।”

“ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি ঠিক বলেছ। বহুত যুক্তি দিয়েছ” আমি মাথা নেড়ে বললাম। যদি আমি মাতাল না হতাম, তাহলে হয়তো ওর সাথে তর্কে যেতাম। কিন্তু আমার এখন আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই।

“আমি নিশ্চিত, আমি হচ্ছি সেসব লোকজনের একজন যে কিনা সত্যিই জানে না কিরকম অপদার্থ সে...তাই, শোনো, তাহলে কি তুমি সামনে কী ঘটবে সবকিছু খুলে বলতে পারবে? কিভাবে আমি বাকি ত্রিশ বছর কাটাতাম? যদি আমি সেটা শুনি, হয়তো যে অযৌক্তিক আশাগুলোর কথা ভেবেছি তা আমি বন্ধ করে দিতে পারবো।”

মিয়াগি বেশ কিছুক্ষণের জন্য মুখ খুলল না। তারপরে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

“আমারও তাই মনে হয়। সম্ভবত এখন সবকিছু জানা আপনার জন্য ভালো... যাহোক, শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, আমি যা বলবো এসব শুনে আপনার হতাশ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি যা বলবো সেগুলো হচ্ছে সম্ভাবনা। এখন সেগুলো হচ্ছে এমন কিছু ঘটনা যা আদৌ কখনো ঘটবে না।”

“আমি জানি। আমি শুধু আমার নিয়তিটা শুনতে চাচ্ছি। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমি তোমাকে উল্টাপাল্টা কিছু বলবো না। আর উল্টাপাল্টা কিছু বলার মতো কোনো বিষয় থাকলে তবেই না উল্টাপাল্টা কিছু বলবো।”

“আশা করছি এরকম কিছু হবে না।” মিয়াগি বলল।

মাটি কেঁপে উঠার মতো শব্দ পেলাম আমি। মনে হচ্ছে সুবিশাল কোন টাওয়ার মুখ খুবড়ে পড়ছে। শব্দটা যে আতশবাজির সেটা বুঝতে আমার কিছুটা সময় লেগেছে, যেহেতু অনেক বছর হলো আমি সত্যিই আতশবাজি দেখতে যাইনি।

আমি যা কিছু দেখেছি সবসময়ই সেটা জানালা দিয়ে দেখেছি। স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে খাবার খেতে খেতে কিংবা গার্লফ্রেন্ডের হাতে হাত রেখে একবার ওর দিকে এবং আরেকবার সেগুলোর দিকে তাকানোর মতো কিছুই দেখা হয়নি।

যে মুহূর্ত থেকে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারলাম; সেই মুহূর্ত থেকেই নিজেকে সমাজচ্যুত করে ফেললাম। যে কি-না গণজমায়েত পরিহার করে চলে। এসব জায়গায় গেলে মনে হতো ভুলক্রমে এসে পড়েছি। সেখানে পরিচিত কারো

সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার চিন্তা আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিতো।

এলিমেন্টারি স্কুলে থাকতে যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ আমাকে জোর করতো, আমি কখনই পার্কে, পুলে, স্কুলের পেছনের পাহাড়ে যাইনি। এমনকি কেনাকাটা করতে, সামার ফেস্টিভ্যাল, অথবা কোনো আতশবাজির প্রদর্শনীতেও যাইনি।

হাই স্কুলেও, কোনো সাফল্যমণ্ডিত জায়গায় আশপাশেও যেতাম না আমি। শহরে হাঁটার সময় যতটা পারা যায় প্রধান সড়ক এড়ানোর চেষ্টা করতাম।

শেষবার আতশবাজি পুড়তে দেখেছিলাম যখন আমি খুব ছোট ছিলাম।

আরও ঠিক করে বলা যায় তখন হিমেনোও সাথে ছিল।

আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছি খুব কাছ থেকে বিশাল আতশবাজি দেখতে কেমন। কাছ থেকে কত জোরে আওয়াজ হয় সেটাও ভুলে গিয়েছি।

ওটা থেকে কি গানপাউডারের গন্ধ আসে? আকাশে ঠিক কতটুকু ধোঁয়া থাকে? আতশবাজির দিকে তাকিয়ে থাকার সময় মানুষজনের চেহারা কেমন হয়?

এভাবে প্রতিটি খুঁটিনাটি চিন্তা করে, আপাতত দেখা যাচ্ছে আমি আসলে আতশবাজি সম্পর্কে কিছুই জানি না।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর লোভ লাগছিল। কিন্তু মিয়াগি পর্যবেক্ষণ করা অবস্থায় এরকম শোচনীয় কিছু করতে মনে চাচ্ছে না। যদি তা করি, ও হয়তোবা এরকম কিছু একটা বলবে, “যদি আপনার এতই আতশবাজি দেখার শখ থাকে তাহলে বাইরে বের হয়ে দেখছেন না কেন?”

আমি কিভাবে এর উত্তর দিবো? আমি কি ওকে বলবো যে, আমি খুবই ভীতু। সবার চোখ যদি আমার দিকে পড়ে তবে সেটা সামলানোর ক্ষমতা আমার নেই। অন্যরা আমাকে নিয়ে কী ভাববে সেটা নিয়ে কেন চিন্তা করছি? যখন আমার হাতে এত অল্প সময় বাকি আছে!

নিজের ইচ্ছের সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে বলেই মিয়াগি সম্ভবত আমাকে টিটকারি মেরে; আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে জানালা খুলল। তারপরে জানালায় ঝুঁকে আতশবাজি উপরে উঠে যাওয়া দেখতে লাগল।

সুন্দর কিছু দেখে অভিভূত হওয়ার চেয়ে, ও মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক কোনো দৃশ্যের প্রশংসা করছে। যা-ই হোক না কেন, দেখে অন্তত মনে হচ্ছে ও এতে আগ্রহ পাচ্ছে।

“আরেহ, বাহ। তোমার কি এগুলো দেখার সুযোগ আছে নাকি, মিস পর্যবেক্ষক? আমি যদি হঠাৎ সরে পড়ি তাহলে কী করবে তুমি?”

আতশবাজি দেখতে দেখতে মিয়াগি ব্যঙ্গ করে বলল, “আপনি কি চাইছেন, আমি আপনার ওপর নজর রাখি?”

“আরে নাহ। আমি চাই তুমি যত দ্রুত সম্ভব চলে যাও। তুমি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমার জন্য কোনো কিছু করা কঠিন হয়ে যায়।”

“সত্যি নাকি? সম্ভবত আপনার নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী লাগছে। আপনি যদি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং আমার থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব তৈরি করেন; আমি ধরে নিবো আপনি ঝামেলা পাকনোর চেষ্টা করছেন। আমি তক্ষুনি আপনার জীবন অবসান করে দিবো। আমার পরামর্শ থাকবে আপনি সাবধানে থাকবেন।”

“কী রকম দূরত্ব?”

“নির্দিষ্ট করা নেই কিন্তু ধরে নিন ১০০ মিটার।”

একথা যদি ও প্রথমেই বলতো।

“আমি সাবধানে থাকবো” ওকে বললাম।

পর পর বেশ কয়েকবার একই ধরনের আওয়াজ আকাশ থেকে ভেসে আসতে লাগল। প্রদর্শনীটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে মনে হচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম পাশের বাসার সবকিছু শান্ত হয়ে গিয়েছে। হয়তো ওরাও আতশবাজি দেখতে গিয়েছে।

তারপর অবশেষে, মিয়াগি কথা বলতে শুরু করল। যা যা ঘটতে পারতো প্রায় সবকিছুই

“তো এখন, আপনার শেষ ত্রিশ বছর... প্রথমেই, আপনার কলেজ লাইফ চোখের পলকেই শেষ হয়ে যেত” মিয়াগি বলল।

“আপনি কেবলমাত্র বিল দেন, বই পড়েন, মিউজিক শোনেন, এবং ঘুমান। ধীরে-ধীরে এক একটি অন্তঃসারশূন্য দিন থেকে আরেকটি দিনকে আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। একবার এটা ঘটলে সময় দ্রুত চলে যেত। আপনি কলেজ থেকে বলতে গেলে কিছু না শিখেই পাস করতেন। হাস্যকরভাবে যে সময়টা আপনি আশা করে কাটিয়েছিলেন; ওই সময়টার প্রতি ঘৃণা জন্মাতো।”

“আপনি জানতেন তখন আপনার উচিত ছিল বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া। কিন্তু নিজেকে বিশেষ কিছু একটা মনে করার ধারণা থেকে বের হতে পারতেন না। আপনি অন্য সবার মতো দলের অংশভুক্ত না; এটা বিশ্বাস করতেন বিধায় আপনি কখনই অভ্যস্ত হতে পারতেন না। শূন্য দৃষ্টিতে আপনি বাসা এবং অফিসে

আসা যাওয়া করতেন। দিনে দিনে আপনি ড্রিঙ্ক করা উপভোগ করতেন। একদিন বিখ্যাত কেউ হবেন এই বিশ্বাস যখন উধাও হয়ে যেতে শুরু করে; তখনই আপনি আপনার ছোটবেলার ফ্যান্টাসি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন।“

“অস্বাভাবিক এমনটা বলতে পারছি না।” আমি আশ্তে করে বললাম।

“অবশ্যই, অস্বাভাবিক না। এটা প্রায় প্রচলিত ধরনের হতাশা। অবশ্যই, বেদনা মানুষ ভেদে পরিবর্তন হয়। আপনি অবশ্যই এমন একজন মানুষ যার কিনা সবার কাছে সুপিরিয়র হওয়া প্রয়োজন ছিল। কেউ আপনার উপর নির্ভর না করার ফলে আপনার জগতে আপনি একাই থাকতেন। আত্মবিশ্বাস ভেঙে পড়লে কষ্টটা আপনাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতো।”

“ধ্বংস?” আমি পুনরাবৃত্তি করলাম।

“আপনি বুঝতে পারবেন আপনি ত্রিশের শেষের দিকে চলে এসেছেন। একাকী উদ্দেশ্যবিহীনভাবে মোটর সাইকেলে ঘুরে বেড়ানো আপনার শখে পরিণত হবে। কিন্তু আপনি নিজেই জানবেন এটা বিপজ্জনক শখ। বিশেষত সেসব মানুষদের জন্য; যারা কিনা ইতোমধ্যে তাদের জীবনের উপর থেকে হাল ছেড়ে দিয়েছে। একদিন আপনার বাইকের সাথে কোনো একজনের গাড়ির সংঘর্ষ হবে। তবে কোনো পথচারী আহত হবে না। শুধু আপনি বাদে। কিন্তু আঘাতটা হতো তীব্র। আপনি আপনার অর্ধেক চেহারা হারাতেন, হাঁটার ক্ষমতা হারাতেন, এবং প্রায় সবগুলো আঙুল হারাতেন।“

“অর্ধেক চেহারা হারাতেন” কথাটা শুনে বোঝা খুব সহজ কিন্তু কল্পনা করা কঠিন।

সম্ভবত এটা এমন ভয়ঙ্কর যে মানুষ একবার তাকালেই সাথে সাথে বলে, “ওখানে এক সময় একটা চেহারা ছিল।”

“যেহেতু আপনি নিজে; নিজেকে ছাড়া আর কারো উপর নির্ভর করতেন না, সেহেতু আপনি আপনার শেষ অবলম্বন শেষ করে দেওয়ার কথা চিন্তা করতেন। কিন্তু সর্বশেষ ধাপে ঝাঁপ দিতে পারতেন না। এমনকি আপনি শেষ আশা ছাড়তে পারতেন না। ‘হয়তো বা সমানে ভালো কিছু একটা ঘটবে।’ ...অবশ্যই, এটা কেউই সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু এটা কেবলই এমন একটা অবস্থা যে কিছুতেই এটার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; এরচেয়ে বেশি কিছু নয়। সেই অনির্ভরযোগ্য আশা আপনাকে পঞ্চাশ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত

না চূড়ান্তভাবে আপনি একা-একা মারা না যাবেন। কেউ আপনাকে ভালোবাসবে না। কেউ আপনাকে মনে রাখবে না। সবকিছু এভাবে হওয়ার কথা ছিল না; এই কষ্ট পেয়ে আপনার জীবনাবসান হবে।”

বড়ই অদ্ভুত।

ও যা বলেছে আমি তা সাগ্রহে মেনে নিলাম।

“তো, কী ভাবছেন?”

“ঠিকই আছে। প্রথমেই বলতে চাই আমি সত্যি খুশি। সম্পূর্ণ ত্রিশ বছর বিক্রি করে দিয়েছি বলে।” আমি উত্তর দিলাম।

এটা আঙুর ফল টকের মতো না; যেমনটা মিয়াগি বলেছিল। এগুলো ঘটার আর সম্ভাবনা নেই, এগুলো আসলে কখনই ঘটবে না।

“ধুর, আমার মনে হয় তিন মাসের বদলে তিন দিন রেখে বাকিটা বিক্রি করে দিলে ভালো হতো।”

“আসলে, সেজন্য এখনো সময় আছে, মিয়াগি বলল। “আপনি আরও দু’বার আয়ুষ্কাল বিক্রি করতে পারবেন।”

“এবং তিন দিন হয়ে গেলে তুমি চলে যাবে, ঠিক?”

“হ্যাঁ, যদি সত্যিই আপনি আমার উপস্থিতি মেনে নিতে না পারেন, তাহলে এটা একটা ভালো সুযোগ।”

“আমার মনে থাকবে কথাটা।” আমি বললাম।

সত্যি বলতে, তিন মাসের মধ্যে কিছু একটা হবে এই আশায় না থেকে, মাত্র তিন দিন রেখে দেওয়াটাই শ্রেয়।

‘হয়তো বা সামনে ভালো কিছু একটা ঘটবে। সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল বিক্রির ব্যাপারে; এই আশাটা আমাকে বাধা দিচ্ছে।

আসছে তিন মাস এবং আমাকে বলা মিয়াগির “হারানো ত্রিশ বছর” সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করার মতো অসম্ভব কিছু না।

তো ভালো কিছু একটা ঘটতেও পারে।

এই সম্ভাবনাটা একদম ফেলে দেওয়া যায় না। এভাবে চিন্তা করলে, আমি অন্তত এখনো মরতে পারি না।

বৃষ্টির শব্দে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম। ভাঙা পাইপ দিয়ে অবিরাম বৃষ্টির পানি রাস্তায় পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সময় রাত তিনটা।

একটা মিষ্টি ঘ্রাণে সম্পূর্ণ ঘর ভরে গিয়েছে। অনেকদিন হলো গন্ধটা পাইনি। সেজন্য আমার বেশ কিছুটা সময় লাগল বুঝতে যে এটা মেয়েদের শ্যাম্পুর ঘ্রাণ।

প্রসেস অভ এলিমিনেশন পদ্ধতি অনুসরণ করে আমি বুঝতে পারলাম এটা নিশ্চিতভাবেই মিয়াগির কাছ থেকে আসছে। আমি ঘুমে থাকা অবস্থায় মিয়াগি গোসল করেছিল।

যাহোক, উপসংহারে আসা আমার জন্য একটু কঠিনই ছিল। বড়াই করার জন্য বলছি না কিন্তু আমার ঘুম এতটাই পাতলা যে এটাকে তন্দ্রাও বলা যেতে পারে।

এমনকি ক্ষুদ্রতম শব্দও যেমন, পত্রিকা ডেলিভারি দেওয়া অথবা উপরতলার পায়ের শব্দও আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমার ঘুম একবারের জন্যও না ভাঙিয়ে মিয়াগি গোসল করতে পারবে এটা ভাবা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

হয়তো বা বৃষ্টির সাথে মিশে গিয়েছিল শব্দটা

এই বিষয়ে চিন্তা করা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। মাত্রই পরিচয় হওয়া একটা মেয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টে গোসল করেছে চিন্তা করাটা বেশ অদ্ভুত। তাই আমি পুরোপুরিভাবে এটা নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করে দিলাম।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো আমার আগামীকালের জন্য ঘুম প্রয়োজন। এরকম বৃষ্টিস্নাত রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছে! ভালো কথা, এমনটা ঘটতেই পারে।

কিন্তু আবার ঘুমানো সহজ কোনো কাজ না। সুতরাং সচরাচর যা করি, মিউজিকের শক্তি ধার নিলাম। বিক্রি না করা একটা সিডি তুলে নিলাম, “প্লিজ, মি. লস্টম্যান” প্লেয়ারে ছেড়ে দিয়ে হেডফোন দিয়ে শুনতে লাগলাম।

আমি যা ভাবছি এটা ঠিক সেটাই, কিন্তু যেসকল মানুষজন নিঘুম রাতে মি. লস্টম্যান শোনে তারা যথাযথ জীবনযাপন করতে পারে না। আমি এরকম মিউজকের সাথে নিজেকে অভ্যস্ত করেছি। কারণ, এই পৃথিবীর সাথে নিজেকে খাপ-খাওয়াতে আমার একটা ছুতা প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত আমি এর জন্য এখনো মূল্য চুকিয়ে যাচ্ছি।

চ্যাপ্টার ৬ : ওয়ান হু চেঞ্জড, ওয়ান হু নেভার ডিড

সকালেও বৃষ্টি পড়তে লাগল। এতই ভারী বৃষ্টি হতে লাগল যে তখনই বিছানা না ছাড়ার একটা অজুহাত পেয়ে গেলাম। এই কারণে এরপরে কী করবো সেটা নিয়ে ভাবার সময় পেয়ে গেলাম।

যখন আমি “মৃত্যুর আগে যা যা করতে চাই” লিস্টটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, মিয়াগি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, “আজকের দিন কিভাবে কাটাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?”

ওর মুখ থেকে দুঃসংবাদ শোনার জন্য অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি আমি। তাই ওর পরবর্তী কথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ও যা-ই বলুক না কেন; ঝটকা না খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু আমার লিস্টের দিকে তাকিয়ে ও শুধু এইটুকুই বলল। প্রশ্নটায় কোনো গভীর অর্থ আছে বলে মনে হলো না।

আমি মিয়াগির দিকে আরেকবার তাকালাম।

ওর সাথে প্রথমবার দেখা হওয়ার সময় থেকেই আমি একথা ভাবছি। ওর হাবভাবে সুশৃঙ্খলার বদলে নিজস্বতা আছে।

স্বীকার করতে দোষ নেই, ও একদম ঠিক আমি যেরকম মেয়ে পছন্দ করি; সেরকম ধরনের। সতেজ চোখ, বিষণ্ণ ভ্রু, সরু ঠোঁট, মাপা মাথা, ঝরঝরে চুল, নার্ভাস আঙুল, সরু উরু; আমি আরও বলে যেতে পারবো।

এই কারণে ও আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসার পর থেকে, আমার আচার আচরণ একটা চক্রের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়েছে।

আমার রুচির সাথে একদম যথাযতভাবে মিলে যায় এমন একটা মেয়ের সামনে অসাবধানতাবসত হাইও তুলতে পারি না। আমি আমার অভিব্যক্তি এবং শ্বাসপ্রশ্বাস লুকাতে চাচ্ছিলাম।

আমার পর্যবেক্ষক যদি ঠিক ওর বিপরীত কেউ হতো। কুৎসিত, নোংরা এবং মধ্য-বয়সি কেউ; নিশ্চিত আমি আরও বেশি আয়েশ করতে এবং সঠিক কাজ করার জন্য যথেষ্ট চিন্তা করতে পারতাম।

কিন্তু মিয়াগিকে পেয়ে আমার বিকৃত কামনা এবং দীনহীন আকাঙ্ক্ষা চাগিয়ে উঠল।

“এটা শুধুই নিজস্ব মতামত” মিয়াগি বলতে শুরু করল। “কিন্তু আপনি কি সত্যি অন্তর থেকে ‘যা যা করতে চাই’ এর লিস্ট অনুযায়ী কাজ করতে চান?”

“আপাতত, সেরকমই চিন্তা-ভাবনা আমার।”

“আমি যদি ভুল না বলে থাকি, আমার মনে হচ্ছে আপনি এমন জিনিসের তালিকা করেছেন; যা কিনা আপনার কাছে মনে হয়েছে অন্যরাও মৃত্যুর আগে করতো...”

“তুমি সম্ভবত ঠিকই বলেছ” আমি স্বীকার করে নিলাম। “হয়তো বা মৃত্যুর আগে আমি সত্যিই কিছু করতে চাই না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি আসলে কিছুই করতে পারবো না। সেজন্য আমি অন্যকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছি।”

“আমার মনে হয় চাইলে আপনি এরচেয়ে ভালো কোনো উপায় পেয়ে যাবেন।”

আমার উপরে কিছুক্ষণ জ্ঞান ফলিয়ে, মিয়াগি ওর নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

সেই সকালে আমি যে উপসংহারে পৌঁছলাম তা হলো।

আমার বিকৃত কামনা এবং দীনহীন আকাঙ্ক্ষাটা আরেকটু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমার সস্তা চিন্তা করা উচিত, আরও নির্লজ্জ, আরও অভদ্র হওয়া উচিত, এবং আমার শেষ কয়েকটি মাস নিজের সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে চলা উচিত।

এই পর্যায়ে সংশোধন করার প্রয়োজন কী? আমার তো হারানোর কিছুই নেই।

আমি আবারো তালিকার দিকে তাকালাম। তারপরে, নিজেকে প্রস্তুত করে একজন বন্ধুকে ফোন করলাম।

এবার, অল্প কয়েকটা ডায়ালটোনের পরে, উত্তর এলো।

একটা ছাতা নিয়ে বের হলাম আমি। কিন্তু যে সময়ে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছলাম, ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে।

পরিস্কার আকাশের নিচে সঙ্গে ছাতা রাখার অর্থ হচ্ছে, একটু আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টিটাকে অযৌক্তিক কোনো মিথ্যার মতো মনে হয়।

ভেজা রাস্তা জ্বলজ্বল করছিল। উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য স্টেশনের ভেতরে গেলাম। কিন্তু ভেতরেও একই অবস্থা।

অনেকদিন হয়ে গেছে ট্রেনে চড়িনি। ওয়েটিং রুমে ঢুকে ভেঙিং মেশিন থেকে একটা সোডা কিনলাম। বেঞ্চে বসে তিন টোকে ড্রিংকসটা শেষ করলাম। মিয়াগি ওর জন্য মিনারেল ওয়াটার কিনে, চোখ বন্ধ করে ঢকঢক করে গিলে ফেলল।

আমি জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। একটা ক্ষীণ রংধনু তৈরি হচ্ছে। আমি ভুলেই গিয়েছি এমন বিস্ময় কখনো ঘটেছিল কিনা।

রংধনু দেখতে কেমন হয় তা আমি অবশ্যই জানি। যখন রংধনু সৃষ্টি হয়, কিভাবে মানুষ রংধনুর সাথে জড়িয়ে যায়। কিন্তু কোনো কারণে “এটা যে সত্যি” আমি এই প্রাথমিক জ্ঞানটাই ভুলে বসে আছি।

একটা নতুন জিনিস খেয়াল করলাম, আকাশের বিশাল ধনুকের ছিলার মতো বাঁকানো বস্তুটার মধ্যে আমি মাত্র পাঁচটা রং দেখতে পাচ্ছি, লাল, হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনি। সাতটার মধ্যে দুইটি দেখতে পারছি না।

কোন কোন রং বাদ পড়ে যাচ্ছে চিন্তা করে কাল্পনিক প্যালেটে রং মেশাতে লাগলাম। তারপরেই বুঝতে পারলাম যে দুটি রং আমি দেখতে পারছিলাম না সেগুলো হচ্ছে কমলা এবং বেগুনি নীল।

“হ্যাঁ আপনার উচিত ভালো করে দেখে নেওয়া” মিয়াগি বলল এক পাশ থেকে। “এটাই হয়তো আপনার দেখা শেষ রংধনু হতে পারে।”

“হ্যাঁ,” আমি মাথা নাড়লাম। “আমরা যদি ব্যাপারটা আরও বিস্তারিত বলি, আমি সম্ভবত আর কোনো ওয়েটিং রুম ব্যবহার করতে পারবো না। অথবা এটা ড্রিংকিং সোডার স্কেট্রেও ঘটতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে শেষবার মতো ক্যানটা ছুড়ে মারলাম।”

“যে-কোনো কিছুই সম্ভবত শেষবার। কিন্তু এটা সবসময়ই এভাবেই সাজানো ছিল। এমনকি আমি আয়ুষ্কাল বিক্রির আগেও” আমি বললাম। কিন্তু মিয়াগির কথাটা আমাকে উতলা করে তুলল।

রংধনু, ওয়েটিং রুম, সোডা, ক্যান এসব কে পাত্তা দেয়। কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঠিক কয়টা সিডি শুনতে পারবো আমি? কয়টা বই পড়তে পারবো? কয়টা সিগারেট খেতে পারবো? ব্যাপারটা চিন্তা করে, হঠাৎ কেন জানি ভয় পেতে শুরু করলাম। মৃত্যু মানে হচ্ছে কোনো কিছু করতে না পারার অক্ষমতা

নারসের সাথে দেখা করতে, ট্রেন থেকে নেমে বাসে করে পনেরো মিনিটে যাওয়ার মতো দূরত্বের একটা রেস্টুরেন্ট গেলাম।

নারুসে হচ্ছে আমার হাই স্কুলের বন্ধু। ও আমার মতো মাঝারি উচ্চতার। হয়তো একটু খাটো, সাথে অনেকটা বাটালির মতো দেখতে মুখ।

ওর মাথা খুব দ্রুত চলে। ও এমনভাবে কথা বলে যে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং ওকে ওর সঙ্গীরা পছন্দ করে।

ভাবতেই অবাক লাগে আমার মতো সমাজ থেকে পরিত্যক্ত একজনের সাথে ওর ভালো সম্পর্ক আছে।

আমাদের মাঝে সামান্যতম মিলও নেই। এবং পৃথিবীর যে কোনো বিষয় নিয়েই আমরা প্রাণখুলে হাসতে পারি।

হাই স্কুলে থাকতে, ফাস্ট-ফুড রেস্টুরেন্টে আমরা অনেকক্ষণ যাবৎ বসে থাকতাম। প্রতিদিনকার নানা বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোপ করতাম।

আমি ওভাবে আরও একবারের জন্য হাসতে চাই। এটাই ছিল আমার প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু আরেকটা কারণ আছে ওর সাথে দেখা করতে চাওয়ার জন্য।

নারুসের জন্য অপেক্ষা করার সময়, মিয়াগি আমার পাশে বসল। টেবিলটা চারজনের বসার জন্য বানানো। কিন্তু সিটগুলো খুব একটা প্রশস্ত নয়, তাই বলতে গেলে মিয়াগি এবং আমি পাশাপাশিই বসেছি।

মিয়াগি খুব কাছ থেকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। মাঝে মাঝে আমাদের চোখে চোখ পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ও কিছু মনে না করেই এক নজরে তাকিয়ে থাকল।

কোথাও গেলে, সবসময় মিয়াগি আমার পেছনে ঝুলে থাকে। তাই নারুসে আমার আর মিয়াগির সম্পর্ক নিয়ে ভুল বুঝবে। এমনটাই আশা করছি আমি।

সাথে এ-ও বুঝতে পারছি এই আশা কতটা অসহনীয় হতে পারে আমার জন্য। কিন্তু আমি যদি কিছু করতেই চাই, আমার তা করতেই হবে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, কিন্তু আয়ুষ্কাল বিক্রির পরে “আমি করতে চাই” এই তালিকার এটাই প্রথম কোনো কিছু যা নিয়ে স্পষ্টভাবে ভেবেছি আমি।

“এই যে, মিস পর্যবেক্ষক” আমি মিয়াগিকে বললাম।

“কী?”

ঘাড় চুলকে আমি বললাম “আসলে, আমার একটা অনুরোধ...”

যে ছেলেটা আসবে তাকে যেন যথাযথ উত্তর দেওয়া হয় সেই অনুরোধ করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি খেয়াল করলাম একজন ওয়েট্রেস আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চওড়া হাসি দিচ্ছে। “এক্সিউজ মি,

আপনি কি অর্ডার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত?”

কিছুক্ষণের জন্য থেমে আমি কফি অর্ডার করলাম। ওয়েট্রেস তখন অর্ডার নিশ্চিত করছিল; আমি মিয়াগির দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলাম।

“তুমি কিছুই অর্ডার করবে না?”

আমার কথা শুনে, মিয়াগি জবুথবু মুখ করে রইল।

“....উম, অন্যেদের সামনে আমার সাথে কথা বলা উচিত না।”

“কী? এতে দোষের কী আছে?”

“আমার মনে হয় আমি আপনাকে আগেই ব্যাখ্যা করেছি, কিন্তু ... দেখুন, আসলে, যাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সে ছাড়া আর কেউই পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি বুঝতে পারে না।”

মিয়াগি ওয়েট্রেসের জামার আস্তিন ধরে আস্তে করে টানতে লাগল। অবশ্যই মিয়াগির কথা মতো, কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

“আমার সাথে ঘটা যে-কোনো শারীরিক স্পর্শ এমনভাবে দেখা হয়; যেন ব্যাপারটা কখনও ঘটেনি” একটা গ্লাস তুলে নিয়ে মিয়াগি বলল। “যদিও আমি এই গ্লাসটি তুলে নিয়েছি। ব্যাপারটা এমন নয় যে, সে এই মুহূর্তে গ্লাসটিকে শূন্যে ভাসতে দেখছে; বলা যেতে পারে, গ্লাসটিকে আমি ধরার পরে সে হঠাৎ ওটাকে উধাও হয়ে যেতেও দেখে না আবার গ্লাসটি নড়াচড়া করছে এমনটাও দেখে না। অর্থাৎ এমনটা যেন ঘটেনি। আমি ‘এখানে’ আছি এমনটা অনুভূত হয় না। আবার আমি ‘এখানে নেই’ এমনটাও অনুভূত হওয়ার নয়। যাহোক, একটাই ব্যতিক্রম আছে। একমাত্র ব্যক্তি; যে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি অনুভব করবে পারবে, সে হলো পর্যবেক্ষিত হওয়া ব্যক্তি নিজেই। সমস্যা হচ্ছে, যখন আমি মূলত “অস্তিত্বহীন” থাকি বা যে আমার সম্পর্কে জানে; তার কাছে অস্তিত্বহীন হওয়া সম্ভব না। আসল কথা হচ্ছে, মি. কুসুনোকি, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বর্তমানে অদৃশ্য কারও সাথে কথা বলছেন।”

আমি ওয়েট্রেসের অভিব্যক্তির দিকে খেয়াল করলাম।

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমি বদ্ধ কোনো উন্মাদ। কয়েক মিনিট পরে আমার কফি আসলে আমি ওতে চুমুক দিতে দিলাম। কফি শেষ করে, নারুসের সাথে দেখা না করেই এখান থেকে চলে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম।

যদি ও আর কয়েক সেকেন্ড পরে আসতো, আমি নিশ্চিত; তাই করতাম

আমি। কিন্তু আমি নিশ্চিত হওয়ার আগেই নারুসেকে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দেখলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গিয়ে ওকে অভিবাদন জানলাম।

আমরা বসার পরেই, আমাদের পুনর্মিলন নিয়ে ওকে খুব খুশি দেখাতে লাগল। অবশ্যই ও আমার পাশে মিয়াগিকে দেখতে পায়নি।

“অনেকদিন হলো দেখা নেই। তুই ভালো ছিলি তো?” নারুসে জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়।”

আর ছয় মাসও বাঁচবে না এমন একজনের জন্য কথাটা খাটে না, আমি ভাবলাম।

বর্তমানে দিনকাল কেমন যাচ্ছে বলার পরে, আমরা এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলাম; যেন আমরা হাই স্কুলে ফিরে গিয়েছি।

আমরা কি নিয়ে কথা বলেছি; সেটা ঠিকমতো মনে করতে পারছি না। কিন্তু আমাদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু অবশ্যই প্রয়োজনীয় কিছু ছিল না।

আমরা সবকিছু নিয়েই কথা বলেছি। এটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। নারুসে আর আমি এমন নগণ্য সব বিষয় নিয়ে কথা বলেছি এবং হেসেছি; যা সাথে সাথেই ভুলে গিয়েছি।

আয়ুষ্কাল নিয়ে একটা কথাও বললাম না আমি। ও বিশ্বাস করবে কিনা আমি নিশ্চিত না। আমাদের মধ্যে যে রসায়নটা ছিল; সেটা নষ্ট করতে চাচ্ছিলাম না।

যদি নারুসে জেনে যায়; আমি আর কয়েক মাস বেঁচে আছি, সে সম্ভবত অন্যরকম আচরণ করবে। আমার সাথে রুঢ় আচরণ না করার চেষ্টা করবে। সব ধরনের রসিকতা বন্ধ করে দিবে এবং আমাকে সান্ত্বনা বাণী শোনানোর চেষ্টা করবে। আমি এসব আবোলতাবোল কথাবার্তা চিন্তা করতে যেমন চাই না; তেমনি শুনতেও চাই না।

ওর মুখ থেকে সেই কথাটা বের হওয়ার আগ পর্যন্ত, আমি বলবো আমার মজাই লাগছিল।

“বাই দ্য ওয়ে, কুসুনোকি” হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে নারুসে বলল। “তুই কি এখনো আঁকিস?”

“না” আমি চটপট উত্তর দিলাম, তারপরে সতর্কতার সাথে সঠিক কথা খুঁজতে লাগলাম বলার জন্য। “...কলেজে ওঠার পর থেকে একটুও আঁকিনি।”

“আমিও তাই ভেবেছি” নারুসে বলল। “তুই যদি এখনো আঁকতিস, তাহলে

যে আমি কী করতাম ভেবে পাই না।”

এই কথাটাই কফিনের শেষ পেরেক ঠুকে দিলো। আমি জানি এটা অদ্ভুত, কিন্তু এই দশ সেকেন্ডে ওর প্রতি গত তিন বছর ধরে যত টান ছিল, সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

ও যখন মুখ চালিয়ে যাচ্ছিল, আমি মনে মনে ওর নাম ধরে ডাকলাম।

ওই, নারুসে।

এটা তোর মশকরার বিষয় না।

এটা সত্যি, আমি আঁকাআঁকি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এটা নিয়ে হাসাহাসি কিংবা মশকরা করতে পারবি।

ধীরে-ধীরে আমি ওকে অন্তঃসারশূন্য হাসি ফিরিয়ে দিতে লাগলাম। সিগারেট ধরিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিলাম আর নারুসের দিকে শুধু মাথা দোলাতে লাগলাম।

মিয়াগি আমার পাশ থেকে কথা বলে উঠল।

“...তাহলে এখন, চলুন উত্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখি।”

আমি হালকা মাথা ঝাঁকালাম, ও অগ্রাহ্য করে গেল ব্যাপারটা।

“মনে হচ্ছে এখন আপনি মি. নারুসেকে কিছুটা ঘৃণা করা শুরু করেছেন। কিন্তু সত্যি বলতে, আপনি যেমনটা ভাবছেন মি. নারুসেও আপনাকে তেমন একটা পছন্দ করে না। মূলত, আপনার সাথে মি. নারুসের এভাবেই দুই বছর পরে দেখা হতো এবং একটা ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতো। আর আপনাদের দুজনের সম্পর্ক শেষ হয়ে যেত। আপনার উচিত ওই পর্যায়ে যাওয়ার আগেই এই পার্ট চুকিয়ে ফেলা। এই লোকের উপর আশা করে কোনো ফায়দা হবে না।”

আমার বন্ধুকে ও অপমান করেছে; এই জন্য ওর প্রতি আমি বিরক্ত হইনি। বিষয়টি এমনও ছিল না যে, ও আমাকে এমন কিছু বলেছে যা আমি শুনতে চাইনি। আর এটা এইজন্যও হয়নি যে, আমি যা অনুভব করছি না; সেরকম চেহারা করে রাখতে হচ্ছে।

নারুসে একদা আমার একটা সময়ের স্বপ্নের প্রতি বিদ্রোহ করেছে বলে ওর প্রতি রাগ হলেও, মিয়াগির প্রতি বিরক্ত হইনি।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি কিসের প্রতি এত বিরক্ত।

নারুসে আমার সামনে চিন্তা-ভাবনা না করে বকবক করে যাচ্ছে। এমনকি মিয়াগিও আমার পাশে বসে বিষণ্ণ সব কথাবার্তা বিড়বিড় করে যাচ্ছে।

অপরপাশের দুই তরুণী মেয়ে এমন উচ্চ কণ্ঠে কথা বলে যাচ্ছে; সেগুলো যেন কথার চেয়েও বেশি শব্দ নিক্ষেপের খেলা বলে মনে হচ্ছে। আমার পেছনের এক দল প্রচণ্ডভাবে ওদের মতামত জাহির করে যাচ্ছিল পাঙ্কা মাতালদের মতো। অনেক দূরের সিটে একদল ছাত্র হাততালি দিচ্ছে এবং চিল্লাচিল্লি করছে। হঠাৎ আমি আর নিতে পারছিলাম না। চুপ করো, আমি ভাবলাম।

কেন সবাই একটু চুপ করতে পারো না?

পরমুহূর্তেই, আমি মিয়াগির দিকে দেওয়ালটায় গ্লাস ছুড়ে মারলাম।

যেরকমটা আশা করেছিলাম এর চেয়েও বেশি জোরে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার আওয়াজ হলো। কিন্তু রেস্টুরেন্টটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরব রইল। তারপরে আবার আগের মতো গমগম হয়ে উঠল।

নারুসে আমার দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল। আমি একজন কর্মচারীকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। মিয়াগি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কী বালছাল করছি আমি?

টেবিলে হাজার ইয়েনের বিল রেখে দৌড়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে গেলাম।

স্টেশনে যাওয়ার বাসে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই একটা পুরাতন ব্যাটিং সেন্টার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

আমি নেমে যাওয়ার বাটনে চাপ দিয়ে বাস থেকে নেমে গেলাম। এরপর ওখানে তিনশটা শট নিলাম। যতক্ষণে হাত থেকে ব্যাটটা নামালাম, ততক্ষণে আমার হাত রক্তাক্ত এবং অসাড় হয়ে গিয়েছে। বুট পর্যন্ত ঘেমে গিয়েছি আমি।

একটা ভেভিং মেশিন থেকে পোকরি সোয়েট কিনে একটা বেঞ্চে বসে একদল লোকের ব্যাটিং দেখতে দেখতে ধীরে-সুস্থে পান করতে লাগলাম। আমার মতে তারা কাজ শেষে বাসায় ফিরে যাচ্ছে।

হয়তো এটা আলোকসজ্জার কারণে হতে পারে, কিন্তু সবকিছুই মনে হচ্ছে অদ্ভুত নীল রঙের।

নারুসেকে ওভাবে ফেলে আসার জন্য আমি একটুও অনুতাপ অনুভব করছি না। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে আমার প্রতি ওর ঠিক কতটুকু টান ছিল।

হয়তো বা আমি সত্যিই নারুসের মতো লোকদের গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আমি শুধু আশা করেছিলাম আমি ওর মাধ্যমে নিজেকে ভালোবাসতে পারবো। যেহেতু আমি যেভাবে চিন্তা করি; সে ওভাবেই আমাকে মেনে নিয়েছিল।

যেখানে নারুসে বদলে গিয়েছে, আমি বদলাইনি।

এমনও হতে পারে নারুসেই ঠিক ছিল।

ব্যাটিং সেন্টারটাকে পেছনে ফেলে আমি স্টেশনের দিকে হাঁটা দিলাম।
প্লাটফর্মে যাওয়ার সাথে সাথেই, ট্রেন এসে পড়ল।

ট্রেনটা ক্লাব থেকে আসা হাই স্কুলের ছেলেপেলে দিয়ে ভর্তি ছিল। হঠাৎ নিজেকে বয়স্ক মনে হতে লাগল আমার। চোখ বন্ধ করে সম্পূর্ণ মনোযোগ ট্রেনের শব্দের দিকে নিবদ্ধ করলাম।

রাত নেমে এসেছে। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে যাওয়ার আগে কনভেনিয়েন্স স্টোরে দু মেরে গেলাম।

পার্কিং লটে বেশ অনেকগুলো বড় বড় পোকা দেখতে পেলাম।
কিন্তু সেগুলোর মাঝে নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

যখন বিয়ার এবং স্ন্যাকস নিয়ে রেজিস্টারে পৌঁছালাম, জার্সি এবং স্যান্ডেল পরিহিত এক জোড়া কলেজের যুগলকেও কেনাকাটা করতে দেখলাম।

বাসায় ফিরে, কৌটাজাত ইয়াকিনিকুর সাথে যোগ করা গ্রিন ওনিয়ন এবং বিয়ার দিয়ে গরম-গরম খাবার খেলাম। মৃত্যুর আগে ঠিক কত লিটার বিয়ার খেতে পারবো; সেটা চিন্তা করে বিয়ারও আগের চেয়ে মজাদার মনে হলো।

“ওই, মিস পর্যবেক্ষক” মিয়াগিকে ডাক দিলাম। “একটু আগে যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখিত। আমি তখন বিভ্রান্ত ছিলাম। মাঝে মাঝে আমার ভেতরে একটা আগুন জ্বলে ওঠে। তখন কিছু একটা করে ফেলি। জানোই তো।”

“হ্যাঁ, আমি জানি” মিয়াগি বলল। ওর চোখগুলো আমার দিকে সতর্কতার সাথে তাকাতে লাগল। আমি ওকে দোষ দিতে পারি না। কথার মাঝে গ্লাস ছুড়ে মারা লোকের প্রতি যে কেউই সতর্ক থাকবে।

“তুমি ব্যথা পাওনি?”

“দুর্ভাগ্যজনকভাবে, না।”

“ওই, আমি সত্যি দুঃখিত।”

“সমস্যা নেই কারণ, আমি আঘাত পাইনি।”

“পর্যবেক্ষণ লগ লিখতে লিখতে ড্রিঙ্ক করবে নাকি?”

“...আপনি বলতে চাচ্ছেন, আপনি আমার সাথে ড্রিঙ্ক করতে চান?”

আমি এমন প্রতিক্রিয়া আশা করিনি। আমার মনে হয় সত্যি কথা বলাটাই ভালো। “হ্যাঁ, আমি সত্যি নিঃসঙ্গ।”

“তাই বুঝি! তারপরেও, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি পারবো না। আমি এখন ডিউটিতে আছি।”

“তোমার উচিত ছিল প্রথমেই বলে দেওয়া।”

“দুঃখিত। আমার কাছে একটু অদ্ভুত লেগেছিল। ভেবেছিলাম কেন আপনি এই কথা বলবেন।”

“ঠিক সবার মতোই আমিও মাঝে মাঝে একাকিত্ব অনুভব করি। অন্য লোকজন যাদের তুমি পর্যবেক্ষণ করেছিলে, মৃত্যুর আগে তারাও নিশ্চয় সহচর্য চেয়েছিল?”

“এরকম কিছু আমার মনে পড়ছে না” মিয়াগি বলল।

বিয়ারের বোতল খালি করার পরে আমি হট শাওয়ার নিলাম এবং দাঁত মাজলাম। একটা তৃপ্তিদায়ক ঘুম ঘুমাতে পারার অবস্থায় এলাম আমি। এটা নিশ্চিতভাবে ব্যাটিং সেন্টারে আমার পরিশ্রমের ফল।

বাতি নিভিয়ে ম্যাট্রেসের আরও গভীরে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম।

মৃত্যুর যত কাছে আসতে লাগলাম; পৃথিবীটা আমার কাছে হঠাৎ তত সুন্দর হয়ে উঠছে না। মনে হচ্ছে সবকিছুর প্রতি আমার মতামত শুধরে নিতে হবে। আমি ভাবতে লাগলাম।

হয়তো বা পৃথিবীটা সেসকল মানুষের কাছে সুন্দর হয়ে ধরা দেয়; যাদের ইতোমধ্যে মৃত্যু ঘটেছে। এটা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু মনে হচ্ছে আমি আমার শিশুসুলভ চিন্তা এখনো ঝেড়ে ফেলতে পারিনি।

মনের গভীরে কোথাও, আমি এখনো আশা করছি হঠাৎ করে পৃথিবীটা সুন্দর লাগা শুরু করবে।

চ্যাপ্টার ৭ : টাইম ক্যাপসুল রাইডিং

আমি যখন উইল লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম, খুব দ্রুতই লক্ষ করলাম কে এটা পড়বে; সেটা অনুমান না করে আমি কিছুতেই লিখতে পারছি না।

কাছের একটা স্টেশনারী থেকে কিনে আনা কলমটা ধরে রেখে, কী লিখবো সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ চিন্তা করতে লাগলাম।

বাইরের বিদ্যুতের খুঁটিতে ঘুরুরে পোকা অবস্থান নিয়েছে। বজ্জাতগুলো এতটাই আওয়াজ করতে লাগল যে মনে হচ্ছে ওরা ঘরের ভিতরে থেকে ডাকছে।

ঘুরুরে পোকা যখন ওখানে ছিল, কলম একটুও না নড়াতে পারার জন্য খুব সহজে ওদের উপর দোষ চাপিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ওগুলো উড়ে যাওয়ার পরেও; একটি শব্দও লিখতে পারলাম না।

কে আমার এই উইল পড়বে বলে আশা করছি আমি? একটা উইলের মানে হলো মৌলিকভাবে যোগাযোগের মাধ্যম। এমন কারো কাছে আমার সম্পর্কে এমন কিছু লিখতে হবে যা ওরা অন্যথায় দেখতে পেত না। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমার অন্য কাউকে বলতে হবে? অবশ্যই, তৎক্ষণাৎ আমার ছোটবেলার বন্ধু হিমেনোর কথা মনে পড়ল। তো এই উইলে হিমেনোর প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকবে নাকি আমার ভালোবাসার স্বীকারোক্তি?

পরীক্ষামূলকভাবে, ওকে একটা চিঠি লিখতে আমার এক ঘণ্টা লাগল। যখন আমি শেষ করলাম সংক্ষেপে যা দাঁড়ালঃ

তুমি এই মুহূর্তে আমার সম্পর্কে কী ভাবছ আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমাকে দশ বছর আগের সেদিন থেকেই ভালোবেসে এসেছি। আমি বিশ বছর পর্যন্ত টিকে ছিলাম কারণ, তোমার সাথে থাকার মুহূর্তগুলো আমার সাথে ছিল বলে। আমি বিশ বছরের পরে টিকে থাকবো না কারণ, আমি তোমাকে ছাড়া পৃথিবী কল্পনা করতে পারবো না।

এখন মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি অনেক বছর

আগেই মরে গিয়েছি। যেদিন থেকে তোমার আমার বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল।

বিদায়, আমি প্রার্থনা করছি দশ বছরের আমি তোমার ভিতরে কিছুটা হলেও বেশ কিছুদিন টিকে থাকবে।

চিঠিটা আরেকবার পড়ে, আমি ভেবে দেখলাম; চিঠিটা মেইল করা যাবে না। কোথাও একটা ভয়ঙ্কর ঝামেলা আছে।

এর মাধ্যমে আমি এরকম কিছু বলতে চাইনি। আমি যা বলতে চাই সেটা লেখাও আমার মৃত্যুর আগে বলতে গেলে অসম্ভব।

আমার মনে হয় শেষ লাইনে আমার অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে। হিমেনোর প্রতি দশ বছরের আমাকে আরেকটু মনে রাখার অনুরোধ

এটাই যদি হয় আমার চিঠি লেখার উদ্দেশ্য তাহলে মনে হচ্ছে, আমার উচিত কোনো কিছু না লেখা।

যদি হিমেনোকে উদ্দেশ্য করে পাঠানো হয় এবং আমি যদি প্রেরক হই তাহলে যে-কোনো খাম হলেই চলবে। এটাই যথেষ্ট। এতে ন্যূনতম ভুল বুঝাবুঝিও হবে না।

যদিও একটা খালি শিট দেখতে বেশি অদ্ভুত লাগে, তাহলে একটি বাক্যে লিখতে পারিঃ “আমি এই চিঠিটা লিখতে চেয়েছিলাম।”

অথবা আরেকটা উপায় হলো আমার মৃত্যু নিয়ে একদমই কথা না বলা। তার বদলে প্রতিদিনকার সাধারণ কথাবার্তা সম্পর্কে লেখা। আমি কলমটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চিঠিটা দুমড়েমুচড়ে দিলাম। যাতে মিয়াগি চিঠিটা পড়তে না পারে। তারপরে সিলিংয়ে ছুঁড়ে দিলাম।

...যাহোক, শেষ করে আমি চিঠি লিখেছি? স্মৃতি হাতড়াতে লাগলাম।

চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রচলিত কোনো বিষয় নয়। এলিমেন্টারি স্কুলের পর থেকে আমি কাউকেই নিউ ইয়ারের কার্ড কিংবা এরকম কিছু পাঠাইনি। আমার সম্পূর্ণ জীবনে আমি হাতেগোনা অল্প কয়েকটি চিঠিই লিখেছিলাম।

সতেরো বছর বয়সে বাদে, আমার লেখা শেষ চিঠি ছিল- চতুর্থ গ্রেডের গ্রীষ্মে।

সেই গ্রীষ্মে, যখন আমার দশ বছর বয়স ছিল, আমাদের সম্পূর্ণ ক্লাস জিমের পিছনে একটা টাইম ক্যাপসুল পুঁতে রেখেছিল। এটা ছিল নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া সেই শিক্ষিকার পরামর্শ। যিনি কিনা আমাকে প্রথমবারে মতো জীবনের

মূল্য সম্পর্কে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই গোল ক্যাপসুলে রাখার জন্য চিঠি লিখলো।

“আমি চাই তোমরা এখন থেকে দশ বছর পরের তোমাদের উদ্দেশ্যে চিঠিগুলো লিখ” তিনি বলেছিলেন। “যেহেতু আমি হঠাৎ করেই বলেছি, আমি জানি হয়তো তোমরা নিশ্চিত নও কী লিখবে, তোমরা যে কোনো কিছু লিখতে পারো যেমন ‘তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে?’ অথবা ‘তুমি কি সুখী?’ অথবা ‘তুমি কি এটা মনে করতে পারছ?’ অথবা ‘তুমি আমাকে কী বলতে চাও?’ অনেক অনেক কিছুই আছে জিজ্ঞেস করার মতো। তুমি এমনকি তোমার নিজের আশার কথাও লিখতে পারো। যেমন ‘দয়া করে আমার স্বপ্ন সত্যি করো’ অথবা ‘দয়া করে সুখী থেকো’ অথবা ‘দয়া করে এই সম্পর্কে ভুলে যেয়ো না।’”

উনি অনুমানও করতে পারেননি যে এক দশক পরে, বাচ্চাদের মধ্যে কয়েকজন তাদের স্বপ্নের পেছনে ছোট্ট ছেড়ে দিবে। কয়েকজন সুখী হবে না এবং অনেকেই এই সম্পর্কে ভুলে যাবে।

সম্ভবত এটা ভবিষ্যতের তোমার জন্য লেখা চিঠি নয়। কিন্তু তখন চিঠিটা লেখা হয়েছে সেই সময়ের তোমার জন্য।

তিনি আরও বলেছিলেন।

“চিঠির শেষে, দয়া করে লিখে দিয়ো এই মুহূর্তে তোমার সেরা বন্ধু কে... ওরা তোমার সম্পর্কে কী ভাববে এই নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করো না। যদি এরকম কিছু হয় তাহলে, ‘ওরা আমাকে ঘৃণা করে, কিন্তু আমি ওদের পছন্দ করি!’ দয়া করে এইটুকু লিখো। চিন্তা করো না, আমি নিশ্চিত করলাম কেউই দেখবে না, এমনকি আমিও না।”

নিজেকে উদ্দেশ্য করে কী লিখেছিলাম মনে করতে পারছি না। এমনকি মনেও করতে পারছি না কার নাম লিখেছিলাম।

টাইম ক্যাপসুল দশ বছর পরে তোলার কথা ছিল। আর সেটা এই বছর। কিন্তু আমি এখনো এই সম্পর্কে তেমন কিছুই শুনিনি।

এমনও হতে পারে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে যোগাযোগ করা হয়নি। ওরা আমার সম্পর্কে ভুলে গিয়েছে। এই সম্ভাবনাই বেশি।

মৃত্যুর আগে আমার ক্লাসমেটরা কী লিখেছে সেটা পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কোনো ক্লাসমেটের সাথে দেখা করে নয়। শুধু আমি একা।

“আজকের দিন কিভাবে কাটাবেন বলে স্থির করেছেন?” মিয়াগি জিজ্ঞেস

করল।

“টাইম ক্যাপসুলে চড়ে” আমি উত্তর দিলাম।

প্রায় এক বছর পরে আমার নিজ শহরে ফিরে এসেছি। তালিজোড়া দেওয়া জীর্ণ কুটিরের মতো স্টেশনটা সামনে আসতেই পরিচিত বেশ কিছু দৃশ্য দেখতে পেলাম।

সবুজ পাহাড়ের শহর। পোকামাকড়ের ডাক এবং সবজির উগ্র গন্ধ। বর্তমানে যেখানে বাস করি তার সাথে এ-জায়গার তুলনা করা যায় না। এমনকি কান পেতেও, আমি পোকা এবং পাখির ডাক ছাড়া কিছুই শুনতে পেলাম না।

“অবশ্যই আপনি ছিঁচকে চোরের মতো দিনে দুপুরে এলিমেন্টারি স্কুলে ঢুকে গর্ত অন্তত করবেন না?” আমার পেছনে হাঁটতে-হাঁটতে মিয়াগি জিজ্ঞেস করল।

“অবশ্যই না, আমি রাতের জন্য অপেক্ষা করবো।”

আমি আবেগের বসে এতদূর এসে পড়েছি। সন্ধ্যা নামার আগে কিভাবে কোনো চিত্তবিনোদন এবং রেস্টুরেন্ট ছাড়া সময় কাটাবো, সে সম্পর্কে চিন্তা করিনি।

এমনকি হাঁটা দূরত্বেও কোনো কনভেনিয়েন্স স্টোর নেই। উচিত ছিল আমার মোপডটা নিয়ে আসা। যদিও এটা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল।

যতই হাতে নষ্ট করার মতো সময় থাকুক, বাবা-মা’র বাসায় যাওয়ার কোনো ইচ্ছা-ই ছিল না আমার। কোনোবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করাও বলতে গেলে সম্ভব না।

“আপনার হাতে যদি বেশ সময় থাকে তাহলে আপনার উচিত অতীতের স্মৃতি বিজড়িত কোনো জায়গা থেকে ঘুরে আসা?” মিয়াগি পরামর্শ দিলো। “ধরুন, এমন সব জায়গা যেগুলোতে আপনি ছোটবেলায় যেতেন কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে যান না।”

“আমার অতীতের স্মৃতি বিজড়িত জায়গা, হাহ... এখানে আমি তেমন ভালো কোনো অতীত অতিবাহিত করিনি।”

“মিস. হিমনো বাদে, ধরে নিচ্ছি।”

“এত সস্তাভাবে ওর নাম উচ্চারণ করবে না। আমি সত্যি ওর নাম তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না।”

“তাই নাকি। এরপর থেকে আমি আরও সতর্ক থাকবো। যা হোক, আমি যদিও নাক গলাতে চাই না তবুও আমার উপদেশ হচ্ছে কারো সাথে দেখা না

করাই উত্তম।”

“সেরকম কোনো ইচ্ছাও নেই।”

“ভালো, আপনি যদি তাই বলে থাকেন” মিয়াগি বলল। কিছুটা নরম হয়ে।

সূর্যের আলো আমার চামড়া ভেদ করে ঢুকে যেতে লাগল। আরেকটি আগুনের মতো উত্তপ্তগরম দিন হতে যাচ্ছে। স্টেশনের বাইরের বেঞ্চে বসে আগপিছু চিন্তা করতে লাগলাম।

হঠাৎ পাশে তাকাতেই মিয়াগিকে সানফ্রান্সিসকো দেখলাম। আমি সবসময়ই ভেবে এসেছি ও সত্যিই উজ্জ্বল ত্বকের মেয়ে। ও সম্ভবত সেটাই ধরে রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

ও এটা নিয়ে এতটাই সিরিয়াস ছিল যে, আমি আশা করেছিলাম ওর বাহ্যিক উপস্থিতি অন্যরকম হবে। সেজন্য বিষয়টা আমার কাছে বিস্ময়কর লাগল।

“আমি ছাড়া বাকি সবার কাছে না তুমি অদৃশ্য?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“এতে কোনো সন্দেহ নেই।”

“সবসময়?”

“হ্যাঁ। আমাকে একমাত্র তারাই দেখতে পায়; যাদের আমি পর্যবেক্ষণ করি। যাহোক, আপনি তো জানেনই, অনেকক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যখন প্রথম দোকান গিয়েছিলেন। আমি তখন পর্যবেক্ষণের ডিউটিতে ছিলাম না। আমাকে শুধু তারাই দেখতে পেত যারা আয়ুষ্কাল, সময়, অথবা স্বাস্থ্য বিক্রির চিন্তা-ভাবনা করছে। কোনো সমস্যা নাকি?”

“নাহ। আমি ভাবছিলাম কেউ যদি তোমাকে নাইবা দেখে তাহলে তোমার বাহ্যিক উপস্থিতি নিয়ে এত হেঁচকি করার কী আছে।”

অপ্রত্যাশিতভাবে, মিয়াগি মনে হচ্ছে মন্তব্যটাকে আক্রমণ হিসাবে নিলো।

“আমি এটা আমার নিজের জন্য করি” মিয়াগি এমনভাবে উত্তর দিলো যেন কষ্ট পেয়েছে। “কারো সাথে দেখা করার পরিকল্পনা না থাকলে আপনি গোসল করেন না নাকি?”

ও সত্যিই রাগ করেছে বলে মনে হচ্ছে। যদি অন্য কোনো মেয়ে হতো, আমি এতক্ষণে ক্ষমা চেয়ে নিতাম। কিন্তু ওকে আঘাত দিতে পেরেছি বলে আমি খুব খুশি। আমি চাচ্ছিলাম ও আমার অসাবধানতাবসত করা মন্তব্য সম্পর্কে সমালোচনা করুক।

কোথায় যাওয়া যায় চিন্তা করে এদিক-সেদিক ঘুরতে-ঘুরতে আমার পা

আমাকে; আমার এবং হিমেনোর পুরাতন বাসস্থানের নিকট নিয়ে গেল। যেখানে আমরা ছোটবেলায় প্রায়ই খেলাধুলা করতাম।

কিভাবে মিয়াগির পরামর্শের ফাঁদে পড়লাম তা চিন্তা করে অনুতাপ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমার কাজ-কারবার কী রকম বিরক্তিকর এবং সাধারণ; তা মনে করে ও নিশ্চয় মনে মনে উৎফুল্ল হচ্ছে।

বেশ কয়েকটি বাঁক নিয়ে আমার বাবা-মায়ের বাসা থেকে দূরে থাকার জন্য চেষ্টা করলাম। আমি একটা ক্যান্ডি স্টোরে গেলাম; যেখানে প্রায়ই যেতাম। কিন্তু দোকানটা বন্ধ ছিল এবং চিহ্নটা উধাও হয়ে গিয়েছিল।

ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে পথ করে আমি হাঁটতে লাগলাম। তারপরে ট্রেইল ধরে পাঁচ মিনিট হাঁটার পরে আমার গন্তব্যে পৌঁছলাম।

সেখানে একটা ভাঙাচুরা বাস ছিল যেটা কিনা হিমেনো এবং আমার জন্য তথাকথিত “গোপন আস্তানা” হিসাবে কাজ করেছিল আমাদের কৈশোরে।

দূর থেকে বাসের অবশিষ্ট লাল রং-কে মরিচার মতো লাগছিল। কিন্তু যদি ভিতরে গিয়ে, সিট এবং মেঝের বালির স্তূপ উপেক্ষা করা যায়, তবে এটা অপ্রত্যাশিতভাবে সুন্দর লাগবে। মনে হচ্ছে আমি পোকামাকড়ের সাথে হামাগুড়ি দিচ্ছি। আসলে বলতে গেলে একটাও পোকা দেখিনি আমি।

আমি সম্পূর্ণ বাস ঘুরে বেড়াতে লাগলাম হিমেনো এবং আমার চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার জন্য। কিন্তু কিছুই খুঁজে না পেয়ে; যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, অবশেষে ড্রাইভার সিটে কিছু একটা লক্ষ্য করলাম।

সিটের দিকে নীল স্থায়ী মার্কার দিয়ে কিছু একটা লেখা হয়েছে। খুব কাছ থেকে জিনিসটা দেখে বুঝতে পারলাম এটা একটা অ্যারো।

প্রায় ছয়টা অ্যারো দ্বারা দিক-নির্দেশ করার পরে অবশেষে, একটি সিটের পিছনে যা খুঁজছিলাম সেটা দেখতে পেলাম। দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা আই-আই-গাসা। একটা হাস্যকর এলিমেন্টারি স্কুলের খেলা; যেখানে নিজের নাম এবং যাকে গোপনে ভালোবাসে তার নাম একটা ছাতার নিচে লিখতে হয়।

স্বাভাবিকভাবেই, আমার এবং হিমেনোর নাম লেখা ছিল ছাতার নিচে। এরকম কিছু আঁকার স্মৃতি মনে পড়ছে না আমার। শুধুমাত্র হিমেনো এবং আমি এই জায়গাটা সম্পর্কে জানতাম। তো সেই হিসাবে এটা হিমেনোই হবে।

এমন মেয়েলি জিনিস ও করবে বলে আমি কখনো ভাবতেও পারিনি। তবুও আমার ঠোঁটে একটা হাসি ফুটে উঠল।

আমি ছাতাটার দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। মিয়াগি পেছন থেকে সব দেখতে লাগল। কিন্তু কোনো ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করল না।

চোখ জ্বলা শুরু হলে আমি বাস থেকে বেরিয়ে এলাম। ছোট থাকা অবস্থায় যা করতাম, একটা উপড়ে পড়া গাছ বেয়ে ছাদে উঠলাম। কিছু ঝরা পাতা সরিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম।

আমার দাদুর কবর থেকে ঘুরে আসতে আসতে রাত হয়ে গেল।

তারপরে এলিমেন্টারি স্কুলের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলাম।

শেড থেকে একটা শাবল ধার নিয়ে জিমের পিছন গেলাম। জিনিসটা কোথায় আছে তার একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে খুঁড়তে শুরু করলাম। এলিমেন্টারি এক্সিটের সবুজ আলো আমার চারপাশ উদ্ভাসিত করে তুলল।

ভেবেছিলাম যা খুঁজছিলাম সেটা খুব সহজে পেয়ে যাবো। কিন্তু হয় আমার স্মৃতি আমার সাথে প্রতারণা করেছে অথবা ইতোমধ্যে জিনিসটা খুঁড়ে বের করে নেওয়া হয়েছে। আমি প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ খুঁড়ে যাচ্ছি, বিনিময়ে পেলাম শুধু প্রচুর ঘাম। কোনো টাইম ক্যাপসুল পেলাম না।

গলা শুকিয়ে গিয়েছে। হাতে ফোঁসকা পড়ে গিয়েছে। গতকালের ব্যাটিং সেন্টারে কাটানো সময় সেই প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত করল। মিয়াগি আমার পাশে বসে গর্ত খুঁড়তে দেখতে দেখতে ওর নোটবুকে কিছু একটা লিখতে লাগল।

ধূমপান করার জন্য বিরতি নিতেই অবশেষে আমার স্মৃতি ফিরে এলো। ঠিক, আমরা ওটাকে জিমের পিছনের গাছের নিচে পুঁততে নিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ একজন তখন বলেছিল যে একটা নতুন গাছ হয়তো রোপণ করা হতে পারে, তো একারণে আমরা অন্য কোথাও পুঁতেছিলাম।

ব্যাকস্টপের পেছনে প্রায় দশ মিনিট খোঁড়াখুঁড়ির পরে শক্ত কিছুতে আঘাতের আওয়াজ পেলাম। সতর্কতার সাথে গোলাকার বস্তুটা খুঁড়ে বের করলাম যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। তারপরে সেটা আলোয় নিয়ে এলাম। ভেবেছিলাম এটা হয়তোবা লক করা থাকবে, কিন্তু এটার মুখ খোলা ছিল।

আমার মূল পরিকল্পনা ছিল শুধু আমার নিজের চিঠিটা নিয়ে বাকিগুলো আগের জায়গায় রেখে দিবো। কিন্তু এত কষ্টের পরে, সবগুলো চিঠি খুলে দেখার ইচ্ছে হলো। কয়েক মাস পরে মারা যাওয়া একজন ব্যক্তির নিশ্চয় এইটুকু করা জায়েজ।

এলোমেলোভাবে একটা তুলে নিয়ে খুললাম। আমি শুধু “ভবিষ্যতের তোমাকে” এবং “ভালো বন্ধু” অংশটা পড়লাম।

পড়া হয়ে গেলে একটা নোটবুক খুললাম। চিঠির লেখকের নাম লেখলাম এবং ওদের বেস্ট ফ্রেন্ডের নামের দিকে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করলাম।

আরও বেশ কিছু চিঠির এরকম পুনরাবৃত্তি করার পরে, নামের সংখ্যা এবং অ্যারোর সংখ্যা বাড়তে লাগল। ধীরে-ধীরে একটা রিলেশনশীপ চার্ট তৈরি করল। কে কাকে পছন্দ করে, কাকে কে পছন্দ করে। কোনটা প্রয়োজন, কোনটা প্রয়োজন নেই।

যেমনটা আমি আশা করেছিলাম, সমস্ত চিঠি পড়া শেষে দেখলাম, চার্টের একমাত্র একাকী নামটা ছিল আমার। একজনও আমাকে ওদের “ভালো বন্ধু” হিসাবে বাছাই করেনি।

এবং যখন আমি টাইম ক্যাপসুলে হিমেনোর চিঠি খুঁজলাম, ওটা খুঁজে পেলাম না। হয়তোবা এমন হতে পারে সেদিন ও স্কুলেই আসেনি।

যদি ও আসতো তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমার নাম লিখতো, আমি ভাবলাম। আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের গোপন আস্তানায় ও গোপনে আমাদের নাম দিয়ে আই-আই- গাসা ঐঁকেছে। ও নিশ্চিতভাবেই আমার নাম লিখতো। হয়তোবা দুই একটা হৃদয়ও আঁকতো।

যদি হিমেনোর চিঠিটা এখানে থাকতো।

আমার নিজের চিঠিটা জিন্সের পকেটে পুরে নিয়ে টাইম ক্যাপসুলটা আবার পুঁতে দিলাম। শাবলটা জায়গামতো রেখে দিলাম। হাত এবং মুখ ধুয়ে ফেললাম কাছের কল থেকে। তারপরে স্কুল ত্যাগ করলাম।

ক্লান্ত শরীরটা রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগলাম আমি। মিয়াগি পিছন থেকে কথা বলে উঠল।

“আশা করবো আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন। অতীতের সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরা উচিত নয় আপনার। তার উপরে, আপনি কারো সাথেই সম্পর্ক রাখেননি। মিস. হিমেনো স্কুলে পরিবর্তন করার পরে কি আপনি একটি চিঠিও উনাকে লিখেছিলেন? হাই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করার পরে আপনি কি একবারও মি. নারুসের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন? কেন মিস. ওকাভা আপনাকে পরিত্যাগ করেছে? আপনি কি কোনো ক্লাস রিইউনিয়নে যোগ দিয়েছিলেন? মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য দুঃখিত, আপনার কি মনে হয় না এখন

অতীত আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়ে খুব বেশি কিছু চেয়ে ফেলছেন?”

চরম সত্যি কথাগুলো শুনে আমার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। কিন্তু ওকে ফিরতি বলার মতো তেমন কিছুই নেই আমার।

হয়তো মিয়াগি ঠিকই বলেছে। আমি যা করছি তা অনেকটা এরকম যে, কোনো স্রষ্টায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু খারাপ সময়ে শুধু সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য মন্দির, মঠে এবং চার্চে যাই।

কিন্তু যদি এটাই ঘটনা হয়; অতীত এবং ভবিষ্যৎ আমার জন্য বন্ধ হয়ে যায়, আমি তাহলে কী করবো?

ট্রেন স্টেশনে ফিরে এসে, আমি টাইম টেবিল দেখলাম। শেষ ট্রেন অনেক আগেই চলে গিয়েছে।

যখন এই এলাকাতে ছিলাম খুব একটা ট্রেন ব্যবহার করতাম না। কিন্তু এরকম গ্রাম্য পরিবেশের শেষ ট্রেন এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে আশা করিনি।

ট্যাক্সি ডাকতে পারি। ব্যাপারটা এরকমও না আমি বাবা-মা’র ওখানে যেতে পারবো না। শেষ পর্যন্ত আমি স্টেশনেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

এভাবে চিন্তা করে দেখলে, আমি বরং মানসিক যন্ত্রণা থেকে শারীরিক যন্ত্রণা পেতে আগ্রহী। নিজেকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়ে আমার মনোযোগ সেদিকে ঘুরিয়ে নিতে পারি। শক্ত বেঞ্চি চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। ফ্লুরোসেন্ট লাইটের সাথে আচমকা ঠুকে যাওয়া পোকাদের অবিরাম আওয়াজ হতে লাগল।

ভাবতেই পারিনি পরিশ্রান্ত থাকার কারণে ঘুম আসবে না। সাথে যোগ হয়েছে অদ্ভুত আলোকসজ্জা। পোকাগুলো আমার পায়ের তলায় ঘোরাফেরা করছে। আমি জানি শান্তিতে বিশ্রাম নেওয়ার আমার কপালে নেই।

পিছনের বেঞ্চি থেকে মিয়াগির কলম চলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি ওর সহনশীলতা দেখে অবাক হলাম। আমাকে পর্যবেক্ষণ করা দিনগুলোতে ও খুব বেশি ঘুমানোর সুযোগ পায়নি।

দেখে মনে হচ্ছে এমনকি রাতেও সে এক মিনিট ঘুম তো পাঁচ মিনিট সজাগ থাকার চক্রে আছে। ওর নিশ্চয় আরও কোনো উপায় নেই। ওর মতো কম বয়সি একটা মেয়ের জন্য পর্যবেক্ষকের কাজ একটু বেশি কঠোর চাকরি।

অবশ্যই ব্যাপারটা এরকম না আমি ওর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমি শুধু কামনা করছি ও যেন চাকরি করা বন্ধ করে দেয়।

চ্যাপ্টার ৮ : ইনঅ্যাপ্রোপিয়েট অ্যাক্ট

প্রথম ট্রেন আসার কয়েক ঘণ্টা আগেই আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। তারপরে ভেন্ডিং মেশিন থেকে একটা এনার্জি ড্রিঙ্ক কিনলাম।

আমার সারা শরীরে ব্যথা। চারপাশে এখনো অন্ধকার। সকালের ঘুঘুরে পোকা, কাক, ঘুঘুর ডাক শুনতে পেলাম।

মিয়াগিকে ভিতরে উঠে বসে দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করতে দেখলাম। এই কাজটা করতে দেখে ওর মনুষ্য দিকটা আরও বেশি ফুটে উঠল। বলাই বাহুল্য এই প্রথমবারের মতো একজন সাধারণ মানুষ যা করে; সেরকম কিছু একটা করল ও।

আমি ওর দিকে তাকালাম। এখনো আমার হাতে একটা বোতল ধরা। সম্ভবত গতরাতের গরমের জন্যই, ও আমার কার্ডিয়ান খুলে কোলে রেখেছে। এই কারণে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ওর কমণীয় কাঁধ।

...নয়তো আমি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছি।

না-হয় তিন মাস বেঁচে থাকা অসহ্য হয়ে যাচ্ছে আমার জন্য। এমনও হতে পারে একের পর এক হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছিলাম আমি। সম্ভবত আমি এখনো আধো-ঘুমে, ক্লান্ত এবং যন্ত্রণায় ছিলাম বলে।

অথবা আমি যেরকম মেয়ে পছন্দ করি; আমার প্রত্যাশার তুলনায় মিয়াগি মেয়েটা অনেকটা সেরকমই।

আসলে এটা এখন কোনো ব্যাপার না। হঠাৎ আমার মাঝে মিয়াগির সাথে ভয়ঙ্কর কিছু করার তাড়না অনুভব করলাম। আরও স্পষ্টভাবে, মিয়াগিকে চেপে ধরে খারাপ কিছু করার ইচ্ছে হলো। আমার সমস্ত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ওকে ব্যবহার করে করার ইচ্ছে হলো।

আমার চিন্তাটা সম্পূর্ণ অনৈতিক। এমন একটা কাজ যেটা নিশ্চিতভাবেই আমার আয়ুষ্কাল অবসান করে দিবে। কিন্তু তাতে কী? আমি বেশ কিছু মাস আগেই মারা যাবো।

তো আমি যা করতে চাই; সেটা করেই হাসিমুখে মারা যাবো। আমার “মৃত্যুর আগে যা করতে চাই” তালিকায়, আমার কামনার বিরুদ্ধে না যাওয়ার জন্য লিখেছিলাম।

এর আগে আমি ওকে আমার সেসব কামনার ব্যাপ্তির বাইরে বিবেচনা করেছিলাম। কিন্তু একবার ওকে সে-দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করার পরে মনে হচ্ছে মিয়াগির চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ নেই এমন মরিয়া ঘটনা ঘটানোর জন্য।

আমি জানি না কেন ও আমার স্যাডিস্ট স্বভাবকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলল। যেহেতু ও সবসময় নির্বিকার থাকার ভান করে। আমি ওকে ওর এই ভান ধরে থাকাটাকে একটু বিরক্ত করতে চাই এবং ওর দুর্বল জায়গা দেখিয়ে দিতে চাই। ওকে বলতে চাই, “তুমি এতটা কঠোর হওয়ার ভান করো, আদতে তুমি খুবই দুর্বল।”

ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, মিয়াগি হালকা রক্ষণাত্মক ভঙ্গি করল যেন ও আমার চিন্তাটা ধরতে পেরেছে।

“তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে।”

“...জি?”

“একবার যদি কোনো পর্যবেক্ষক তাদের লক্ষ্যবস্তুকে ‘অনুচিত’ কাজ করতে দেখে অথবা এধরনের কিছু করে, তার জীবন অবসান করতে ঠিক কত সময় লাগে?”

মিয়াগির চোখে সতর্কতা দেখা গেল। “কেন আপনি একথা জিজ্ঞেস করছেন?”

“আমি যদি তোমার সাথে এখানে জবরদস্তি করি তাহলে মৃত্যুর আগে আমি ঠিক কতটুকু সময় পাবো জানতে চাচ্ছিলাম।”

কথাটা শুনে, ওকে ততটা আশ্চর্য মনে হলো না।

ঘৃণার সাথে, ও আমাকে আগের চেয়েও ঠান্ডা চোখে দেখতে লাগল।

“আমি সাথে সাথেই যোগাযোগ করতে পারবো। এরপরে, বিশ মিনিটও লাগবে না। পালিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।”

“তো, আমার ইচ্ছেমতো কাজ করার জন্য দশ মিনিট হাতে আছে?” আমি ঝটপট ওকে আবারো প্রশ্ন করি।

মিয়াগি চোখ সরিয়ে নিয়ে দুর্বল কণ্ঠে বলল, “এরকম কথা কেউ বলেনি।”

অদ্ভুতভাবে, মিয়াগি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না। ও কেবল ওর কোলের

দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার হাত ওর দিকে এগিয়ে গেল।

আমার পরিকল্পনা ছিল ওকে অপমান করা এবং আঘাত দেয়া, কিন্তু যে মুহূর্তে আমি ওর উন্মুক্ত কাঁধ স্পর্শ করলাম, ওর দুঃখ ভারাক্রান্ত মুখটা আমার শরীর আড়ষ্ট করে ফেলল।

আমি কি সত্যি মিয়াগির উপর জোর খাটাতে পারবো? আমার কামনা চরিতার্থ করার জন্য ওকে ব্যবহার করবো?

যদি তাই করি, ও নিশ্চিতভাবেই আঘাত পাবে। হতে পারে হাঁটুর কাছের বিশাল ক্ষমতার পাশে আরেকটি যোগ হবে?

হয়তো আমি ওর ঘোর-কালো চোখ থেকে আরও একটু আলো কেড়ে নিবো।

অথবা সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, ও শুধু ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করবে যেন সে এসবে একটুও বিচলিত হয়নি। ...আপনি কি সন্তুষ্ট?”

সত্যি কি আমি সন্তুষ্ট হবো?

আমি কী করার চেষ্টা করছি?

“আমার শক্ত হয়ে উঠা পেশী তৎক্ষণাৎ নিস্তেজ হয়ে এলো। তার বদলে, আমি তীব্র শূন্যতা অনুভব করলাম।

মিয়াগির হাল ছেড়ে দেওয়া চোখগুলোর উপর চোখ পড়তেই, আমি নিজেও বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম।

ওর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে পাশে বসলাম। কত দ্রুত আমার আচরণ বদলে গেল চিন্তা করে আমি ব্রিত হয়ে গেলাম।

“সবসময় আমার মতো আবর্জনাদের সামলানো খুব বিপজ্জনক চাকরি হওয়ার কথা।” আমি বললাম।

ও এখনো চোখ সরিয়ে রেখেছে। “যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেটা বুঝতে পারেন।”

এখন আমি বুঝতে পারছি কেন আমার মূল্য ৩০০,০০০ ইয়েন। ফিরে আসার আর কোন উপায় নেই এমন একটা কাজ করা থেকে আমি এক ধাপ দূরে ছিলাম।

“বিপজ্জনক কাজ। আমি বাজি ধরতে পারি, আমার মতো লোকজনের তো অভাব থাকার কথা না? মৃত্যুর আগে উন্মাদ হয়ে যাওয়া লোকজন এবং ওদের

রাগ পর্যবেক্ষকের উপর বহিঃপ্রকাশ করে এমন।”

মিয়াগি আশ্তে করে ওর মাথা ঝাঁকাল। “বাস্তবতা হচ্ছে, আপনার কেসটা অনেক সহজ। অনেকেই ছিল যারা আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল” আমাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে ও বলল।

আমি ওকে ওর হাঁটুর ক্ষতটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম। ওর সাথে যেদিন দেখা হয়েছে; সেদিন থেকেই আমার কৌতূহল ছিল। কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। এখন জানতে চেষ্টা করা এবং উদ্বেগ দেখানো আমার জন্য চপেটাঘাতের মতো হবে। আর এর ফলাফল হচ্ছে বিষণ্ণতা।

তার বদলে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি এরকম চাকরি নিলে কেন?”

“সহজ করে বললে, আমার নিতে হয়েছিল।”

“আমাকে স্পষ্ট করেই বলো।”

মিয়াগি অবাক হলো। “আমি ভেবেছিলাম মিস. হিমেনো ছাড়া আর কিছুতেই আপনার কোনো আগ্রহ নেই।”

“কথাটা একদম সত্যি নয়। আমি যদি তোমার মধ্যে কোনো আকর্ষণ অনুভব না করতাম; তাহলে আমি যা করার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা করার চেষ্টা করতাম না।”

“...তাই নাকি। ধন্যবাদ।”

“তুমি না চাইলে এ-বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই।”

“আসলে, আমার অতীত নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু লুকানোর নেই... উম, আমি ইতোমধ্যে আপনাকে আয়ুষ্কাল ছাড়া অন্যান্য সব সম্পর্ক নিয়ে বলেছি। একজন ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য এবং সময়ও বিক্রি করতে পারে, তাই না?”

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

“তাহলে, আমি সময় বিক্রি করেছি। মোটামুটিভাবে প্রায় ত্রিশ বছর।”

...একদম মিলে গেছে। আমি প্রথম থেকেই এটাই চিন্তা করছিলাম।

সময় বিক্রি করার মানেটা কী।

“বলতে চাচ্ছি... যদি তুমি সময় বিক্রি করো, তার মানে হচ্ছে...”

“অবশ্যই, পর্যবেক্ষকদের বেশিরভাগ হচ্ছে তারাই; যারা আপনার মতো দোকানে এসেছিল এবং তাদের সময় বিক্রি করেছিল। যদিও এটা করার মাধ্যমে তারা তাদের কার্যত নিরাপত্তা এবং সম্পর্কও সাথে সাথে বিক্রি করে দেয়...”

“তো এর আগ পর্যন্ত তুমি সাধারণ মানুষ ছিলে?”

“হ্যাঁ। আপনার মতো সাধারণ মানুষ ছিলাম, মি. কুসুনোকি।”

আমি স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছিলাম মিয়াগি জন্ম থেকেই অন্যরকম ছিল। জন্ম থেকেই ব্যঙ্গাত্মক। জন্ম থেকেই শক্ত ধাঁচের।

কিন্তু এখন ও আমাকে যা বলল। হয়তো বা টিকে থাকার জন্য ওর এসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নিতে হয়েছিল।

“তোমার বয়স তবুও বাড়ে? তো যদি তুমি ত্রিশ বছর বিক্রি করে দিয়ে থাকো... একবার তুমি চাকরি থেকে মুক্তি পেলে, তোমার বয়স তখন চল্লিশ হবে?”

“অবশ্যই আমার বয়স বাড়ে। হ্যাঁ, এটা সম্ভব। যদি ততদিন পর্যন্ত আমি টিকে থাকি” ও বলল বিনয়ী হাসি দিয়ে।

তার মানে ওকে আরও কয়েক দশক অদৃশ্য থাকতে হবে।

“...তোমার টাকার এতো প্রয়োজন হলো কেন?”

“আজকে অনেক প্রশ্ন করছেন, হুম।”

“উত্তর দেওয়া জরুরি নয়।”

“আমি যদি বলি এটা খুব মজার গল্প না?”

“আমার আয়ুষ্কাল বিক্রির চেয়ে মজার কিছু হবে এটা নিশ্চিত।”

মিয়াগি টাইম টেবিলের দিকে তাকাল। “মনে হচ্ছে, প্রথম ট্রেন আসার আগ পর্যন্ত বেশ কিছুটা সময় আছে।”

তারপরে ও আমাকে অল্প অল্প করে উত্তর দেয়া শুরু করল।

“আমার এখনো বুঝে আসে না কেন আমার মা আরও আয়ুষ্কাল কেনার জন্য, উনার জীবনের কয়েক দশক সময় বিক্রি করে দিয়েছিলেন। উনাকে যতটুকু মনে পড়ে, আমার মা যে বাস্তব জগতে থাকতেন; সেটা নিয়ে সবসময় অসন্তুষ্ট ছিলেন। স্পষ্টভাবে বললে আমার বাবা আমার জন্মের আগেই উনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। উনি বাবাকে প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিশাপ দিতেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্তরের গভীর থেকে উনি চাইতেন বাবা যেন ফিরে আসে। সম্ভবত একারণেই মা উনার আয়ুষ্কাল বাড়াতে চাইতেন। বাবার জন্য অপেক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। অবশ্যই, এর সাথে আমার বাবার জীবনকালে কোনো প্রভাব পড়েনি, এবং আমার মা সবার কাছেই অদৃশ্য হয়ে রইলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উনাকে এতগুলো আঘাত দিয়ে চলে যাওয়া একজন মানুষের জন্য অপেক্ষার কারণ বুঝতে পারতাম না। তবুও যদি উনি বাবার জন্য আয়ুষ্কাল

বাড়ানোর আশা করেও থাকে, তবুও লোকটি কে তা গ্রাহ্য করার মতো বিষয় ছিল না। কারো উপর নির্ভর করার মতো কেউ ছিল না উনার। বাবা ছাড়া আর কেউ উনাকে ভালোবাসতেন না।“

“আমি আমার দুর্দাশাশ্রম মাকে ঘৃণা করতাম। তিনিও আমাকে ঘৃণা করতেন। সবসময় আমাকে মনে করিয়ে দিতেন কিভাবে তিনি আশা করেছিলেন ‘এটা কিছুতেই যাতে জন্ম না নেয়। যখন তিনি উনার সময় বিক্রি করে পর্যবেক্ষক হয়ে আমার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলেন, আমার মনে পড়ে আমার তখন ছয় বছর বয়স। এরপরে আমার খালা আমাকে পরবর্তী বছরগুলোতে উনার জিম্মায় নিয়ে নেন। সেখানেও আমাকে আপদ হিসাবে বিবেচনা করা হতো।”

মিয়াগি চুপ করে গেল। ওর মুখ চিন্তায় বন্ধ হয়ে গেল।

ও মনে হচ্ছে অনুভূতিটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ও হয়তো বা বুঝতে পেরেছে; ওর বক্তব্য অজান্তেই সহানুভূতির মতো শোনাচ্ছে।

ও কথা চালিয়ে যেতেই ওর কথাগুলো আগের চেয়ে নির্লিপ্ত শোনাতে লাগল। যেন ও অন্য কারো কথা বলছে।

“আমার বয়স যখন দশ বছর, তখন আমার মা মারা যায়। কিভাবে তিনি মারা গিয়েছিলেন সেটা অস্পষ্ট। যাহোক, তিনি যাদের পর্যবেক্ষণ করতেন তাদের কারো হাতেই উনার মৃত্যু হয়েছে। এতটুকু স্পষ্ট ছিল। যতই কেউ আয়ুষ্কাল বাড়াক না কেন, আঘাত এবং অসুস্থতা সম্পূর্ণ অন্য ইস্যু। যখন আমি প্রথম শুনলাম, আমি ভাবলাম এটা হয়তো কোনো প্রতারণা হতে পারে।”

“যে লোকটি আমাকে উনার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন; তিনি আমাকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানালেন...। ‘তোমার ঋণ আছে লোকটি বলেছিল। ‘তোমার মায়ের রেখে যাওয়া অনেক বড় ঋণ। সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার মাত্র তিনটি পথ খোলা আছে তোমার সামনে। তোমার আয়ুষ্কাল বিক্রি করা, তোমার সময় বিক্রি করা, অথবা তোমার স্বাস্থ্য বিক্রি করা’ আমার মা উনার আয়ুষ্কাল বাড়ানোর জন্য, বলতে গেলে উনার সারা জীবনের মূল্যের মতো সময় বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু উনার বিক্রি করা সময়ে কাজ করার আগেই মারা গিয়েছেন। ঋণটা তখন সবচেয়ে কাছের আত্মীয়, তার মেয়ের কাছে অতিবাহিত হয়েছে। আমি যদি ওই মুহূর্তে ঋণ পরিশোধ করতে না পারি; তবে আমাকে জোরপূর্বক যে-কোনো একটি বেছে নিতে হবে।

“আর তুমি সময় বেছে নিলে” আমি বললাম।

“ঠিক। আমাকে ত্রিশ বছরের একটু বেশি বিক্রি করতে হলো ঋণ পরিশোধ করার জন্য। তো এখন আমি পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ করছি। এটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ নিঃসঙ্গ ধরনের কাজ, কিন্তু বিনিময়ে, এটা আমাকে মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে গভীর ধারণা দিয়েছে এবং মানুষের জীবনের মূল্য শিখিয়েছে। একবার ঋণ পরিশোধের পরে আমার মনে হয় আমি অন্য যে কারো চেয়ে ‘যথাযথ’ উপায়ে জীবনযাপন করতে পারবো। এসব দিক চিন্তা করলে, এটা খুব একটা খারাপ চাকরি না।”

ও এমনভাবে কথা কথাগুলো বলল, মনে হলো এটা ছিল ওর দায়মোচন। কিন্তু যেভাবেই দেখি না কেন; মিয়াগির জীবনটা পুরোদস্তুর ট্র্যাজেডি।

“আমি বুঝতে পারলাম না” আমি বললাম। “আমি হলে এমন অবস্থায় আয়ুষ্কাল বিক্রি করে দিতাম। কারণ, ঋণ পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত তুমি টিকে থাকবে; এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই, আছে না কি? আর তোমার মা-ও মারা গিয়েছে। এমনকি যদি তুমি শেষ পর্যন্ত টিকে যাও-ও, তোমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো ততদিনে শেষ হয়ে যাবে। আমি বিদ্রূপ করার জন্য বলছি না। আমি তোমার কথাই ধার নিচ্ছি, তুমি মাত্র পথ চলা শুরু করেছো। এতসব যন্ত্রণার সাথে কারবার করার পরে চল্লিশ বছরে নতুন করে সবকিছু শুরু করা! আমি এটাকে ট্র্যাজেডিই বলবো। এরচেয়ে বিক্রি করে দেওয়াই ভালো।”

“আমার আয়ুষ্কাল যদি মূল্যবান হতো, আমি সত্যিই বিক্রি করে দিতাম।”

“মূল্যটা কত?”

“আপনার সমান” মিয়াগি বলল; যেন সে খুব মজার কথা বলেছে। “বছরে ১০,০০০ ইয়েন... যদি আমি আপনার সাথে কঠোর আচরণ করে থাকি; তবে এর অর্থ আমিও এত কম মূল্য মেনে নিতে পারছিলাম না। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা একই। সুতরাং, আপনার উপর দিয়ে ঝাল ঝাড়ার জন্য আমি দুঃখিত।”

“...আমি কঠোর হতে চাই না। কিন্তু এই মুহূর্তেই কি মরে যাওয়া ভালো নয়?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। “ভবিষ্যতে তো আশা করার মতো কিছু নেই।”

“হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি একদম ঠিক বলেছেন। তবুও আমার মনে হয় আমি এটা করতে পারবো না কারণ, আমি আমার মায়ের মতো হয়েছি। আমি একটা অথর্ব, গর্দভ। বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই; তবুও আমি

দীর্ঘজীবী হতে চাই। সম্ভবত এমনকি মৃত্যুর সময়ও আমরা একইরকম থাকবো। কিন্তু... আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা তেমন সহজ বিষয় নয়। সম্ভবত কোনো একদিন ভালো কিছু হবে।”

“আমি এমন একজন লোককে চিনি যে কিনা পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত নিজেকে এই কথা বলতে বলতে মরে গিয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি” আমি রসিকতা করে বললাম।

“আমিও এমন একজনকে চিনি” মিয়াগি কৃত্রিম হাসি হাসল।

ওর সাথে হাসিতে যোগ দিয়ে একটা সিগারেট ধরলাম। মিয়াগি উঠে দাঁড়াল। আমার হাত থেকে একটা সিগারেট নিয়ে মুখে পুরল।

ও একটা লাইটার তুলল জ্বালানোর জন্য। কিন্তু মনে হচ্ছে ওটার তেল শেষ হয়ে গিয়েছে। বারবার চেষ্টা করার পরেও আগুন জ্বলল না।

মিয়াগি আমার সিগারেটের দিকে ইঙ্গিত করে ওর মুখটা কাছে ঘেঁষে আনলো। আমি ওর ইশারা অনুসরণ করে একই কাজ করলাম। শেষভাগে ছোঁয়া লাগল। অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে মিয়াগির দিকে স্থানান্তর হতে লাগল।

মিয়াগিকে প্রথমবারের মতো রিল্যাক্স করতে দেখলাম।

আমি চাই ও আমাকে অন্তত সহনীয় লোক হিসাবে মনে রাখুক।

আমি রেললাইনের দিকে তাকলাম। সূর্য উঠা শুরু হয়েছে।

চ্যাপ্টার ৯ : ঠু গুড টু বি ট্র

এর পরের কয়েকদিন, আমি বাধ্যগত ছিলাম। খাবারের সময় ছাড়া বাইরে যাইনি, নিজের ছোট বাসায় থেকেছি। স্টেশনারী দোকান থেকে টনের উপরে কেনা অরিগামি পেপার দিয়ে কাগজের সারস বানাতে লাগলাম।

সবগুলো সারসকে টেবিলে লাইন ধরে রাখতে দেখে মিয়াগি জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি থাউজেন্ড ক্রেইন চেন বানাবেন নাকি?”

“হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছ।”

মিয়াগি ডজন খানেকের ভিতর থেকে নীল রঙের একটা তুলে নিয়ে দুই ডানা চেপে ধরে আগ্রহ ভরে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল। “আপনি কি একা একাই সবকিছু করার চিন্তা করছেন না কি? কীসের জন্য?”

“মৃত্যুর আগে জীবনে সুখ লাভের আশাতে” আমি উত্তর দিলাম।

অর্থহীন কাজটা করে বেশ মজা পেলাম। সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্টটা রঙিন কাগজের সারস দিয়ে ভরে ফেললাম। গোলাপি সারস, লাল সারস, কমলা সারস, হলুদ সারস, হলুদ-সবুজ সারস, সবুজ সারস, হালকা নীল সারস, আকাশী নীল সারস, বেগুনী সারস।

সারসে সম্পূর্ণ টেবিলে ভরে গিয়েছে। ফ্যানের বাতাসে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ মেঝে ভরে যাবে। রুমটা রঙিন হয়ে উঠবে

সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি কিছুটা সন্তুষ্টি অনুভব করলাম। অর্থহীন তবুও সুন্দর কোনো কাজ করার চেয়ে খাঁটি কোনো ইচ্ছে আছে নাকি?

সারসগুলো ভাঁজ করতে করতে অনেকবার মিয়াগির সাথে কথা বলার তাড়না অনুভব করলাম। ওর সাথে যতটা সম্ভব কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া শুরু করেছিলাম। যদিও আমি ওর উপর নির্ভর করতে চাচ্ছি না।

কিন্তু এর মাঝেই আমার প্রতি মিয়াগির আচরণ নমনীয় হয়ে এলো। যখন আমাদের চোখ মিলিত হলো, একটা জড় বস্তুর মতো তাকানোর বদলে ও আসলেই আমার চোখের দিকে তাকাল। আমার মতে ও আগের চেয়ে বেশি

সঙ্গেহে তাকাতো লাগল ।

হয়তো বা সেদিনের রেল স্টেশনের হওয়া কথোপকথনের ফলে আমার প্রতি মনটা একটু খুলে দিয়েছে । অথবা মৃত্যুর সময় ঘনি়ে আসলে সাবজেক্টের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য পর্যবেক্ষকদের নির্দেশনা দেওয়া আছে ।

যে কারণেই হোক, ও আমার সাথে আছে ওর কাজের জন্য । যদি আমি সেটা ভুলে যাই তাহলে সেটা নিশ্চিতভাবেই ব্যাকফায়ার করবে ।

পাঁচ দিন পরে, অবশেষে আমার কাজ শেষ হলো । যখন ওগুলো আবারো গুণতে গেলাম, দেখলাম অনেকগুলো সারস খুব বেশি মাত্রায় ভালো । এগুলো আমি বানিয়েছি বলে বিশ্বাস হয় না ।

আমি যখন ঘুমে ছিলাম তখন একজন ছোঁকছোঁক করা মানুষ এগুলো ভাঁজ করেছে ।

আমি থাউজেন্ড ক্রেইনের ভিতরে দিয়ে তার ঢুকিয়ে দিয়ে আমার সৃষ্টিটা সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিলাম ।

এখন, চিঠিটা সম্পর্কে কথা বলা যাক ।

যে রাতে আমি সারসগুলো ভাঁজ করা শেষ করেছিলাম, সে রাতে খোলাই করার আগে জিন্সের পকেট চেক করে ভাঁজ করা একটা চিঠি পেলাম ।

এটা ছিল আমার দশ বছর পরে ভবিষ্যতের নিয়ে আমিকে লেখা চিঠি যেদিন আমি টাইম ক্যাপসুল খুঁড়ে বের করেছিলাম; সেদিন থেকে এটা আমার পকেটেই ছিল ।

জিন্সের পকেট ওলটপালট করে তারপরে সেটা ওয়াশিং মেশিনে দিলাম । এর আগে একবার নজর ঝুলিয়ে চিঠিটা আবার পড়লাম ।

চিঠিতে যা লেখা ছিল সেটা হলো-

দশ বছর পরের আমার উদ্দেশ্যেঃ

তুমিই একমাত্র লোক যার উপর আমি ভরসা করতে পারি ।

যদি বর্তমান আমি এখনো আগের আমার মতো থাকি, আমি চাই তুমি হিমেনোর সাথে দেখা করো ।

কারণ, আমি ছাড়া হিমেনো অকেজো

এবং হিমেনো ছাড়া আমি অকেজো ।

আমি সাহস করে মিয়াগিকে চিঠিটা দেখালাম ।

“আশ্চর্যজনকভাবে দশ বছর আগে আপনি সৎ এবং দয়ালু ছিলেন ।“ চিঠিটা

পড়ার পরে সে অভিভূত হয়ে মন্তব্য করল। “তাহলে, এখন কী করবেন আপনি”

“হিমনোর সাথে দেখা করবো” আমি উত্তর দিলাম। “আমি বুঝতে শুরু করেছি এটা কী রকম বোকামী এবং অর্থহীন একটা পদক্ষেপ। প্রায় এক যুগ দেখা না হওয়া ছোটবেলার কোনো বন্ধুর প্রতি টান অনুভব করা যে কী রকম বোকামী; সেটা আমি স্পষ্টতই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এটা আমার প্রতি আমাকে করা অনুরোধ। যা দশ বছর আগের আমি বর্তমানের আমার প্রতি করেছিলাম। আমি এটাকে সম্মান দেখাতে চাই। নিশ্চিতভাবেই, এটা আরও বেশি যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। এমনও হতে পারে আমি আরও বেশি হতাশ হবো। কিন্তু নিজ চোখে দেখার আগ পর্যন্ত হাল ছাড়তে পারবো না।”

“...আমি ওর সাথে অন্তত একবারের জন্য হলেও কথা বলতে চাই। এবং আমার জীবনদানের জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই। আয়ুষ্কাল বিক্রি করে পাওয়া ৩০০,০০০ ইয়েন ওকে দিতে চাই। আমি যদিও কিছুটা খরচ করে ফেলেছি। তুমি হয়তো এটা নিয়ে বিরোধিতা করবে; কিন্তু আমি পরোয়া করি না। এটা আমার আয়ুষ্কাল এবং আমার টাকা।’

“আমি আপনাকে থামাবো না” মিয়াগি বলল। “আমি আপনার অনুভূতিটা বুঝতে পারছি না; এই কথাও বলতে পারি না।”

মিয়াগি এত সহজে রাজি হয়ে যাবে আশা করিনি, সুতরাং কিছুটা হোঁচট খেলাম আমি। একইসাথে ওর কথার পিছনের তাৎপর্যও বুঝতে পারিনি।

কিন্তু পরে পিছন ফিরে তাকাতে, এখন কথাগুলোর মাজেজা বুঝতে পারি।

মিয়াগি শুধুমাত্র অনুভূতিটা “অনুধাবন”ই করেনি; ও জানতো। যা আমি জানার অনেক আগ থেকেই।

“আমি আগামীকাল হিমনোর বাসায় যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছি। ও কি ওর বাবা-মায়ের সাথে থাকে? এই ব্যাপারে তুমি কি জানো?”

“মনে হচ্ছে উনার স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর থেকে উনি ওনাদের উপরই নির্ভর করছেন।”

কথাটা বলার পরে, মিয়াগি ওর চোখ তুলল; মনে হলো সে আমার মুখ পর্যবেক্ষণ করছে। ও আমার সামনে হিমনো সম্পর্কে কথা বলতে দ্বিধা করছে। আমি বিরক্ত হবো চিন্তা করে।

আমি ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

“কোনো প্রয়োজন নেই” মিয়াগি স্বস্তির সাথে বলল।

হিমনো কোথায় থাকে সেটা আমি কিভাবে জানি, তা ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমেই আমাকে একমাত্র চিঠিটার কথা বলতে হয়। যা কিনা হিমনো স্কুল বদলানোর পরে, আমার সতেরো বছর বয়সে এক গ্রীষ্মে পেয়েছিলাম।

চিঠিটা পড়ার পরে, আমার কোথাও ভুল হয়েছে মনে হতে লাগল। আমি ভেবেছিলাম, মনে হয় না ও এরকম কিছু লিখবে।

এটা ছেলেমানুষি জিনিসপত্র দিয়ে ভর্তি ছিল। কিভাবে সে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত, কিভাবে পড়ার সময় বের করে, কিভাবে তাকে হোমওয়ার্ক এবং এই চিঠিটা লেখার জন্য সময় বের করতে হয়েছে; কোন কলেজে যাওয়ার আশা করছে সে, শীতের ছুটিতে কিভাবে ও দেখা করতে আসতেও পারে কিছু।

দেখে মনে হচ্ছে এসব জিনিস দশ বছরের বাচ্চার লেখা, কিন্তু হাতের লেখা সতেরো বছরের মেয়ের।

আর এটাই সবচেয়ে অদ্ভুত। যদি এটা কোনো সাধারণ সতেরো বছরের মেয়ে হতো, তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু এটা হিমনো। যে মেয়েটা, আমার মতো না, ও ‘গড়পড়তা মান-এর চেয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

তবুও ওর কথাতে আমি বিদ্রূপ অথবা অমর্যাদার একটা ইঙ্গিতও পেলাম না। এর মানে কী? আমার পরিচিত সেই হিমনো কোথায়? সতেরোতে পৌঁছালে কি মানুষ এতটা পরিবর্তন হয়ে যায়?

অথবা সহজে বলতে গেলে, ও যেভাবেই কথা বলুক না কেন; লেখাটা সবসময় এমনভাবে লেখে যাতে মনে হয় ও সাধারণ কোনো মেয়ে?

সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে দুই সপ্তাহ পরে, আমি যেরকম চিঠি পেয়েছি; সেরকম বিষয়বস্তুর একটা চিঠি পাঠালাম।

কিভাবে পরীক্ষার জন্য পড়ালেখা নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে চিঠির উত্তর দেওয়ার সময় বের করতে পারছিলাম না, কোন কলেজে আমি যেতে চাই, এবং হিমনো বেড়াতে আসলে কী রকম খুশি হবো এসব।

আমি ধৈর্যসহকারে ওর উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক সপ্তাহ গেল, এক মাস গেল, হিমনোর কাছ থেকে আর কোনো উত্তর এলো না। শীতের ছুটিতে বেড়াতেও আসল না।

আমি কি কোনো ভুল করেছি? সেসময়ে, আমার মনের সত্যিকারের অনুভূতির কথা লিখেছিলাম যাতে হিমনোর সাথে দেখা করতে পারি।

সেসময়ে আমি ভেবেছিলাম, হয়তো আমি ভালোভাবে লিখতে পারিনি।

কিন্তু... ততদিনে হিমেনো ইতোমধ্যে অন্য একজনের সন্তান বহন করেছিল। তা আমি জানতাম না। বাচ্চার বাবাকে সে আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করে। তারপরে, একবছর পরেই ডিভোর্স হয়ে যায়। পিছনে ফিরে তাকালে, আমি বলবো না এটা ভালো কোনো স্মৃতি। কিন্তু যে চিঠিটা ও আমাকে দিয়েছে তাতে ও কোথায় থাকে সেটা জানা গেছে। আমি আপাতত এটা নিয়েই খুশি।

যদিও আমার স্কুলে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। হিমেনোর সঠিক অবস্থান জানার জন্য আমার ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীর কম্পিউটার ধার নেওয়া প্রয়োজন।

আমার মোপড-এ চাবি ঢুকিয়ে প্যাডেলে পা রেখে কিক মারতেই মিয়াগির বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল।

“ওহ, হ্যাঁ। আমি তোমার থেকে একশো মিটারের বেশি দূরে যেতে পারবো না, তাই না।”

“একদম” মিয়াগি নিশ্চিত করল। “মাফ করবেন, আপনাকে একা একা এতদূরে যেতে দিতে পারি না... যদিও এই বাইকে দুই সিট আছে, আছে না?”

“হয়ে যাবে” আমি বললাম। সেকেন্ড হ্যান্ড কাব ১০১টা আমি স্কুলে যাওয়ার জন্য কিনেছিলাম। আমার কাছে অতিরিক্ত হেলমেট ছিল না। কিন্তু কেউ তো মিয়াগিকে দেখবে না। আর এমন না যে কেউ এসে আমাদের থামাবে।

“এটাকে ব্যবহার করা সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি বিরোধিতা করছেন।”

“প্রশ্নই আসে না। এ-নিয়ে চিন্তা করো না।”

আমি ইঞ্জিন চালু করে পিছনের দিকে নির্দেশ করলাম। মিয়াগি আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে পিছনে বসল। ওর হাত আমার কোমরে জড়িয়ে ধরল।

আমি সচরাচর যে পথে যাই সে পথেই স্বাভাবিকের চেয়ে কম স্পীডে চলতে লাগলাম। সকালটা ছিল মনোরম এবং স্মৃতি রোমন্থনপূর্ণ।

সোজা আর লম্বা একটি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আকাশে মেঘের বিশাল টুকরোর দেখা পেলাম।

ক্যাম্পাসে অনেকদিন আসিনি আমি। ফলে কেমন যেন নীরস এবং সম্পর্কহীন লাগছে। স্টুডেন্টরা এমনভাবে হাঁটছে যেন তারা অন্য কোনো জগতে বাস করা জীব।

এমনকি পাশ কাটিয়ে যাওয়া বিরল অসুখী মানুষকেও দেখে মনে হচ্ছে

তারা অসুখী হওয়াটা উপভোগ করছে।

ম্যাপটা প্রিন্ট করে ব্যাগে রেখে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এলাম। দোকানপাট এখনো খোলেনি, তো আমি ভেন্ডিং মেশিন থেকে একটা অ্যানপ্যান এবং ড্রিপ কফি কিনে লাউঞ্জ ব্রেকফাস্ট করলাম। মিয়াগি ডোনাট কিনে সেগুলো চিবাতে লাগল।

“আচ্ছা শোনো, এটা যদিও কোনো কাজের প্রশ্ন না। ধরো যদি তুমি আমার জায়গায় থাকতে তাহলে শেষ কয়েকটা মাস কিভাবে কাটাতে?” আমি মিয়াগিকে জিজ্ঞেস করলাম।

“উম... আমার মনে হয় ওই পরিস্থিতিতে না পড়ার আগ পর্যন্ত বলতে পারবো না” ও উত্তর দিয়ে আশপাশে তাকাল। “আমার মনে হয় আমি আপনাকে আগে একবার বলেছি। এরকম কোনো জায়গায় আপনার আমার সাথে কথা বলা উচিত নয়। ওরা ভাববে আপনি অদ্ভুত কোনো লোক, যে কিনা নিজের সাথে নিজেই কথা বলছেন।”

“ভাবতে দাও। আমি তো অদ্ভুত-ই।”

সত্যিই, শূন্যের সাথে কথা বলতে দেখে লাউঞ্জের মানুষজন আমাকে দিকে সতর্কদৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

আমি কিছু মনে করলাম না। সত্যি বলতে, আমি অদ্ভুত আচরণ করতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হয়, একেবারে মনে না রাখার চেয়ে অদ্ভুত হিসাবে মনে রাখাই ভালো।

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে মিয়াগি আমার পাশে এসে বসল।

“আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন তার উত্তর নিয়ে চিন্তা করলাম। এটা... সম্ভবত একটু বেশিই রাশভারী উত্তর। আমি যদি এরকম অবস্থায় থাকতাম, তিনটি জিনিস নিশ্চিতভাবেই আমি করতে চাইতাম।”

“বলো বলো। শোনার জন্য আর তর সইছে না।”

“যদিও আমার সন্দেহ আছে এগুলো আপনার উপর কাজ করবে কি না” মিয়াগি ব্যাখ্যা করল। “...প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট লেকে যাবো, দ্বিতীয়ত, নিজের জন্য একটা কবর বানাবো, আর তৃতীয়ত, আমার কাছে যে গুরুত্বপূর্ণ; তার সাথে দেখা করতে যাবো, যেটা আপনি এখন করছেন।”

“আমি জানি না; আমি ঠিক ধরতে পেরেছি কি না। আরও একটু তথ্য দিলে কেমন হয়?”

“হৃদটা... শুধুই হৃদ। যাহোক, ওখানে অবিশ্বাস্যরকম তারকাখচিত আকাশ দেখা যায়। এটুকু মনে আছে আমার। আমার নিকৃষ্ট জীবনের এটাই মনে হয় সবচেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা। কোনো সন্দেহ নেই পৃথিবীতে এর চেয়েও সুন্দর জায়গা আছে। কিন্তু এর মধ্যে যতটুকু আমি জানি তারকাখচিত সেই হৃদটাই সবচেয়ে সুন্দর।”

“আচ্ছা... আর কবর, তুমি তোমার জন্য এক খণ্ড জায়গা কিনতে চাও?”

“না। সত্যি বলতে, যদি আমি একটা বড়ো পাথর খুঁজে পাই এবং সিদ্ধান্ত নিই ‘এটাই হবে আমার কবর’ তবুও চলবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, তা হলো, আমার কবর হবে যে জায়গাটা; সেটা যেন অন্ততপক্ষে কয়েক দশক টিকে থাকে আর ‘আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ’ এমন লোকের ক্ষেত্রে...” মিয়াগি মাথা নত করল। “আমার মনে হয় আপনাকে না বলাই ভালো হবে, মি. কুসুনোকি।”

“ওহ। ধরে নিচ্ছি কোনো ছেলেই হবে?”

“আপনি ঠিকই ধরেছেন।”

স্পষ্ট করে বেশি বিস্তারিত বলতে ইচ্ছুক না ও।

আমি ভাবতে লাগলাম। মিয়াগির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ও দশ বছর বয়সে পর্যবেক্ষক হয়েছিল, এবং কেউ একজন ওর কাছে “এক সময়” গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ও সম্ভবত ওই সময়ের আগের কথাই বলছে।

“আমার মনে হয়, সেটা আমাকে যতই আঘাত করুক, যতই হতাশ করুক না কেন; আমি তবুও শেষ পর্যন্ত ওর সাথে দেখা করতে যেতাম। যার মানে, আপনি এখন যা করছেন; সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার কোনো অধিকার আমার নেই, মি. কুসুনোকি।”

“কথাগুলো ঠিক তোমার মনে হচ্ছে না। তোমার নিজের স্বরূপ; তার চেয়ে ভীত মনে হচ্ছে এটা, কী বলো?” আমি হাসলাম।

“সত্যি বলতে, আমি আমার নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই জানি না” মিয়াগি বলল।

এত সহজে মিয়াগির বাসা খুঁজে পেলাম যে, আমি আরেকবার নিশ্চিত হয়ে নিলাম।

প্রথমে, আমি খুব সহজে বিশ্বাস করতে পারিনি যে, এটা ওর বাড়ি। আমার সন্দেহ হলো এটা হয়তোবা একই শেষ নামের অন্য কোনো ফ্যামিলি হবে। কিন্তু আশপাশে “হিমনো” নামের আর কোনো বাড়ি নেই। হিমনো কোথায়

থাকে এই নিয়ে কোনো সন্দেহ রইল না।

স্কুল পরিবর্তন করার আগে হিমেনো প্রকাণ্ড জাপানিজ স্টাইলের বাসায় থাকতো। যে মেয়ের নামের সাথে ‘প্রিন্সেস’ আছে, এমন মেয়ের পক্ষে একদম মানিয়ে যায়। আমার শিশুতোষ মনে তখন তাই মনে হতো।

কিন্তু ম্যাপে উল্লেখিত জীর্ণ দেখতে যে বাসাটা আমি খুঁজে পেলাম; সেটা খুবই বিশেষত্বহীন। যে কেউ পাঁচ সেকেন্ডের জন্য মুখ ফিরিয়ে নিলেই ভুলে যাবে।

ডোরবেল বাজাতে গিয়ে আমি দ্বিধা করলাম না কারণ, আমার মনে এখনো ক্ষুদ্র আশা আছে; ওকে এখানে পাবো না। তিনবার ডোরবেল বাজালাম। কিন্তু কেউ দরজা খুলল না।

ভাবলাম যদি রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করি তাহলে কেউ একজন নিশ্চয় আসবে। সুতরাং ওই এলাকায় কিছুক্ষণ সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। স্কুল থেকে প্রিন্ট করা ম্যাপটার দিকে তাকালাম রাত নামার আগে সময়টা কাটানোর মতো জায়গার খোঁজে।

“পাবলিক লাইব্রেরি”তে আমার চোখ আটকে গেল। আজকে সকালে স্কুল লাইব্রেরিতে যাওয়ার পর থেকে বই পড়ার ইচ্ছে চাগিয়ে উঠেছে।

বাহির থেকে লাইব্রেরিটা দেখতে একদম পরিষ্কার। কিন্তু ভেতরে এক পা দিয়েই বুঝতে পারলাম; খুবই পুরাতন একটা লাইব্রেরি।

লাইব্রেরিটার একটা জোরালো ঘ্রাণ আছে। পরিত্যক্ত স্কুল বিল্ডিংয়ের মতো নোংরা। কিন্তু বইগুলো সব ঠিকমতো সাজানো।

ভাবতে লাগলাম মৃত্যুর আগে ঠিক কোন কোন ধরনের বই পড়া যায়। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, “মৃত্যুর আগে সম্ভাব্য কী ধরনের বই কাজে লাগবে?”

আমি শুধু ওই বইগুলোই পড়বো। সেসকল বই পড়তে চাই না; যেগুলো মূলত এই যুক্তিতে তাদের মূল্য হারিয়েছে এবং পড়ার পরে এই ভেবে অনুতাপ করতে হবে না যে, “এটা পড়ার মাঝে উপভোগের কী আছে?”

হতে পারে এক মাস পরে হলে বিষয়টি অন্যরকম হতো। তাহলে সেক্ষেত্রে, আমার পছন্দ ছিল পল অস্টার, কেঞ্জি মিয়াযাওয়া, ও. হেনরি, এবং হেমিংওয়ে।

যে বইগুলো নিলাম সেগুলো ছিল ছোট গল্পের। সম্ভবত এজন্য না যে আমি ওগুলো পছন্দ করি, আমি বড় গল্প পড়তে চাই না বলেই। একটা নির্দিষ্ট পরিসরের চেয়ে বড় কোনো গল্প পড়ার মতো এনার্জি আমার আছে কিনা সে

সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না।

যখন আমি ও. হেনরির ‘দ্য গিফট অভ মাজি’ পড়ছিলাম, মিয়াগি তখন আমার মুখোমুখি বসে ছিল। সেখান থেকে উঠে আমার পাশে বসে আমার দিকে লক্ষ রাখতে লাগল। একই সাথে আমি যে পাতায় আছে সেদিকেও চোখ বুলাতে লাগল।

“একই সাথে নজর রাখতে আর পড়তে চাচ্ছে?” আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম।

“ওরকমই” আরও কাছে ঘেঁষে মিয়াগি জবাব দিলো।

ওর মাঝে প্রশান্তিকর একটা ঘ্রাণ আছে, আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম। সন্ধ্যা ছয়টায় লাইব্রেরি বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি পড়লাম। মাঝেমধ্যে বাইরে গেলাম চোখকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য। আর ধূমপান করার জন্য স্মোকিং এরিয়াতে গেলাম।

অন্য কারো সাথে বই পড়ার এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। মনে হলো এভাবে পড়লে জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পায়। যেহেতু আমি শুধু আমার কেমন লাগছে ভাবছি না, একই জিনিস পড়ে মিয়াগির কেমন লাগছে সেটাও চিন্তা করা লাগছে।

আমরা হিমেনোর বাসার দিকে ফিরে গেলাম। কিন্তু তখনো ডোরবেল বাজালে কেউ আসল না। প্রতিবেশীরা কী ভাবে সে সম্পর্কে অবগত হয়েও, কারো আসার অপেক্ষায় হিমেনোর বাসার সামনে আরও এক ঘণ্টা যাবৎ অপেক্ষা করলাম।

সূর্য অস্ত গেল। চালু হলো পাওয়ার পোলের সেফটি লাইট। সিগারেটের গোড়া দিয়ে আমার পায়ের নিচে স্তূপ হয়ে গেল। মিয়াগি ওগুলোর দিকে অনুমোদন না দেওয়ার চোখে তাকাল। সুতরাং আমি ব্যাগ থেকে একটা প্রোটেক্টর অ্যাশট্রে বের করে ওগুলো সংগ্রহ করলাম।

মনে হচ্ছে আজকের মতো ইস্তফা দিয়ে অন্য কোনো সময় চেষ্টা করা উচিত।

অস্বীকার করতে পারবো না; হিমেনোর সাথে দেখা না হওয়াতে আমি কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি।

আমার মোপড-এ চাবি ঢুকিয়ে প্যাডেলে পা রেখে কিক মারতেই, মিয়াগির বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল।

ফিরে যাওয়ার পথে আমরা সম্ভবত ভুল দিকে চলে গিয়েছিলাম। কাগজের

লঠন ও শপিং ডিস্ট্রিক্টের লাইন দেওয়া একটা জায়গায় এসে পৌঁছালাম। যেহেতু আমি এই পথে আগে কখনো আসিনি; তাই এই পথ যে আমার বাবা-মায়ের বাসার কাছাকাছি আমাদের নিয়ে আসবে তা বুঝতে আমার বেশ কিছুটা সময় লাগল।

সামনের মন্দিরে আমার ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আমি ক্ষুধার্ত অনুভব করতে লাগলাম। সুতরাং কাবটা পার্কিং লটে থামিয়ে খাওয়ার মতো কিছু খোঁজে সসের সুবাসযুক্ত একটা স্যান্ডে হেঁটে গেলাম।

আমি দশ বছরের মধ্যে কোন ফেস্টিভ্যাল দেখিনি। হিমেনো চলে যাওয়ার পরে লোকাল ফেস্টিভ্যালগুলোতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

এটা ছিল খুব ছোট ফেস্টিভ্যাল। মাত্র পনেরোটা স্ট্যান্ড ছিল। কিন্তু এটার নিজস্ব একটা প্রাণ ছিল। একটা এরিয়াতে চিত্তবিনোদনের আয়োজন যত কম; লোকজন তত বেশি উত্তেজিত থাকে।

সুকিয়াকি এবং ফ্রাংকফুটার কেনার আগ পর্যন্ত সবকিছুই আমার পরিকল্পনা মতো এগোচ্ছিল। কিন্তু এরপরে আমার উপর পাগলামি ভর করল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সবগুলো স্ট্যান্ড থেকে কিছু-না-কিছু কিনবো।

আমি অক্টোপাসের ডামপ্লিং, শেইভড আইস, ব্রয়েলড সুইট কর্ন, ইসুইয়াকি, ডিপ-ফ্রাইড চিকেন, ক্যান্ডি অ্যাপেল, চকলেট বানানা, গ্রিলড চিকেন, গ্রিলড স্কুইড এবং ট্রপিক্যাল জুস কিনলাম। তারপরে সবগুলো নিয়ে পাথরের সিঁড়ির ধাপে বসলাম।

“এতকিছু কিনে আপনি কী করবেন?” মিয়াগি জিজ্ঞেস করল, বিস্মিত হয়ে।

“বালকসুলভ স্বপ্ন পূরণ করছি। আমি একা সবকিছু খেতে পারবো না। সুতরাং তোমার সাহায্য লাগবে।”

আমি ওগুলো নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। মিয়াগি কিছুটা দ্বিধা নিয়ে আমার ব্যাগের কাছে এসে ইসুইয়াকি খাওয়া শুরু করল।

ইতোমধ্যে যখন আমরা বারোটা আইটেমের সবগুলো মোটামুটি চেখে দেখা শেষ করলাম, মিয়াগি এবং আমার খাবারের ঘ্রাণের উপর বিরক্তি এসে গিয়েছে। কারণ, আমাদের দুজনের পেটই ছোট। এটা অনেকটা ওখানে ভলিবল ফিট করার মতো।

ভরপেটে, আমাদের দাঁড়ানোর মতো অবস্থা রইল না। মিয়াগি নির্লিপ্তভাবে

অ্যাপেল ক্যান্ডি চাটতে লাগল।

যেখানে বসে আছি, ওখান থেকে আমরা ফেস্টিভালের উদ্যান দেখতে পাচ্ছি। মন্দিরের দিকের সরু পথটা কাট দিয়ে ভর্তি। দুই সারি কাগজের লণ্ঠন সোজা এমনভাবে লাগানো যেন সেগুলো রেললাইনের আলো। সেগুলোর অনুজ্জ্বল লাল আলো আশপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

পাশ কাটিয়ে যাওয়া সবাইকে উৎফুল্লা দেখাচ্ছিল... সংক্ষেপে, এটা দশ বছর আগের দিন থেকে একটুও ব্যতিক্রম ছিল না।

সেদিনও, আমি এবং হিমেনো, নিচের হেঁটে চলা মানুষজনকে দেখতে দেখতে সিঁড়িতে এভাবে বসে ছিলাম। আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম; সবার সাথে মেশার আমাদের কোনো অধিকার নেই।

আমরা ‘কিছু একটা’র জন্য অপেক্ষা করছিলাম যা কি-না আমাদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিবে এবং আমাদের সম্পূর্ণভাবে বুঝাবে

আর তারপরেই হিমেনো ওর সেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, “ভালো কোনো কিছু” ঘটবেই, আর দশ বছর পরের গ্রীষ্মে, একদিন আমরা ‘বেঁচে থাকার জন্য সুখী হবো।

এরপরেও, ও আরও বলেছিল দশ বছর পরে যদি আমরা বিয়ে করার মতো কাউকে খুঁজে না পাই, তার মানে আমরা দুজনেই “সেলফে অবিক্রিত” আমাদের উচিত একসাথ হওয়া।

ঠিক আছে, আমি এখন সেই গ্রীষ্মে আছি। আর যে মেয়েটি এই প্রতিজ্ঞা করেছিল সে সেলফে অবিক্রিত থাকেনি, বরং সেকন্ড হ্যান্ড পণ্যে পরিণত হয়েছে। আর আমার জীবন শুধু অবিক্রিত অবস্থায়ই শেষ হবে না, বিক্রির যোগ্যই হয়নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আমাদের দুজনেরই কোনো মালিক নেই। আমাদের আবারো একাকী ছুড়ে ফেলা হয়েছে।

হিমেনো এখন কোথায়? আর ও করছেই বা কী?

আরেকবার ঘুরুরে পোকাকার ডাকে পরিবেষ্টিত মন্দিরে প্রার্থনা করলাম।

আমি খেয়াল করলাম বেশ অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। নোটবুকে মিয়াগির পেন্সিলের খসখসে আওয়াজ শুনতে পেলাম। ফেস্টিভ্যাল প্রায় শেষ হয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। ইতোমধ্যে কমে আসা শুরু হয়েছে লোকজনের ছায়া।

ট্রাশে ফেলার জন্য আবর্জনা সংগ্রহ করে মাথা তুললাম আমি। তারপরে

ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়ালাম ।

একটা অবয়ব সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ।

অন্ধকারে চেহারা দেখা যাচ্ছিল না । কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি ওকে চিনতে পারলাম । সময় আমার জন্য থমকে গেল ।

তো লোকে যা বলে, কিছু কিছু মুহূর্ত সত্যি সত্যিই খুব বেশি ভালো । আমি অনুভব করলাম আমার সারাশরীর আনন্দে কাঁপছে ।

ও প্রতিটা ধাপে পা দেওয়ার সাথে সাথে চার বছর বয়সে আমাদের পরিচয় হওয়ার প্রথম দিন থেকে, ও চলে যাওয়ার গ্রীষ্মের সেই দিনটা পর্যন্ত সবকিছু আমার মনে স্পষ্ট মোশনে চলতে লাগল ।

যদিও দশ বছর আগে থেকে ওকে এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে । আসলে ও কী রকম পরিবর্তন হয়েছে সেটা কোনো বিষয় নয় । ব্যাপারটা এরকমও না যে, আমি ওকে চিনতে পারবো না ।

আমরা একে অন্যের চেহারা দেখার মতো নিকটে আসতেই, আমি ফ্যাসফ্যাসে গলায় ওর নাম ধরে ডাক দিলাম ।

“হিমেনো ।”

মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ।

ওর প্রতিক্রিয়া ধীরে-ধীরে সম্পূর্ণ বিস্ময়ে রূপ নিতে লাগল ।

“...কুসুনোকি?”

হিমেনো ওর সেই সুপরিচিত স্বচ্ছ কণ্ঠে আমার নাম ধরে ডাকল ।

চ্যাপ্টার ১০ : টু মাই ওয়ান অ্যান্ড ওয়ানলি চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড

আমাদের পুনর্মিলনীতে আমার এবং হিমেনোর মাঝে কী কথা হয়েছিল সেটা অল্পই মনে আছে আমার। সত্যি বলতে, হিমেনো দেখতে কী রকম কিংবা ও কী রকম আচরণ করেছিল, আমি এমনকি সেটাও মনে করতে পারছিলাম না।

কিন্তু আমাদের মাঝে কী কথা হয়েছিল সেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমার জন্য, হিমেনোকে কিছু বলা এবং তার উত্তর দেওয়াটাই ছিল আমার একমাত্র চাওয়া।

দেখে মনে হয়নি ও ফেস্টিভ্যাল দেখতে এসেছে। ও সেখানে কাজ সংক্রান্ত প্রয়োজনে এসেছিল। আর ওর গাড়ি মন্দিরের পাশের স্টলের পার্ক করা ছিল। ও শুধু এখান দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল।

কী ধরনের কাজ করে সেটা ও এড়িয়ে গেল। হিমেনো আমাকে শুধু বলেছে ও “দুজনের মাধ্যম” হয়ে কাজ করে।

“আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে ভালো লাগতো। কিন্তু আমাকে একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে” ও বলল। চলে যাওয়ার জন্য উশখুশ করতে লাগল ও। সুতরাং আমি ওকে ড্রিন্কেস অথবা এরকম কিছু একটার নিমন্ত্রণ করলাম।

অ্যালকোহল ভালো না, কিন্তু আমরা একসাথে খাবার খেতে পারি। হিমেনো রাজি হলো।

দু’দিন পরে ডিনারে দেখা করার প্রতিজ্ঞা করে আমরা বিদায় নিলাম।

আমি খুশিতে এতই আত্মহারা হয়ে ছিলাম যে কিছুক্ষণের জন্য মিয়াগির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

“তো, বেশ ভালোই ছিল” মিয়াগি বলল। “আমার নিজের সাথেও এরকমটা ঘটার আশা করি না আমি।”

“আমিও না। সত্যি হওয়ার পক্ষে একটু বেশিই ভালো।”

“হ্যাঁ... আমার মনে হয় মাঝে মাঝে এটাই সত্যি।”

দু'দিন পরে আমার সাথে হিমেনোর সাথে আবার দেখা হবে। সত্যি বলতে, আমার উচিত ওটাকে আসল ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা। এর আগে আমার কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে 'মৃত্যুর আগে করতে হবে' লিস্টের হিমেনোর লাইনটা ক্রস দিয়ে কেটে দিলাম। বিছনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে মিয়াগিকে বললাম, “তোমার কাছে আমার একটা অদ্ভুত আবেদন আছে।”

“আমি ড্রিংকস করি না।”

“আরে সেটা না। আগামীকালের একটা বিষয় নিয়ে। হিমেনোর সাথে দেখা করার ব্যাপারে অতিরিক্ত সচেতন থাকতে চাই আমি। সৌভাগ্যবশত, হাতে দু'দিন সময় পেয়েছি। আগামীকাল নিজেকে প্রস্তুতের কাজে ব্যয় করতে পারি। আমি চাই তুমি আমাকে প্রস্তুতির ব্যাপারে সাহায্য করো।”

“আপনাকে প্রস্তুত করা?”

“তোমার কাছে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা অর্থহীন। আমি তোমার সাথে সত্যি কথাই বলবো। এই বিশ বছরের মধ্যে আমার সত্যিই কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল না। কখনই না। আমি যদি এখন হিমেনোর সাথে দেখা করতে যাই, সম্ভবত ওকে অনেক বেশি বিরক্ত করে ফেলবো এবং সবকিছু ভজকট পাকিয়ে ফেলবো। এটা দূর করার জন্য, আমি আগামীকাল শহরে গিয়ে রিহার্সেল করতে চাই।”

মিয়াগির মুখটা কয়েক মুহূর্তের জন্য শূন্য দেখাল।

“যদি আমি ভুল না করে না থাকি, আপনি আমাকে মিসেস হিমেনোর ভূমিকায় অভিনয় করতে বলছেন?”

“ঠিক ধরেছ। তুমি কি অংশগ্রহণ করবে?”

“...আসলে, আমি নিজেও খুব একটা বেশি কিছু জানি না। আর আমার মনে হয় এতে অনেক সমস্যা হবে...”

“ওহ, আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে দেখে না। তুমি কি সেটা বুঝাতে চাচ্ছ?”

“হ্যাঁ, সেটাই।” মিয়াগি নিশ্চিত করল।

“সেটা কোনো সমস্যা না। মানুষ আমাকে নিয়ে কী ভাবে; তা নিয়ে আমি কেন চিন্তা করবো? বরং হিমেনো আমার সম্পর্কে কী ভাবে; আমি সেটা নিয়ে ব্রিত হবো। যতক্ষণ পর্যন্ত হিমেনো আমাকে একটু হলেও পছন্দ করবে, আমি

তাতেই সন্তুষ্ট।”

মিয়াগিকে স্তম্ভিত দেখাল। “মিস, হিমনোর যে-কোনো ব্যাপারে আপনি চোখের পলকে বদলে যান। তাই না? কিন্তু অন্য একটা ঝামেলা আছে। আপনার জানা থাকার কথা, এই প্রজন্মের মেয়েরা কিভাবে চিন্তা করে সেটা সম্পর্কে আমি খুব কমই জানি। যেমন ধরুন, আমার মনে হয় না আপনি আমাকে উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। মিস. হিমনোর কাছে যা ভালো লাগতে পারে; আমার কাছে তা ভালো নাও লাগতে পারে। মিস. হিমনোর কাছে যা বিরক্তিকর আমার কাছে তা রোমাঞ্চকরও লাগতে পারে। মিস, হিমনোর কাছে যা কঠোর লাগতে পারে; আমার কাছে তা শালীন অমায়িক লাগতে পারে। এরকম অনেক অমিল থাকতে পারে। এভাবে, বিশ বছর বয়সের কাউকে নমুনা হিসাবে দেখলে...”

“তোমার কোনো বিষয়ে আসলে তুমি নিরহংকার হয়ে যাও, তাই না!” আমি মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম। “এটা কোনো সমস্যা না। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, বাহির থেকে তুমি অন্য কোনো মেয়ের চেয়ে ব্যতিক্রম নও। শুধুমাত্র একটা জায়গা ছাড়া। তুমি অন্যদের চেয়ে একটু বেশি কিউট।”

“...ঠিক আছে, যদি এটা আপনার কাছে তেমন কোনো সমস্যা মনে না হয়, তাহলে আমারও কোনো সমস্যা নেই।” মিয়াগি ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিলো।

পরেরদিন সকালে, আমি একটা স্যালুনে রিজার্ভেশন রাখলাম এবং শহরে গেলাম জুতা আর কাপড় কেনার জন্য। জীর্ণ ব্রুজিস আর ছেঁড়াফাড়া স্নিকার পরে তো হিমনোর সাথে দেখা করতে যেতে পারবো না।

আমার টেস্টের সাথে মিলে যায় এমন একটা দোকান খুঁজে বের করলাম। তারপরে মিয়াগির উপদেশ অনুসরণ করে একটা ফ্রেড পেটি পোলো টি-শার্ট, চিনো প্যান্ট, ম্যাচ করা বেল্ট কিনলাম। তারপরে জুতার দোকান থেকে চকোলেট কালারের ডেজার্ট বুট কিনলাম।

“আমার মনে হয় না আপনার জাঁকজমকপূর্ণ কিছু পরতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পরিষ্কার কিছু পরছেন, সেটাই যথেষ্ট।”

“আমি কি এটাকে ‘সঠিক উপদেশ’ বলে ধরে নিবো?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“যা খুশি ভেবে নিতে পারেন আপনি।”

“বুঝতে পেরেছি। আমি তাই করবো। যদিও, মনে হচ্ছে আমার সমালোচনা

করা হচ্ছে।”

“আমাকে আপনার ছোটো-ছোটো বিষয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই।”

কেনাকাটা শেষ হয়ে গেলে, আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়ের চেয়ে একটু আগেই গেলাম আমরা।

মিয়াগির পরামর্শ মতো, আমি ব্যাখা করে বললাম। “আগামীকাল আমি গুরুত্বপূর্ণ কারো সাথে দেখা করতে যাবো।” মহিলাটি আমাকে একটা প্রসন্ন হাসি উপহার দিয়ে প্যাশনের সাথে চুল কাটতে লাগল। সেইসাথে আমাকে আগামীকালকের বিশেষ দিনের জন্য কিছু প্র্যাক্টিক্যাল টিপস দিলো। নতুন কাপড়ে এবং নতুন হেয়ার স্টাইলে, আমাকে অন্যরকম মানুষের মতো লাগছিল বললেও ভুল হবে না। আউলা-ঝাউলা চুল এবং জীর্ণ শার্ট আমার চেহারায়, আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশ ভালো রকমের ছাপ রেখেছিল।

এখন ওসব ছুড়ে ফেলার পরে পপ মিউজিকের যুবক ছেলেদের মতো তরুণ লাগছে আমাকে।

“আপনাকে গতকালকের আগের ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম লাগছে” মিয়াগি আমাকে বলল।

“হ্যাঁ। আমাকে সত্যিই বছরে ১০,০০০ ইয়েন মূল্যের লোকের মতো লাগছে, তাই না?”

“একদম। মনে হচ্ছে আপনার সামনে একটা প্রতিশ্রুতিশীল সুখী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে।”

“ধন্যবাদ। হাসলে তোমাকে পরীর মতো লাগে।”

“আপনি আজকে অনেক সস্তা ধরনের কথা বলছেন, মি. কুসুনোকি।”

“তাই তো মনে হচ্ছে।”

“তো এই ‘পরীর’ কাহিনিটা কী?”

“মানে হচ্ছে মিষ্টি দেখতে বুদ্ধিমান মেয়ে।”

“দয়া করে এটা মিস. হিমেনোর জন্য তুলে রাখুন।”

“কিন্তু ওর গুণাবলি সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমি তোমার কথা বলছি, মিয়াগি। ওর প্রতিক্রিয়া তখনো সম্পূর্ণ অটুট। ও মাথাটা সামান্য ঝুঁকাল। “ধন্যবাদ। আপনার এবং আমার মূল্য; মানুষের মূল্যের তুলনায় কিছুই না। অন্তত আমাদের রিপোর্ট অনুসারে।”

“সত্যি খুব অদ্ভুত” আমি বললাম।

আমরা রাস্তার পাশের একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কথাবার্তা দেখে মনে হচ্ছিল আমি নিজের সাথে নিজেই কথা বলছি।

পাশে বসা মাঝবয়সি এক দম্পতি আমার দিকে চোরা-চোখে তাকাচ্ছিল এবং নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে, আমরা প্রধান সড়ক ছেড়ে ব্রিজের পাশের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে, নদীর পাশ ঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম।

ততক্ষণে আমি সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গিয়েছি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমি মিয়াগির হাত ধরে সামনে পিছনে দোল দিতে লাগলাম। মিয়াগিকে বেশ উদ্ভিগ্ন দেখাল। আমি বলতে গেলে ওকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলাম।

অন্যরা কেবল আমাকে অদ্ভুতভাবে হাঁটতে দেখছে। আমি এসব পাত্তা দেই না। আমি এমনিতেই সৎ মানুষের কাতারে পড়ি না। তাই নিজেকে আমি অদ্ভুত লোক হিসাবেই উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা খুবই সহজ।

একবার মিয়াগি আমার হাত ধরাতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পরে, ও ঝলমলে চেহারায় বলল, “এখন, মাতাল কুসুনোকি, আমাকে হিমেনো ভাবতে চেষ্টা করে পটাতে চেষ্টা করুন।

আমি থেমে গিয়ে মিয়াগির চোখে চোখ রেখে বললাম, “আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা যা ঘটেছে তা হচ্ছে তুমি আমার জীবনে আসাটা। সবচেয়ে খারাপ জিনিস ছিল তোমার চলে যাওয়াটা। এখন তোমার উত্তরের উপর নির্ভর করছে আমি কি আমার জীবনের সেরাটা ফিরে পাবো নাকি খারাপটা।”

“বাহ। চটকদার কথা হিসাবে খুবই মধুর উপস্থাপন বলা যায়। আমি সত্যিই মুগ্ধ।”

“তো হিমেনো কিভাবে উত্তর দিবে বলে তোমার মনে হয়?”

“ওহ, যদি এটা মিস. হিমেনো হতো” মিয়াগি মুখে হাত রেখে চিন্তা করল। “...সম্ভবত উনি বললেন, ‘হঠাৎ করে কী সব আজীবাজে কথা বলছ?’ এবং হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো।”

“ওহহ। যদি মিয়াগি হতো?”

“...আপনার কথার মানে বুঝলাম না।”

“মজা করছিলাম। এই নিয়ে চিন্তা করো না” আমি নিজে নিজে মুখ টিপে হাসলাম।

“আপনি সত্যি কি এমন ধরনের লোক, মি. কুসুনোকি? অর্থাৎ এই ধরনের রসিকতা করেন।”

“আমি নিজেও জানি না। আমি “ব্যক্তিত্ব” কিংবা “স্বভাব” অথবা “চরিত্র” এসব শব্দের উপর খুব একটা বিশ্বাস রাখি না। এসব জিনিস অবস্থার উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ বদলে যায়। লম্বা সময়ের জন্য দেখলে দেখা যাবে, মানুষ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের পছন্দের বিষয়ও পরিবর্তন করে নেয়। মানুষ ধারাবাহিকতায় অনেক বিশ্বাস রাখে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যা ভাবে এটা এর চেয়েও অনেক বেশি বাহ্যিক।”

“আপনি এরকম কিছু বলবেন এমনটা আশা করিনি আমি।”

“পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে যার চিন্তা করতে পছন্দ করে; তারা অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম।”

মিয়াগি মৃদুভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। “আমার মনে হয় কথাটা সত্যি” মিয়াগি একমত হলো।

হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেলে, আমরা একটা বাসে উঠে পড়লাম। বাসে বেশ অনেকজন প্যাসেঞ্জার ছিল। আমি মিয়াগির সাথে হিমেনোর আর আমার স্মৃতির কথা বলতে লাগলাম।

আমরা বেশ কয়েকটা বাস পরিবর্তন করলাম এবং শেষ পর্যন্ত ডেটের জন্য শহরের বিখ্যাত একটা পর্যবেক্ষণ প্লাটফর্মে এসে নামলাম। সেখানে অন্ততপক্ষে দশ জন যুগল ছিল যারা একে অন্যের হাত ধরে চুমু খাচ্ছিল। আমি মিয়াগির সাথে কথা বলা চালিয়ে গেলাম।

অদ্ভুতভাবে, আমার ওপর মানুষের নজর অনুভব করলাম না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

“প্রথমবার যখন আমি এখানে আসি সেসময় হিমেনো ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। প্যাচানো সিঁড়ি বেয়ে একটি বাচ্চা ওপরের রেলিংয়ে ওঠার জন্য একদম সঠিক উচ্চতায় ছিল। সুতরাং হিমেনো সেটা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু যখনই হিমেনো মেঝেতে নামতে নিলো, ঠিক তখনই আমি রেলিংয়ে একটা গ্যাপ লক্ষ করলাম। যদি আমি ওকে থামানোর জন্য সেখানে উপস্থিত না থাকতাম, ও নিশ্চিতভাবেই পড়ে যেত। ও বেশ বুদ্ধিমানের মতো ভাব ধরে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও খুবই বোকামি করে। ওকে তুমি একা ছেড়ে দিতে পারবে না। ওর দিকে দ্রুত যাওয়ার কারণে আমার গায়ে আঁচড় লেগেছিল। শুধুমাত্র সেদিন, ও

অস্বাভাবিকভাবে ভালো ব্যবহার করেছিল...”

আমি যতই কথা বলতে লাগলাম মিয়াগি আমার দিকে ঠিক ততটাই চিন্তিত নজরে তাকাতে লাগল। সম্ভবত ওর অস্বস্তি লাগছে।

ও আমার চেয়ে বেশি কিছু জানতো। তখনো পর্যন্ত ওর আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলা বাকি ছিল।

পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম ছিল সেটা ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে সঠিক জায়গা। কিন্তু ও সে ব্যাপারে কথা বলেনি।

হয়তো ও ভেবেছিল; যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পারি, আমাকে স্বপ্ন দেখতে দেওয়া উচিত।

অবশেষে দিনটা এলো। এটা ছিল বৃষ্টিস্নাত বিকেল। স্টেশনটা ছাতা বহন করা মানুষে পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয়তলা থেকে প্লাজার উপর নজর বুলাতেই, হরেক রকমের ছাতার নড়াচড়া দেখা গেল।

আমি বইয়ের দোকানের সামনে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু পাঁচটা বাজার দশ মিনিট পরেও হিমেনোর দেখা পাওয়া গেল না।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই, নিজেকে বললাম। বৃষ্টির জন্য সব জায়গায় প্রচুর ভিড়। ও সম্ভবত ব্যস্ত। তবুও আমি অধৈর্য হয়ে প্রতি মিনিটে অন্তত তিনবার করে আমার হাতের ঘড়িটি দেখতে লাগলাম।

বিশ মিনিট পার হতেই মনে হলো এক কিংবা দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আমি কি তবে ভুল জায়গায় অপেক্ষা করছি? নাকি হিমেনো? ও বলেছিল আমাকে বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়াতে। আর এটাই হচ্ছে এই এলাকার একমাত্র বইয়ের দোকান। তাহলে আমার ভুল হওয়া কীভাবে সম্ভব?

সাতাশ মিনিট পরে, আমি কেবলই মাত্র হিমেনোর খোঁজে নামতে যাব, আর সেই মুহূর্তে ওকে হাত নেড়ে আমার দিকে আসতে দেখলাম। গতকালকে দেওয়া ওর প্রতিশ্রুতি নিয়ে চিন্তা করা শুরু করেছিলাম আমি। ভেবেছিলাম ওটা ছিল পাশ কাটিয়ে যাওয়ার বাহানা। সুতরাং আমি সেটা বিশ্বাস করেই হাঁফ ছেড়েছিলাম।

এমনকি হিমেনো যদি এমন কেউ না হতো; যাকে দেখার জন্য আমি দশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছিলাম। তবুও তাকে দেখা মাত্র স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, সেদিন হিমেনোকে সত্যি সুন্দর লেগেছিল।

ওর শরীরের প্রতিটি বাঁক যেন খুব যত্নসহকারে বানানো হয়েছে। কেনো কিছুই খুব বেশি অতিরিক্ত ছিল না; মনে হয় ওর প্রতিটি অঙ্গ নিজ নিজ কাজে ভীষণ সতর্ক।

আমি যদি ওর পরিচিত কেউ না হতাম, হয়তো এক দেখাতেই আমার বুকে ব্যথা অনুভব হতো। ওর দেওয়া সেই ব্যথা আমার বুকে হয়তো একটা গর্ত রেখে যেত, যা পূরণ করার জন্য আমি মরতেও রাজি ছিলাম।

“ও কখনো আমার হবে না, হবে কি...যদি নাহয় তবে আমার জীবন কি বৃথা না?” আমি হয়তো এমনটাই ভাবতাম তখন।

সুতরাং স্টেশনের এত এত মানুষের মাঝে আমি ওর একমাত্র কাছের লোক চিন্তা করে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হতে লাগল। আমি এই ব্যাপারে খুবই খুশি ছিলাম।

“বৃষ্টির কারণে বাস দেরি করেছে” হিমেনো ব্যাখ্যা করল। “তোমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। আমি তোমাকে ট্রিট দিবো।”

“না, আমাকে অনুমতি দাও। আমি তোমাকে এবারে নিমন্ত্রণ জানিয়েছি। তোমার ট্রিটের কথা আজকের দিনের জন্য ভুলে যাও।”

আমি বুঝতে পারলাম যে শুধু আমার হাবভাবই বদলে যায়নি, আমার কণ্ঠও বদলে গিয়েছে।

“ভূমম। তাহলে তুমি ‘পরবর্তী সময়’-এরও আশা করছো?” সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে, সতর্ক দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ। এবং পরবর্তী সময়ে, আমি হয়তো আরেকবারের আশা করবো।”

“সত্যি বলছে দেখে খুশি হলাম” হিমেনো মুখ চেপে হাসল।

হিমেনো নিশ্চিতভাবেই এমন কিছুই বলবে, আমি নিজেকে ফিসফিস করে বললাম। দশ বছরেও ও একটুও বদলায়নি। ও এখনো ব্যঙ্গাত্মক কিন্তু আন্তরিকতার সাথে কথা বলে।

আমরা সুড়ঙ্গ দিয়ে গেলাম। এবং শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর পরে, আমি আমার ছাতা মেলে ধরলাম। হিমেনোসেটা দ্রুত গতিতে আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনের মাঝে ধরল।

“তুমি সবসময় তোমার ছাতা আনতে ভুলে যেতে, কুসুনোকি, সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমারটা তোমার সাথে ভাগাভাগি করতে হতো।”

“ঠিক বলেছ,” আমি ছাতাটা ফিরিয়ে ওর দিকে ধরে রেখে বললাম।

“তাহলে এখন থেকে উল্টোটা হলে ভালো হয় না?”

“আহ.....”

আমরা এক ছাতার নিচে হাঁটতে লাগলাম।

“আচ্ছা, সেদিন তুমি ওখানে কী করছিলে?” হিমেনো জিজ্ঞেস করল।

“তোমাকে খুঁজছিলাম, হিমেনো।” আমি উত্তর দিলাম।

“মিথ্যুক” হিমেনো বলল, আমার কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিয়ে।

“এটাই সত্যি’ আমি বললাম হাসতে হাসতে।

আমি ভাবছিলাম সবকিছু দুর্দান্ত চলছে।

আমি হিমেনোকে ওর প্রতি আমার অনুরাগের কথা বলছি। এবং ও আমার প্রতি ওর অনুরাগ দেখাচ্ছে।

এটাই আমি বিশ্বাস করেছিলাম, এ-নিয়ে কোনো সন্দেহ করিনি।

হিমেনোর অন্তরের গভীরে ঠিক কী চিন্তা চলছে, সেটা আমি সত্যিই জানতে চাইনি।

এখন, দুজনের উত্তরগুলোর তুলনা করলে কেমন হয়।

যখন রেস্টুরেন্টে হিমেনোর বিপরীতে বসে কথা বলতে লাগলাম, আমি একটা অবিশ্বাস্যভুল করে বসলাম।

ঠিক করে বললে, হয়তো ওটা কোনো ভুল নয়। ওই দৃশ্যটা পুনরায় দৃশ্যায়ন করার জন্য আমাকে যদি অসংখ্যবার সুযোগ দেওয়াও হয়, আমি সম্ভবত প্রতিবারই একই উত্তর বেছে নিতাম। আর কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না।

তার উপরে, আমার “ভুল” করার কারণটা ওই মিটিং-এ উৎপত্তি হয়নি। এটা অনেক আগে থেকে আস্তে আস্তে উৎপন্ন হয়েছিল।

তবুও যথাসময়ে, আমি নিশ্চিতভাবেই ভুল করেছিলাম।

কিন্তু ঘটনাক্রমে, “ভুল”-এর ফলাফলই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

কেন মিয়াগি, হিমেনোর সাথে আমার দেখা হওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল সেটাও জানতে পারলাম।

অর্ডার করার পরে, ওর প্রতি আমার অনুরাগ দেখানোর জন্য আমি হিমেনোর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। ও হাসি দিয়ে উত্তর দিলো।

হিমেনো গ্লাস থেকে এক চুমুক পানি পান করে বলল, “এত বছর ধরে তুমি কী করেছিলে, কুসুনোকি।”

“আমি তোমার সম্পর্কে আগে জানতে চাই” আমি বললাম। কিন্তু ও জোর

করল, “তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক।”

আমি ভূমিকাস্বরূপ “এটা শোনার মতো খুব একটা আকর্ষণীয় কিছু না” কথাটা দিয়ে শুরু করলাম। তারপরে আমার মিডেল স্কুল এবং হাই স্কুল নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। এটা সত্যিই তেমন কোনো আকর্ষণীয় কিছু না।

কিভাবে মিডেল স্কুলের সেকেন্ড ইয়ার থেকে আস্তে-আস্তে লেখাপড়ায় ঢিল দেওয়া শুরু করলাম। কিভাবে প্রতি বছর দশ বছর বয়স্ক আমার নিখুঁত স্মৃতি দ্রুত খারাপ হতে লাগল।

কিভাবে আমি ওই অঞ্চলের সেরা হাই স্কুলে গেলাম, কিন্তু কিভাবে মাঝ দিয়ে পড়া বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আমি সাধারণ মানের একটা কলেজে পড়ছি।

কিভাবে আমি আমার বাবা-মাকে কলেজের ফিস দেওয়ার জন্য রাজি করিয়েছি; যখন উনারা মনে করতেন বিখ্যাত কোনো কলেজ না হলে কলেজে যাওয়ার কোনো মানেই নেই।

কিভাবে ক্লাস এবং নিজের খরচপাতি আমি নিজেই বহন করছি।

এবং কিভাবে আমার সতেরো বছরের শীতের সময় থেকে আমি পেইন্টব্রাশ ছুঁইনি।

পাঁচ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে আমার বলা শেষ হয়ে গেল। আমার জীবন সম্পর্কে বলার মতো খুব কমই কথা জমানো ছিল।

“হাহ, তো তুমি আঁকাআঁকি ছেড়ে দিয়েছ... এটা খুবই খারাপ হলো। আমি তোমার ছবিগুলো পছন্দ করতাম, কুসুনোকি” হিমেনো বলল। আমি যাকে চিনতাম তার সাথে এই মানুষটির অনেক পার্থক্য, আমি ভাবলাম।

“তুমি সবসময় দারুণ আঁকতে। আর এত সুন্দর, শ্বাসরুদ্ধকর ছবি আঁকতে যেন এসব আঁকা কোনো ব্যাপারই ছিল না। জানো, আমি সেভাবে জীবনযাপন করতে পারিনি বলে, তখন সবসময়ই ঈর্ষান্বিত ছিলাম।”

“সেসময়ে তুমি আমাকে এরকম কিছুই বলনি।”

“কারণ, সেসময়ে আমি সত্যি তোমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলাম। আমার সমস্ত প্রতিভা ছিল পড়াশোনাকেন্দ্রিক। আমি সেসময়ে তোমার প্রতিভা মেনে নিতে চাইনি। তুমি সম্ভবত কখনই খেয়াল করোনি, মাঝেমধ্যে আমি তোমার আঁকা ছবি বাসায় নিয়ে যেতাম এবং ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, কুসুনোকি” হিমেনো বলল। ওর চোখ বহুদূরে তাকিয়ে আছে।

“হ্যাঁ, আমি তখন শত্রুর মতো ছিলাম। আমাদের একাডেমিক রেজাল্ট প্রায় একই ছিল, কিন্তু বড়দের প্রশংসা শুধুমাত্র সুন্দরী হিমেনোর ক্ষেত্রেই হতো। আমি তখন ভাবতাম কেউ একই সাথে সুন্দরী এবং ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার যোগ্য হওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়।”

“ওর মতো কেউ হাই স্কুল থেকে ড্রপ আউট হবে এমনটাও কেউ আশা করেনি” হিমেনো আকস্মিকভাবে মুখ ফস্কে বলল।

“ড্রপ আউট?” আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

“তাহলে তুমি জানতে না।” ও ভ্রু নিচে নামিয়ে হাসল। “আমি ভেবেছিলাম রিইউনিয়ন বা এরকম কিছুতে গুজব ছড়িয়ে থাকবে।”

“কোনো ক্লাস রিইউনিয়নে যাইনি। যেহেতু আমি ভেবেছিলাম তুমিও থাকবে না, হিমেনো।”

“হুমম। ...উম, এটা খুব আকর্ষণীয় আমি তা বলবো না, কিন্তু...”

হিমেনো তখন শুরু থেকে ড্রপ আউট পর্যন্ত সবকিছু ব্যাখ্যা করল। যাহোক, ও ওর প্রেগনেন্সির অংশটা সম্পূর্ণ বাদ দিলো যা কিনা মিয়াগি হিমেনোর জীবনের সারসংক্ষেপ বলার সময় বলেছিল।

হিমেনো শুধু বলল, “আমি একজন গ্র্যাজুয়েট করা সিনিয়রকে বিয়ে করেছিলাম এবং ড্রপ আউট হয়েছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তাই আমরা ডিভোর্স নিয়ে নিয়েছি।”

“আমার মনে হয় আমি শিশুসুলভ ছিলাম” হিমেনো জোর করে হাসি দিয়ে বলল। “সবকিছু যেভাবে আছে আমি সেগুলো ওভাবে গ্রহণ করে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারিনি। আমার ধারণা, একেবারে প্রথম থেকেই হওয়া ছোটো ছোটো খুঁত এবং জগাখিচুড়ি সহ্য করতে পারিনি আমি। যখন স্কুল পরিবর্তন করে তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম, দশ বছর আগের গ্রীষ্মের সেদিনের পর থেকে আমার মাথায় কিছুই পরিবর্তন হয়নি। আমি নিশ্চিত আমি তখন বুদ্ধিমান ছিলাম। কিন্তু সেটা আমাকে চিন্তা করাতে বাধ্য করল, আমার আর পরিপক্ব হওয়ার প্রয়োজন নেই। যখন সবাই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়েছে, আমার মাঝে এখনো দশ বছর আগের সেই স্বপ্ন দেখা মানুষটির চেয়ে খুব একটা পার্থক্য নেই।”

হিমেনো আহত ছোট মেয়ের মতো টেবিলের উপরে ওর হাতের দিকে এক দৃষ্টিতে রইল।

“তাহলে এবার বলো, তোমার কী অবস্থা, কুসুনোকি? আমি নিশ্চিত তুমি এই দশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছ, হওনি?”

এই জায়গায় এসে, আমি আমার স্থিরতা হারাতে শুরু করলাম।

“একমাত্র তুমিই পরিবর্তন হওনি ব্যাপারটা তা নয়, হিমেনো” আমি বললাম। “আমাদের আলাদা হওয়ার পর থেকে আমিও একইরকম আছি। বছরের পর বছর বেঁচে থাকার জন্য কোনো প্রেরণা ছিল না। একাকী সময়গুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে কেটে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল পৃথিবীটার অস্তিত্ব রয়েছে শুধু আমাকে হতাশ করার জন্য। হয়তো আমি ইতোমধ্যে মরে গিয়েছি, সেকারণে কয়েকদিন আগে...”

আমি জানি আমি কী বলছি। হিমেনোর কাছে শুনতে কেমন লাগবে সেটা ধারণা করতে পারছি আমি। এবং আমি এও বুঝতে পারছিলাম এটা করা কতটা বোকামি।

কিন্তু কিছুই আমাকে থামাতে পারল না।

“...আমি আমার আয়ুষ্কাল বিক্রি করে দিয়েছি। বছরে মাত্র ১০,০০০ ইয়েনের বিনিময়ে।”

হিমেনোর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ওকে হতভম্ব দেখাতে লাগল। কিন্তু কথার তোড় বন্ধ করা এক কথায় অসম্ভব। আমার ভিতরে যে তালগোল পাকানো অবস্থার স্তূপ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাকে বের হতে দিলাম।

আমি একটার পর একটা বলেই যেতে লাগলাম। যে দোকানটা আয়ুষ্কাল কেনে তার কথা। ভেবেছিলাম কয়েক মিলিয়ন ইয়েন পাবো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বনিম্ন দাম দশ হাজার ইয়েন পেলাম। ভবিষ্যতের প্রতি নিরাশ হয়ে, তিন মাস বাদে বাকিটা বিক্রি করে দেওয়ার কথা। এবং এরপর থেকে এক অদৃশ্য পর্যবেক্ষক অনুসরণ করছে সেই কথা।

আমি এমনভাবে কথা বলে গেলাম যেন তার কাছ থেকে সহানুভূতি আশা করছিলাম।

“তুমি ওকে দেখতে পারবে না, হিমেনো। কিন্তু আমার পর্যবেক্ষক ঠিক এখানেই আছে” আমি বললাম, মিয়াগির দিকে ইঙ্গিত করে। “এখানে, ঠিক এখানে। ওর নাম হচ্ছে মিয়াগি। ও খুব স্পষ্টভাবে কথা বলে, কিন্তু তুমি যদি ওর সাথে কথা বলো আসলে ও খুব...”

“আচ্ছা, কুসুনোকি? আমি অপমান করার জন্য বলছি না, কিন্তু... তুমি যা

বলছ সেটা যে কতটা অযৌক্তিক বুঝতে পারছ?” হিমেনো ক্ষমা চাওয়ার সুরে জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ, ব্যাপারটা কিরকম হাস্যকর শোনাচ্ছে আমি সেটা জানি।”

“হ্যাঁ, এটা হাস্যকর... কিন্তু জানো কুসুনোকি, তা সত্ত্বেও, আমি এটাকে মিথ্যা বলে চিন্তা করতে পারছি না। হাতে খুব বেশি সময় নেই কথাটাও না, আবার তোমার পাশে বসে একটা মেয়ে তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছে সেটাও না। আমরা দুজন দুজনকে এতদিন ধরে চিনি যে, তুমি যদি আমার সাথে মিথ্যা বলার চেষ্টা করো আমি সাথে-সাথেই ধরে ফেলতে পারবো। যদিও এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর, তুমি তোমার আয়ুষ্কাল বিক্রির ব্যাপারে মিথ্যা বলছ না। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।”

কাউকে বলে বোঝাতে পারবো না কী রকম খুশি হয়েছিলাম আমি সেমুহূর্তে।

“...আমি দুঃখিত, আমিও একটা জিনিস তোমার কাছ থেকে লুকিয়েছি...” হিমেনো কাশতে কাশতে মুখে একটা রুমাল দিলো। তারপরে উঠে দাঁড়াল।

“এক্সিউজ মি। বাকি কথা আমরা ডিনারের পরে চালিয়ে যাবো” হিমেনো বলল, তারপরে হাঁটা ধরল।

ও বাথরুমের দিকে যেতে লাগল। তাই আমি চিন্তা করলাম না।

আমাদের খাবার চলে এলো, এবং আমি আশা করছি হিমেনো জলদি ফিরে আসবে। ওর বাকি কথাটা শুনতে হবে আমার।

কিন্তু হিমেনো আর ফিরে এলো না।

যেহেতু ও অনেক দেরি করছিল, ওকে নিয়ে আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম হিমেনো রক্তশূন্যতায় মাথা ঘুরে পড়ে গেল কি-না অথবা এরকম কিছু একটা হলো কি-না। তাই আমি মিয়াগিকে অনুরোধ করলাম।

“মাফ করবে, তুমি কি লেডিস রুমে গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে দেখবে হয়তোবা হিমেনোর কিছু একটা হয়েছে।”

মিয়াগি নীরবে সম্মতির মাথা ঝাঁকাল। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে জানালো হিমেনো চলে গিয়েছে।

আমি সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্ট খুঁজে দেখলাম। কিন্তু কোথাও ওকে খুঁজে পেলাম না।

পরাজিত হয়ে সিটে ফিরে এসে ঠান্ডা গোশতের সামনে বসলাম। আমার

সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। পেটের মধ্যে ভারী এবং অস্বস্তিকর কিছু একটার উপস্থিতি টের পেলাম আমি।

গলা শুকিয়ে জ্বালা করতে লাগল। আমি গ্লাস ধরলে গেলাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এলো এবং পানি টেবিলে পড়ে গেল।

আমি ধীরে ধীরে ঠান্ডা পাস্তা খেতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে, মিয়াগি আমার বিপরীতে বসল এবং হিমেনোর পাস্তাটা খেতে লাগল।

“ঠান্ডা হলেও বেশ মজাদার” ও বলল।

আমি কিছুই বললাম না।

আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও, তখনো নিশ্চিত ছিলাম না কী রকম স্বাদ ছিল। আমি মিয়াগিকে প্রশ্ন করলাম।

“আচ্ছা, মিয়াগি। সত্যি করে বলো। তোমার কী মনে হয়, হিমেনো কেন চলে গেল?”

মিয়াগি উত্তর দিলো, “সম্ভবত উনি ভেবেছিলেন আপনি পাগল হয়ে গিয়েছেন।”

কথাটা এক দৃষ্টিতে সত্যিই।

কিন্তু সত্যিটা আরও একটু বেশিই জটিল, এবং মিয়াগিও সেটা জানে।

ও আমার খাতিরে, সেটা গোপন রেখেছিল।

রেজিস্টারে দাম চুকিয়ে বেরিয়ে আসার সময়, কেউ একজনকে পিছন থেকে আমাকে ডাকতে শুনলাম। ঘুরে দেখলাম ওয়েটার হাতে কিছু একটা নিয়ে আমার দিকে দৌড়ে আসছে।

“আপনি যে মহিলার সাথে এসেছিলেন উনি আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনাকে এটা দেওয়ার জন্য।”

এটা ছিল একটা চিঠি। চিঠিটা নোটবুকের ছেঁড়া পাতায় লেখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি সময় নিয়ে সেটা পড়লাম।

যখন পড়া শেষ হলো, আমি জানতে পারলাম প্রথম থেকেই মিয়াগি আমাকে মিথ্যা বলে এসেছে।

“তুমি এটা জানা সত্ত্বেও আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে?”

মিয়াগি মাথা নেড়ে উত্তর দিলো।

“হ্যাঁ। এজন্য আমি দুঃখিত।”

“ক্ষমা চাওয়ার কোনো দরকার নেই। তুমি আমাকে সুন্দর স্বপ্ন দেখতে দিয়েছ।”

আসলে আমার উচিত ক্ষমা চাওয়া। কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করে নেওয়ার মতো আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই আমার।

“আর আমার আসল জীবনে, হিমেনো ওর লক্ষ্যে সফল হয়েছিল, তাই না?”

“ঠিক” মিয়াগি বলল। “মিস. হিমেনো... সেটা ঠিক আপনার সামনেই করেছিল, মি. কুসুনোকি।

আমাকে দেখানোর জন্য। বছরের পর বছরের অপমান শোধ করার জন্য। আমি চিঠিটা আবারো পড়লাম।

সেটাতে ঠিক এটাই লেখা আছে।

আমার এক এবং একমাত্র ছোটবেলার বন্ধু।

আমার লক্ষ্য ছিল ঠিক তোমার সামনেই মরে যাওয়া।

আমার ইচ্ছে ছিল তোমাকে অবজার্ভেশন প্লাটফর্মের নিচে অপেক্ষা করানো এবং ঠিক তোমার পাশেই লাফ দিয়ে পড়ার

হয়তো তুমি কখনই খেয়াল করোনি, আমি সবসময়ই তোমাকে ঘৃণা করে এসেছি।

আমার সাহায্যের আবেদনে কখনই সাড়া দাওনি তুমি। তারপরেও স্বাভাবিকভাবে আমার সামনে উদয় হয়েছে। আমি তোমাকে এর চেয়ে বেশি ঘৃণা করতে পারতাম না।

আমি যেহেতু এখন তোমার কাছে প্রয়োজনহীন হয়ে পড়েছি, আমি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভেবেছি।

কিন্তু মনে হচ্ছে গত দশ বছরে তুমি আমার চেয়েও বেশি পাগল হয়ে হয়ে গিয়েছ।

এখন তোমার উপর প্রতিশোধ নিয়ে কোনো লাভ নেই।

সুতরাং আমি নীরবে গায়েব হয়ে যাচ্ছি।

বিদায়।

আমি শুধু এইটুকু আশা করতে পারি অল্প সময় বাকি থাকার যে কথা তুমি বলেছিলে; সেটা যেন সত্যি হয়।

কী বোকা আমি।

আমার সারাজীবন আমি একা থেকেছি শুধুমাত্র এরকম অনুভূতি এড়িয়ে চলার জন্য।

আমার উচিত ছিল শেষ পর্যন্ত নিজেকে বিশ্বাস করে যাওয়া।

আমি স্টেশনের পাশের ব্রিজে গেলাম। হিমেনোর চিঠি দিয়ে সাবধানে কাগজের প্লেন বানিয়ে নদীতে ছুড়ে দিলাম। নদীতে বিল্ডিংয়ের আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল। প্লেনটা কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে রইল। অবশেষে পানি স্পর্শ করে সেটা ডুবে গেল।

অতঃপর আমি হিমেনোকে দিতে চাওয়া টাকার এনভেলোপটা বের করে, পাশ কাটিয়ে যাওয়া প্রত্যেকের মাঝে ভাগবাটোয়ারা করে দিলাম।

মানুষজনের প্রতিক্রিয়া ছিল নানানরকম। কেউ কেউ আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল; আবার কেউ কেউ খুশিতে গদগদ হয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে টাকাটা নিলো।

কেউ কেউ টাকাটা ফিরিয়ে দিলো, আবার কেউ কেউ আরও বেশি চাইলো। “আপনার এখন থামা উচিত” মিয়াগি বলল নির্বিকারভাবে আমার জামার হাতা টেনে ধরে।

“আমি কাউকে বিরক্ত করছি না, করছি নাকি?” আমি উত্তর দিলাম, ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে।

টাকাটা মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল। আমি এমনকি আমার নিজের ওয়ালেট থেকে টাকা বের করলাম। আমি ১০,০০০ ইয়েনের বিল থেকে নিয়ে শুরু করে সবকিছুই দিয়ে দিলাম।

যখন দেওয়ার মতো আর কিছুই রইল না, আমি রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মানুষজন আমার দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাতে লাগল।

ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়ার মতো টাকাও আমার কাছে রইল না। সুতরাং আমি বাসার দিকে হাঁটা দিলাম। মিয়াগি ওর ব্যাগ থেকে একটা নীল ছাতা বের করে মেলে ধরল।

আমি বুঝতে পারলাম আমার ছাতাটা ভুলে রেস্টুরেন্টে ফেলে এসেছি। কিন্তু আমি ভিজে যাই নাকি ঠান্ডা বাধাই; তাতে কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

“আপনি ভিজে যাবেন” মিয়াগি বলল, ছাতাটা উপরে তুলে ধরে। ও আমাকে ওর ছাতার নিচে যেতে বলছে।

“দেখতেই পাচ্ছে,আমি এখন বৃষ্টিতে ভেজার মুড়ে আছি” আমি ওকে বললাম।

“তাই নাকি” ও বলল, ছাতাটা বন্ধ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে। মিয়াগি আমার পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। আমরা দুজনেই কাক-ভেজা হয়ে গেলাম।

“তোমার ভেজার কোনো প্রয়োজন নেই।”

“দেখতেই পাচ্ছেন, আমি ভেজার মুড়ে আছি” মিয়াগি হেসে উত্তর দিলো। তোমার যা মনে চায় করো, ও দিকে পিছন ফিরে আমি ভাবতে লাগলাম। আমি একটা বাসস্টপ খুঁজে পেলাম যেখানে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় নিতে পারি। মাথার উপরে একটা স্ট্রিটলাইট। যেটা মাঝেমধ্যে জ্বলছে আর নিভছে যেন সে নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, জ্বলতে হবে।

বসার সাথে-সাথেই, আমার প্রচণ্ড ঘুম পেলো। শরীর থেকে আমার মন বেশি পরিমাণে বিশ্রাম চাচ্ছে। মনে হয় আমি কয়েক মিনিটের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলামও। ভেজা শরীরের শিরশিরে ভাব আমাকে আবারো জাগিয়ে তুলল।

মিয়াগি আমার পাশে ঘুমাচ্ছিল। ও ওর হাঁটু চেপে ধরে আছে। নিজেকে উষ্ণ রাখার আশ্রয় চেষ্টায় রত।

আমার মতো একজন গর্দভ এবং স্বার্থপরের কাজকর্মের সাক্ষী হতে হচ্ছে বলে ওর প্রতি আমি করুণাবোধ করতে লাগলাম।

আমি ধীরে-ধীরে উঠে বসলাম যেন মিয়াগি জেগে না যায় ঠিক সেইভাবে। তারপরে চারপাশে ঘুরেফিরে একটা পরিত্যক্ত কমিউনিটি সেন্টার খুঁজে পেলাম।

আমি বলবো না এটা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ওটাতে এখনো বিদ্যুৎ আছে। সামনের দরজা এবং রুমগুলোতে তালা দেওয়া নয়।

বেঞ্চে ফিরে এসে, মিয়াগিকে কোলে তুলে নিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলাম। আমার চেয়ে কম ঘুমকাতুরে কোনো মেয়ে হলে নিশ্চিতভাবেই উঠে যেত। কিন্তু মিয়াগি হঠাৎ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

রুম থেকে তাতামি ম্যাটের গন্ধ আসছে। এক পাশে কুশনের স্তুপ রাখা। পোকামাকড় আছে কি-না দেখে নিয়ে, সেখান থেকে আমি কয়েকটা মেঝেতে ফেলে মিয়াগিকে সেগুলোর উপরে রাখলাম। নিজের বেডিংয়ের জন্য একই কাজ করলাম আমি। জানালার পাশে মশার কয়েল পড়ে থাকতে দেখলাম যেগুলো কিনা কয়েক দশক ধরে রয়েছে। আমার লাইটার দিয়ে একটা জ্বালালাম।

বৃষ্টির ফোঁটা ঘুমপাড়ানি গানের মতো কাজ করছিল।

আমি তাই করা শুরু করলাম; যা আমি ঘুমানোর আগে সচরাচর করি। আমি সেরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কল্পনা করতে লাগলাম।

আমি যেসব জায়গায় থাকতে চাই সেসব জায়গার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খুঁটিনাটি নিয়ে চিন্তা করতে ব্যয় করলাম।

আমি মুক্তভাবে সেসব “স্মৃতি” কল্পনা করতে লাগলাম, যা কখনোই আমার ছিল না। এবং “এমন কোথাও” যেখানে আমি কখনো যাইনি। হতে পারে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের “কোনো একদিন”।

সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে এটাই আমার অভ্যাস।

হয়তো এই ছেলেমানুষি অভ্যাসের কারণেই আমি বাস্তব জগতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি।

কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আপস করার এটাই একমাত্র উপায়।

সম্ভবত আমি যা ভাবছিলাম সেটাই আমাকে মাঝরাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। একটা স্বপ্নের মাঝে আশা খুঁজে পেলাম। হতাশার সময়ে যা খুবই সাধারণ।

এটা যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে বলতে হবে এটা খুবই লজ্জাজনক স্বপ্ন।

যদি এটা বাস্তবতা হয়; সত্যি বলতে, আর কিছুই আমাকে এরচেয়ে বেশি খুশি করতে পারবে না।

ম্যাটে কারো পায়ের শব্দে শুনতে পেলাম। ঘ্রাণ শুনে বুঝলাম এটা মিয়াগি। ও আমার বালিশের পাশে বসল। এমনকি গ্রীষ্মেও, মিয়াগির শরীর থেকে শীতের পরিষ্কার সকালের মতো ঘ্রাণ আসছে।

আমি চোখ বন্ধ রাখলাম। আমি জানি না কেন, কিন্তু মনে হলো এটা করাই সবচেয়ে ভালো হবে।

ও আমার মাথায় হাত ছোঁয়াল। তারপরে আঙুল-আঙুল হাত বুলাতে লাগল। সম্ভবত এক মিনিটের বেশি এটা করেনি।

মিয়াগি মনে হলো ফিসফিস করে কিছু একটা বলল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে আমি ঠিকমতো শুনতে পেলাম না।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়, আমি ভাবতে লাগলামঃ মিয়াগি আমাকে ঠিক কতটুকু সাহায্য করেছে? মিয়াগি যদি আমার পাশে না থাকতো তাহলে কী রকম কোণঠাসা অনুভব করতাম আমি।

একারণেই আমার উচিত ওকে আর বেশি উদ্ভিগ্ন না করা ।

ও এখানে চাকরির খাতিরে এসেছে । ও আমার প্রতি দয়ালু কারণ, খুব শীঘ্রই আমি মারা যাবো । এর মানে এই না আমার প্রতি ওর আকর্ষণ আছে ।

আমার কোনো অমূলক আশা করা উচিত না । এগুলো শুধু আমাকেই অসুখী করবে না, ওকেও অসুখী করবে । আমি ওর কাঁধে অতিরিক্ত অপরাধবোধ চাপিয়ে দিচ্ছি । যা আমার মৃত্যুর পরে তিক্ততায় পরিণত হবে ।

আমি নীরবে মারা যাবো । আমি আমার প্রতিদিনকার স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিনয়ী জীবনে ফিরে যাবো যেখানে কেউ আমাকে গোণায় ধরে না । ঠিক বিড়ালের মতো । আমি নীরবে এবং গোপনে নিঃশেষ হয়ে যাবো ।

আমি গোপনে এই প্রতিজ্ঞা করলাম ।

পরেরদিন সকালে তীব্র গরমে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম । বাইরে গ্রেড স্কুলের বাচ্চাদের শারীরিক কসরত করতে শুনলাম ।

মিয়াগি ইতোমধ্যে ঘুম থেকে উঠে গিয়েছে । নিনা সিমনের “আই উইশ আই নিউ” গুনগুন করছে এবং কুশনগুলো পরিপাটি করছে ।

আমি তখনো তন্দ্রালুভাব অনুভব করছিলাম । আমরা এখানে আর থাকতে পারবো না ।

“চলুন, বাসায় যাওয়া যাক” মিয়াগি বলল ।

“চলো ।” আমি উত্তর দিলাম ।

চ্যাপ্টার ১১ : পুশিং ফর অ্যা ভেডিং মেশিন ট্যুর

কমিউনিটি সেন্টার থেকে চার ঘণ্টা হাঁটার পরে, অবশেষে আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছালাম। আমার ঘরের ঘ্রাণ নস্টালজিক করে তুলল।

শরীর ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে। পায়ে ফোঁস্কা পড়ে গিয়েছে। শাওয়ারের দরজা খুলতেই, হঠাৎ আমার মনে হলো; আমার কি মিয়াগিকে আগে সেটা ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত কি-না। কিন্তু আমি যদি খুব বেশি উদ্বেগ দেখাই, তাহলে হয়তোবা আমাদের মাঝের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে সেটা নষ্ট করে ফেলত পারি।

গায়ে আরও পানি ঢালার ইচ্ছেকে কোনোমতে দমন করে, দ্রুত নিজেকে সাফ সুতরো করে জামা-কাপড় বদলিয়ে লিভিং রুমে গেলাম।

এ-পর্যন্ত আমি যা বুঝেছি, আমি ঘুমালে মিয়াগি ইচ্ছেমতো গোসল করতে এবং খেতে পারে। সুতরাং আমি তখনই ঘুমিয়ে পড়তে গেলাম।

যখন ঘুমানোর ভান করছিলাম, মিয়াগিকে শাওয়ারের দিকে যেতে শুনলাম। যখন উঠতে নিলাম, ওর ফিরে আসার পদশব্দ শুনে দ্রুত চোখ বন্ধ করলাম।

“মি. কুসুনোকি” মিয়াগি বলল।

আমি ওর কথা না শোনার ভান করলাম।

“মি. কুসুনোকি, আপনি কি ঘুমিয়ে গিয়েছেন?” মিয়াগি আমার বালিশের কাছে এসে ফিসফিস করতে লাগল। “আমি জিজ্ঞেস করছি, কারণ মনে হচ্ছে আপনি ঘুমের ভান করে আছেন। তাহলে, খুবই ভালো হবে যদি সেটা আপনি আমার জন্য করে থাকেন... শুভ রাত্রি। আমি আপনার শাওয়ারটা ধার নিচ্ছি।”

শাওয়ারের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনার পরে, উঠে বসে সচরাচর মিয়াগি ঘরের যেখানে বসে সেই কোণের দিকে তাকালাম।

আজকে রাতেও ও ওখানে ঘুমাবে, তাই না। এমন একটা অবস্থায় ও ঘুমাবে; যা দেখে মনে হয় না কেউ ওখানে ঘুমাতে পারবে। কয়েক মিনিট ঘুমাবে তো কয়েক মিনিট নজর রাখবে।

পরীক্ষামূলকভাবে, মিয়াগি যেভাবে বসে সেভাবে নকল করে ওখানে বসলাম আমি। এবং ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু বললেই ঘুম চলে আসে না।

মিয়াগি ফিরে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে সতর্ক কণ্ঠে বলল, “আপনি এখানে কী করছেন? আপনার বিছানায় ঘুমানো উচিত।”

“এটা তো আমার কথা। তোমার উচিত বিছানায় ঘুমানো। এভাবে ঘুমানো হাস্যকর।”

“এটা হাস্যকর হতে পারে। কিন্তু আমি এতে অভ্যস্ত।”

আমি বিছানার বাম পাশে সরে এলাম। “আমি এখন থেকে বাম পাশে ঘুমাবো। যাই ঘটুক না কেন, আমি ডান পাশে যাবো না, এমনকি দেখবোও না। আমাকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য এটা খুবই নিখুঁত জায়গা। তুমি এটা ব্যবহার করতে চাও কী চাও না সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। কিন্তু যে কোনো মূল্যেই হোক আমি বাম পাশেই ঘুমাবো।”

আমি মেঝেতে ঘুমাবো আর ও বিছানায়, এরকম কিছু মিয়াগি গ্রহণ করবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। যদিও আমি ওকে বলেছি আমার পাশে ঘুমানোতে কোনো সমস্যা নেই। তার মানে এই না যে ও সেটা গ্রহণ করবে।

“আপনি কি এখনো আধো ঘুমে, মি. কুসুনোকি?” মিয়াগি জিজ্ঞেস করল যেন সে আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাচ্ছে।

ওকে অগ্রাহ্য করে চোখ বন্ধ করে রইলাম। প্রায় বিশ মিনিট পরে অন্য পাশে মিয়াগির অস্তিত্ব অনুভব করলাম।

দুজনে পিঠ একে অন্যের দিকে দিয়ে আমরা একটা বিছানা ভাগাভাগি করে নিলাম। আমি বুঝতে পারলাম পরামর্শটা ছিল আসলে আমার নিজের প্রশান্তির জন্য। এভাবে, আমি আসলে মিয়াগিকে আবারো ঝামেলায় ফেলছি।

ও এসব চায়নি। আমার মহানুভবতায় সাড়া দিতে গিয়ে ওর এত বছরের পর্যবেক্ষকের অধ্যাবসায় ক্ষতি হতে পারে।

তার উপরে, মৃত্যুর কাছাকাছি থাকা কারো খামখেয়ালিপূর্ণ মহানুভবতা অস্থির লাগবে পারে। এরকম জিনিস মানুষকে সাহায্য করে না; উলটো মানুষকে কষ্ট দেয়।

তবুও মিয়াগি আমার কোমলতার নিস্প্রভতা আরও বেশি কোমলতা দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার মনে হয় ও আমাকে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে। অথবা হতে পারে ও খুবই ক্লান্ত।

ঘুম ভেঙে গেলে দেখলাম, রক্তিম সূর্যাস্ত পুরো ঘর রাঙিয়ে দিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম মিয়াগি অনেক আগেই জেগে উঠেছে। কিন্তু ও মনে হচ্ছে একটু বেশিই ঘুমাচ্ছে। আমি বিছানা থেকে উঠে তেছরা চোখে উজ্জ্বল সূর্য কিরণের দিকে তাকালাম। যে মুহূর্তে আমাদের চোখে চোখ মিলল, আমরা দুজনেই চোখ সরিয়ে নিলাম। গভীর ঘুম ঘুমানোর ফলে ওর চুল এবং জামা-কাপড় এলোমেলো হয়ে রয়েছে। ওকে প্রায় অরক্ষিত লাগছে।

“আমি আজকে একটু বেশি ক্লান্ত ছিলাম” মিয়াগি অজুহাত দেওয়ার মতো করে বলল। “আগামীকাল থেকে আমি আমার নিয়মিত জায়গায় ঘুমাবো।” তারপরে ও যোগ করল, “আপনাকে অনেক-অনেক ধন্যবাদ।”

মিয়াগির সাথে আমি সূর্যাস্তের সময় হাঁটতে লাগলাম। ঘুরুরে পোকা গুনগুন করে চলেছে।

হয়তো বিছানার ঘটনাটার জন্যই, মিয়াগি আজকে বেশ দূর থেকে অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে।

কনভেনিয়েন্স স্টোরে, আমার অল্প যে টাকা বাকি ছিল সেটা এবং আমার মাসিক পার্ট-টাইম জবের টাকা তুললাম।

এটা আমার শেষ যুদ্ধের তহবিল।

আমাকে খুব সচেতনতার সাথে এটা ব্যবহার করতে হবে।

পথচারী চলাচল করে এমন একটি ব্রিজের উপর থেকে সূর্যাস্ত দেখার পরে, বিফ বোল শপের দোকানে একটা স্পেশাল মেন্যু অর্ডার করলাম। এটাতে মিল টিকেট সিস্টেম ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং মিয়াগি ওর নিজের টিকেট কিনে আমার হাতে দিলো।

“করার মতো কিছু পাচ্ছি না” আমি বললাম মিশো স্যুপ শেষ করার পরে। “মৃত্যুর আগে করতে চাই” লিস্টের সবকিছু করা হয়ে গিয়েছে, তো এখন কী করণীয়?”

“যা মনে চায় করুন। আপনার নিশ্চয় শখ কিংবা এরকম কিছু থাকার কথা, তাই না?”

“হ্যাঁ। ওগুলো হচ্ছে গান শোনা এবং বই পড়া। কিন্তু এখন চিন্তা করে দেখলাম, এদুটো আসলে বেঁচে থাকার জন্য। মিউজিক এবং বই পড়াকে আমি জীবনের সাথে আপোষ করার জন্য ব্যবহার করতাম। এখন যেহেতু বেঁচে থাকার জন্য জোর করার কিছু নেই, এগুলো আগের মতো আর অতটা প্রয়োজনীয় নয়।”

“সম্ভবত, আপনি সেগুলো যেভাবে উপলব্ধি করতেন, সেটা কিছুটা পরিবর্তন করা উচিত। তাহলে এখন থেকে আপনি ওগুলোর আসল সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন।”

“হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে একটা সমস্যা আছে। যত বই-ই আমি পড়ি না কেন কিংবা যত মিউজিক আমি শুনি না কেন। সেগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক অনুভব করি না, যেন এর সাথে আমার করার কিছুই ছিল না। ভালো করে চিন্তা করো। এই পৃথিবীর প্রায় সব কিছুই তৈরি করা হয়েছে বেঁচে থাকা মানুষদের জন্য। অবশ্যই তা খুবই স্বাভাবিক। যে সকল মানুষ মারা যাবে; ওদের জন্য তো কেউ কিছু তৈরি করবে না।”

প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স্ক একজন লোক বিফ বোল খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল। আমাকে একা-একা মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে দেখে দ্রুত কুণ্ঠিত করল।

“আপনি কি এগুলো ছাড়া সাধারণ কিছুর কদর করেন না? উদাহরণস্বরূপ, আপনি কি পরিত্যক্ত জায়গার দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করেন? অথবা ট্রাকে একা-একা হাঁটা অথবা রেলপথের গিঁট গণনা করা? অথবা এক দশক আগে পরিত্যক্ত হওয়া আর্কেড ক্যাবিনেট খেলা পছন্দ করেন?”

“এগুলো একদম নির্দিষ্ট করা। আমার ধারণা ঠিক হয়ে থাকলে, তুমি এ ধরনের লোকজনকে পর্যবেক্ষণ করেছ?”

“হ্যাঁ। এমনকি এমন একজন ছিল যিনি উনার জীবনের শেষ মাসটা পিকআপ ট্রাকের উপরে শুয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। আয়ুষ্কাল বিক্রির সকল টাকা অচেনা একজন বৃদ্ধ লোককে দিয়ে অনুরোধ করেছিল পিকআপ ট্রাকটা এমন জায়গা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে যেখানে কেউ তাকে থামাবে না।”

“অবিশ্বাস হলেও সত্যি, আমার কাছে বেশ শান্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। মনে হচ্ছে লোকটি সবচেয়ে বুদ্ধিমান কাজ করেছে।”

“বরং এটা এর চেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। উড়ে যাওয়া দৃশ্য দেখার মধ্যে আলাদা একটা সতেজ অনুভূতি আছে।”

আমি চেষ্টা করলাম সেটা কল্পনা করার। নীল আকাশের নিচে, গ্রাম্য পথে, আরামদায়ক মৃদুমন্দ বাতাস অনুভব করার চেষ্টা করলাম। আমার সমস্ত স্মৃতি এবং অনুশোচনা মাথা থেকে রাস্তায় পর্যবসিত হবে। যতই সামনে এগুবে, ততই দূরে সরে যাওয়ার অনুভূতি হবে। অনেকটা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মতো।

“আমি কি এরকম আরও কিছু শুনতে পারি? যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ব্যবসায়িক কারণ অথবা গোপনীয়তার কারণে বলতে সমস্যা না হয়” আমি অনুরোধ করলাম।

“অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আমি আপনাকে এরকম ভুরি-ভুরি বলতে পারবো” মিয়াগি বলল। “আপনি এখানে এভাবে কথা বলতে থাকলে, আপনার দিকে মানুষ বরং সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে।”

ফিরে আসার সময় আমরা বিশাল বাঁক নিয়ে একটা ছোট সূর্যমুখীর মাঠ পাশ কাটিয়ে এলাম। অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে আমি কাবে চড়ে বসে আবারো বেরিয়ে পড়লাম।

হয়তো আমরা দুজনেই হালকা জামা-কাপড় পরেছিলাম। আমি পরিষ্কারভাবে ওর শরীরের স্নিগ্ধতা অনুভব করতে পারলাম। বিষয়টা আমাকে অস্থির করে তুলল।

ঘটনাক্রমে রেড লাইট খেয়াল করিনি বলে আমাকে দ্রুত ব্রেক চেপে ধরতে হলো। বিষয়টা আমাদের দুজনকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলল। আশা করছি ও আমার দ্রুগতির নাড়ি স্পন্দন টের পায়নি।

আমরা পাহাড়ে উঠলাম। কাবটা পার্ক করলাম শহরের সেরা দৃশ্য দেখার বিবেচিত সেই জায়গায়। একটা ভেন্ডিং মেশিন থেকে দুটি ক্যান কফি কিনে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

আমাদের ঠিক নিচে আবাসিক এরিয়াতে কমলা আলো বিচ্ছুরণ হচ্ছে। কাছ থেকে দেখা শহরের আলোর তুলনায় এখন খুব ছোট দেখাচ্ছে আলোটাকে।

ফিরে এসে, আমি দাঁত মাজলাম। তারপরে বিছানায় শুয়ে মিয়াগি কথা শুনতে লাগলাম। ও আমাকে বাচ্চাদের গল্পের বই পড়ে শোনানোর মতো ছন্দে ওর আগের পর্যবেক্ষণ করা লোকদের তুলনামূলক কম বেদনাদায়ক কাহিনি বলতে লাগল।

সত্যি বলতে, গল্পগুলোতে বিশেষত নতুনত্ব নেই। কিন্তু ওগুলো আমাকে চলতি সাহিত্যকর্ম থেকে বেশি সান্ত্বনা দিলো।

পরের দিন যখন বাকি অরিগামি পেপার দিয়ে কাগজের সারস বানাতে-বানাতে চিন্তা করতে লাগলাম; এখন কী করা উচিত। মিয়াগিও টেবিলে বসে সারস বানাতে শুরু করল।

“কাগজের সারসে ডুবে মরতে পারলে খারাপ হবে না” আমি বললাম

হাতের কোষে কয়েকটা নিয়ে সেগুলো উপরে ছুড়ে দিয়ে। একইভাবে মিয়াগি অনেকগুলো সংগ্রহ করে আমার মাথায় ঢেলে দিলো।

অরিগামি নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, বাইরে গেলাম তাজা বাতাসের জন্য। সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনে জায়গাতেই একটা ধরলাম। এবং ভেন্ডিং মেশিন থেকে ক্যানের কফি কিনে খাওয়ার পরে একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম।

যা আমার নাকের ডগায় থাকা স্বত্বেও দেখিনি।

মনে হয় মুখ ফস্কে কিছুটা বিড়বিড়ানি বেরিয়ে গিয়েছিল। কারণ, মিয়াগি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “কী হয়েছে?”

“না, আসলে, এটা সত্যিই বোকামি। মাত্রই মনে পড়ল, বাস্তবে আমার পছন্দনীয় কিছু একটা করার আছে।”

“প্লিজ, আমাকে বলুন।”

“আমি ভেন্ডিং মেশিন পছন্দ করি” মাথা চুলকে বললাম আমি।

“ওহ” মিয়াগি মনে হলো একটা বিট মিস করল। “...ওগুলোর কোন ব্যাপারটা আপনার পছন্দ?”

“ভ্রমম। আমি নিজেও নিশ্চিত করে জানি না কী বলবো। কিন্তু ছোট থাকা অবস্থায়, বড় হয়ে ভেন্ডিং মেশিন হতে চাইতাম।”

মিয়াগি ধীরে-ধীরে মাথা হেলিয়ে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল।

“উমম... শুধু নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করছি। ভেন্ডিং মেশিন বলতে আপনি কি সেই মেশিনের কথা বলছেন যেটা কফি, সোডা এসব জিনিস বিক্রি করে? আপনি যেগুলো ব্যবহার করেন সেগুলোর মতো?”

“হ্যাঁ। কিন্তু এর চেয়েও বেশি কিছু। সিগারেট, ছাতা, উদন, বরফ, আইসক্রিম, হ্যামবার্গার, ওডেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ক্রাফ বিফ স্যান্ডউইচ, কাপ নুডলস, বিয়ার, মদ... যে ভেন্ডিং মেশিন সব ধরনের জিনিস বিক্রি করে। জাপান হচ্ছে ভেন্ডিং মেশিনের ভূমি। কারণ, তারা জায়গামতো রাখার জন্য একদম উপযোগী।”

“তাহলে, আপনার ভেন্ডিং মেশিনের প্রতি ভালোবাসা আছে।”

“হ্যাঁ, তা আছে। আমি এগুলো ব্যবহার করতে পছন্দ করি। এমনকি আমি এগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেও পছন্দ করি। পুরাতন সাধারণ ভেন্ডিং মেশিনেও আমার চোখ আটকে যায় এবং কাছ থেকে দেখতে বাধ্য করে।”

“ভ্রম... নিজস্বতা আছে শখটার মধ্যে।” মিয়াগি আমার সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করল। এটা সত্যিই অর্থহীন শখ। একটুও কাজের মতো কোনো কাজ নয়। যা শুধু অর্থহীন, নিষ্কর্ম জীবনের প্রতীক, আমি চিন্তা করলাম।

“আমার মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি” মিয়াগি আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলল।

“আমার ভেন্ডিং মেশিন হওয়ার খায়েশ?” আমি হেসে বললাম।

“না, আমার মনে হয় না আমি সেটা বুঝতে পারবো। কিন্তু, দেখতেই পাচ্ছেন... ভেন্ডিং মেশিন অনেক আগে থেকেই আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি টাকা দিয়ে যাবেন; সেগুলো আপনাকে আন্তরিকতা প্রদান করবে। দ্রবের মূল্যের চেয়েও বেশি আন্তরিকতা প্রদান করবে।”

আমি ওর ছোট-বক্তা...তায় কিছুটা প্রভাবিত হলাম। “দারুণ, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তুমি সেটা আরও ভালোভাবে বলে দিলে।”

“ধন্যবাদ” বলে বো করল মিয়াগি। ওকে বিশেষ একটা খুশি মনে হলো না। “ভেন্ডিং মেশিন আমাদের পর্যবেক্ষকদের কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্লার্কদের মতো ওরা আমাদের উপেক্ষা করে না। তো আপনি ভেন্ডিং মেশিন পছন্দ করেন এটা খুবই ভালো কথা। তাহলে, আপনি আসলে এখন কী করতে চান?”

“আরে, পছন্দ করি এমন আরেকটা জিনিসের কথা বলতে দাও আমাকে। প্রতিবারই আমি এই সিগারেটের দোকানে এলে, এটা আমাকে পল অস্টারের “স্মোক”-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রতিদিন সকালে সিগারেটের দোকানের সামনে যা ঘটে তা আমি পছন্দ করি এবং এমন কিছু একটার ছবি বারেবারে তুলতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এরকম সাধারণ কিছুর উপর বিনিয়োগ করা সত্যি দারুণ থ্রিলিং। আমি অগি রেন-কে অনুকরণ করতে চাই। এমন ছবি তুলতে চাই যেগুলো প্রথম দেখাতে এক নজরে অর্থহীন মনে হয়। এমনভাবে সাধারণ ভেন্ডিং মেশিনের অগণিত ছবি তুলে যাওয়া, যা অন্য কেউ পারবে না।”

“আমি এখনো নিশ্চিত না ব্যাপারটা কিভাবে নিবো” মিয়াগি বলল। “কিন্তু আমার মনে হয় আমি এটাও পছন্দ করছি।”

তো এভাবেই, আমার ভেন্ডিং মেশিনের ট্যুর শুরু হলো।

সস্তায় কেনা যায় এমন একটা দোকান থেকে আমি একটা সিলভার হ্যালিডে ক্যামেরা, একটা স্ট্র্যাপ, এবং ফিল্মের দশটা রোল কিনলাম। একমাত্র এই প্রস্তুতিটাই আমার নেওয়ার ছিল।

আমি জানি একটা ডিজিটাল ক্যামেরা সস্তা এবং সহজে পরিচালনা করা যায়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল “ছবি তোলার” জন্য এটাই ভালো হবে।

আমি ক্যামেরাটা ফিল্ম দিয়ে ভর্তি করে, কাবে চড়ে বসলাম। এবং আমার চোখে পড়া সবগুলো ভেন্ডিং মেশিনের ছবি তুলে গেলাম।

যতবারই ছবি তুলি না কেন, যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি ভেন্ডিং মেশিনের চারপাশের জিনিসপত্র যাতে ছবিতে থাকে।

ছোটখাটো পার্থক্য নিয়ে চিন্তিত ছিলাম না যেমন কী ধরনের ড্রিস্ক রাখা হয়েছে এবং বাটনের লেআউট কেমন। আমি কেবল ভেন্ডিং মেশিন কী অবস্থায় আছে এবং কোথায় আছে; সেটার ছবি তুলতে চেয়েছি।

একবার খোঁজা শুরু করার পরে, শহর জুড়ে অনেক-অনেক ভেন্ডিং মেশিনের সন্ধান পেলাম। অ্যাপার্টমেন্টের চারপাশেই কয়েক ডজন ছবি তুললাম।

এতদিন অনেক-অনেক ভেন্ডিং মেশিনকে উপেক্ষা করে গিয়েছিলাম। যতবারই এগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাই না কেন, হঠাৎ এগুলো আবিষ্কার করতে পেরে আমার হৃদয় খুশিতে নেচে উঠেছে।

মাঝে-মাঝে একই ভেন্ডিং মেশিন সকালে এবং রাতে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। যখন কিছু-কিছু ভেন্ডিং মেশিন চমকাতে এবং পোকামাকড় আলোতে ভনভন করতে থাকে; অন্যগুলো তখন শুধু বাটন জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে অন্ধকারে মিশে থাকে।

আমি জানি, এমনকি এরকম হাস্যকর শখের বেলায় আমার চেয়েও সিরিয়াস মানুষ আছে। ওদের সাথে তুলনা করতে পারবো না নিজেকে।

কিন্তু মনেপ্রাণে আসলেই বিষয়টা পাত্তা দিই না আমি।

প্রতিদিনের শুরুতে, আমি ফটো স্টুডিওতে যাই এবং ফিল্ম ডেভেলাপ হতে হতে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সকালের নাস্তা করি। দিন শেষে, প্রতিদিন সকালে যে ছবিগুলো ডেভেলাপ করেছিলাম; সেগুলো টেবিলের উপরে রেখে মিয়াগির সাথে মিলে দেখি। তারপরে সতর্কতার সাথে প্রতিটি অ্যালবামে রাখি।

সবগুলো ছবির মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে-ছবিগুলো সব ভেন্ডিং মেশিনের উপর ফোকাস করা।

অনেকটা এরকম যে, একজন লোক সবার মাঝে দাঁড়িয়ে একই ছবি তুলছে। সবসময় একই পোজ এবং একই অভিব্যক্তি সহকারে।

কিভাবে আমি প্রতিদিন সকালে ভেন্ডিং মেশিনের ছবি ডেভেলাপ করার জন্য

চলে আসি, ব্যাপারটা দেখে ফটো স্টুডিয়ার মালিক লোকটা আমার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করল।

লোকটার বয়স চল্লিশের মতো হবে। চুলগুলো অনেক ধূসর। লোকটি ভীষণভাবে শীর্ণ এবং খুব বিনয়ী। একদিন তিনি আমাকে সাধারণভাবে শূন্যের সাথে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করল।

“তো, ওখানে কেউ একজন আছে, তাই না?”

মিয়াগি এবং আমি একে অন্যের দিকে তাকালাম।

“ঠিক ধরেছেন। মিয়াগি নামের একটা মেয়ে। তার কাজ হচ্ছে আমাকে পর্যবেক্ষণ করা” আমি বললাম। যদিও মিয়াগি জানে এটা অর্থহীন। তবুও ও মাথা নিচু করে বো করল।

আমি আশা করিনি উনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন। কিন্তু তিনি সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে “বেশ ভালো” বুঝিয়ে দিলেন এবং দ্রুত মিয়াগির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেন।

দৈবাৎ এরকম অদ্ভুত লোকের দেখা পাওয়া যায়।

“তাহলে এসব অদ্ভুত ছবি, তবে কি তুমি আসলে মেয়েটার ছবি তুলছো?” লোকটি জিজ্ঞেস করল।

“না, এরকম কিছু না। এগুলো কেবলই ভেন্ডিং মেশিনের ছবি। আমি মিয়াগির সাহায্য নিয়ে ভেন্ডিং মেশিনের ট্যুর দিচ্ছি।”

“এতে মেয়েটার কোনো লাভ হবে?”

“না। এটা আসলে আমার শখ। মিয়াগি শুধু আমার সাথে আছে। এটাই ওর চাকরি।”

দোকানের মালিকের চেহারাই বলে দিলো ঠিক কতটুকু বুঝেছেন তিনি। “ঠিক আছে, মনে থাকবে” তিনি বললেন।

দোকান থেকে বের হয়ে মিয়াগি কাবের পিছনের সংযুক্ত সিটের পাশে দাঁড়াল। সেই অবস্থায় আমি ওর একটা ছবি তুললাম।

“কী করছেন আপনি?” ও জিজ্ঞেস করল মাথা হেলিয়ে।

“দোকানের মালিক বলার পরে মনে হলো একটা ছবি তুলি।”

“ছবিটা অন্যদের কাছে অর্থহীন বাইকের ছবি মনে হবে।”

“আমার সকল ছবিই অন্যদের কাছে অর্থহীন মনে হবে।” আমি বললাম। অবশ্যই, স্টুডিয়ার মালিকের মতো লোকও আছে। কিন্তু এদের সংখ্যা

হাতেগোনা।

একদিন সকালে আমরা যখন একটা আস্তাকুঁড়ের উদ্দেশ্যে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হচ্ছিলাম, আমি দরজা ধরে রেখেছিলাম মিয়াগিকে জুতা পরার সময় দেওয়ার জন্য। সেই মুহূর্তে আমার এক প্রতিবেশী নেমে আসছিল। লম্বাচওড়া সে লোকটির চোখ থেকে আগুন ঝরছিল।

মিয়াগি বের হয়ে এসে দেরি করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। আমি ওর পিছনে দরজা বন্ধ করে বললাম, “ঠিক আছে। এবার যাওয়া যাক।”

লোকটি আমার দিকে বিরক্ত হওয়ার চাহনি দিলো।

দিনটা ছিল একদম পরিষ্কার, তেমন ঝড়ো নয়। কখনো নামও শুনিনি এমন একটা অঞ্চলে হারিয়ে গেলাম আমি। দুই ঘণ্টা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরার পরে অবশেষে পরিচিত একটা জায়গায় উপস্থিত হলাম। আবারো আমার এবং হিমেনোর-আদি শহরে উপস্থিত হলাম আমি। হয়তো আমি হারিয়ে গেলে অপরিহার্য দিকনির্দেশনা স্বরূপ এখানে পৌঁছে যাই। নাহয় এটা অনেকটা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সহজাত প্রবৃত্তি মতো।

অবশ্যই, এতে জায়গাটা যে ভেন্ডিং মেশিনে পরিপূর্ণ; এই সত্যটা পরিবর্তন করা যাবে না। আমি ছবি তুলতে তুলতে কাবটা চালিয়ে গেলাম।

আমি একটা ক্যান্ডির দোকানে আইসক্রিমের ভেন্ডিং মেশিন খুঁজে পেলাম। ছোট থাকতে প্রায়ই যেতাম ওখানে। আমার নির্দিষ্ট পছন্দ ছিল চকলেট বার্লি প্যাফস, কিনাকো স্টিকস, ডাইস ক্যারামেল, অরেঞ্জ গাম, বোটান রাইস ক্যান্ডি। চিন্তা করে দেখলাম, আমি মিষ্টি ছাড়া কিছুই খাইনি।

ক্যান্ডির দোকানটা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লাল জং ধরা, ধসে যাওয়া ভেন্ডিং মেশিনটা প্রথমবার যেমন দেখেছিলাম তেমনই আছে।

রাস্তার অপর পাশের ফোন বুথ দেখে বাহির থেকে পাবলিক টয়লেট বলে মনে হয়। সেটাও সেসময় থেকে আছে। ভেন্ডিং মেশিনটাকে দেখে এখনো কোনোমতে কাজ করে বলে মনে হলো।

মিয়াগি এবং আমি জংলা পার্কের বেঞ্চে বসলাম। গাছের ফাঁক দিয়ে আশা সূর্যের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছে। আমরা আজকে সকালে নিজেদের বানানো ওনিগিরি খেলাম।

আশপাশে জনমানুষের কোনো দেখা নেই। কিন্তু একটা কালো এবং বাদামি বিড়ালকে দেখা গেল। বিড়ালগুলো দূর থেকে দেখতে লাগল যেন কোনো বিপদ

আঁচ করার চেষ্টা করছে। তারপরে ধীরে-ধীরে আমাদের কাছে আসতে লাগল।

আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ওদের দেওয়ার মতো খাবার যদি আমার কাছে থাকতো। দুঃখজনকভাবে আমার কাছে এমন কিছু নেই যা বিড়ালদের আকর্ষণ করবে।

“আমার এখন মনে পড়ল মিয়াগি, বিড়ালরা কি তোমাকে দেখতে পায়?”

মিয়াগি উঠে দাঁড়িয়ে বিড়ালদের কাছে গেল। কালো বিড়ালটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। বাদামি বিড়ালটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াল, তারপরে কয়েক সেকেন্ড পরে প্রথম বিড়ালের পথ অনুসরণ করল।

“অবশ্যই, কুকুর এবং বিড়াল আমাকে দেখতে পায়।” মিয়াগি বলল, ঘুরে দাঁড়িয়ে। “এক প্রকার বলা যায়, ওরা আমাকে পছন্দ করে না।”

খাওয়ার পরে আমরা ছোটখাটো একটা বিশ্রাম নিলাম। মিয়াগি ওর নোটবুকে পেন্সিল দিয়ে আঁকতে শুরু করল।

আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বিড়ালগুলোকে খুঁজে পেলাম। ওগুলো একটা দেয়ালের উপর উঠেছে। মনে হচ্ছে মিয়াগির দৃশ্যটা মনে ধরেছে।

ওর এরকম শখ আছে জেনে আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছি। হয়তো এতদিন ধরে ওকে দেখে মনে হতো; ও ওর পর্যবেক্ষণ লগ লিখছে। কিন্তু ও আসলে ওর নিজের বিনোদনে মগ্ন ছিল।

“দেখা যাচ্ছে তোমারও শখ আছে?” আমি মন্তব্য করলাম।

“হ্যাঁ, আপনি কি অবাক হয়েছেন?”

“হ্যাঁ, যদিও তোমার কাজ তেমন সুবিধার না।”

“সে কারণেই আমি অনুশীলন করে যাচ্ছি। এটা দারুণ না?” মিয়াগি বলল, কোনো কারণে গর্বিত হয়ে।

“তুমি কী আঁকছ আমাকে দেখাতে পারো?”

ও হঠাৎ ওর নোটবুক বন্ধ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল।

“আমাদের এখন উঠা উচিত” মিয়াগি বলল, দ্রুত চলতে-চলতে।

আমার নিজের শহরে প্রায় আধা দিন কাটানোর পরে, পরবর্তী শহরে যাওয়ার সময় যখন ক্যান্ডি স্টোরটা আবারো পাশ কাটাচ্ছিলাম। দোকানের সামনের স্লো ব্র্যান্ড বেঞ্চে কাউকে বসে থাকতে দেখলাম। বেঞ্চে বসে থাকা মহিলাকে আমি চিনি।

কাবটা রাস্তার পাশে পার্ক করলাম। ইঞ্জিন বন্ধ করে বেঞ্চে বসা বৃদ্ধ

মহিলার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি

“এই যে শুনছেন।”

উনার প্রতিক্রিয়া জানাতে বেশ সময় লাগল। কিন্তু আমার কণ্ঠ উনার কানে ঠিকই পৌঁছেছে। তিনি আমার দিকে চোখ ফেরালেন।

উনার বয়স ৯০ বছরের উপরে হবে নিশ্চিত। মুখ এবং কোলের উপর ভাঁজ করে রাখা হাতে হাজারের উপর বলিরেখা। খাড়া সাদা চুল ঝুলে রয়েছে নির্জীবভাবে। এবং উনার বিমর্ষ চাহনি একেবারে করুণ। আমি বেঞ্চের সামনে উবু হয়ে বসে আবারো অভিবাদন জানালাম।

“আপনি সম্ভবত আমাকে মনে করতে পারছেন না, তাই না?”

মনে হচ্ছে উনার নীরবতাকে অনুমোদন হিসাবে ধরে নিতে হবে।

“বুঝতে পেরেছি। প্রায় দশ বছর আগে শেষবার আমি এখানে এসেছিলাম।”

যা প্রত্যাশা করেছিলাম। উনি কোনো উত্তর দিলেন না। বৃদ্ধা মহিলার দৃষ্টি কয়েক মিটার সামনে নিবদ্ধ রইল। আমি একা একাই কথা চালিয়ে গেলাম।

“কিন্তু আমি আপনাকে ভালোভাবেই মনে করতে পারছি। তরুণ থাকলে ভালো স্মৃতি থাকবে এটা বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। আমার বয়স বিশ হলেও অতীতের অনেক কিছু আমি ভুলে গিয়েছি। সুখের কিংবা দুঃখের যাই হোক না কেন, আপনি যদি ঘটনাটা মনে না করেন তাহলে খুব দ্রুত ভুলে যাবেন। মানুষ উপলব্ধি করে না যে, তারা ভুলে যাওয়াই ভুলে যায়। সবাই যদি অতীতের সুখের মুহূর্তগুলো নিখুঁতভাবে জমিয়ে রাখে, তাহলে তারা তাদের অপেক্ষাকৃত নিঃসাড় বর্তমান জীবনে দুঃখের জীবনযাপন করবে। যদি সবাই অতীতের দুঃখের স্মৃতি নিখুঁতভাবে জমা রাখে, তবুও তারা দুঃখী থাকবে। সবাই শুধু তাই মনে রাখে যা মনে রাখা অস্বস্তিকর নয়।”

কোনো প্রকার তর্ক কিংবা সম্মতির ঝামেলা নেই। বৃদ্ধা মহিলা এখনো কাকতাল-য়ার মতো স্থির হয়ে আছে।

“যদিও স্মৃতি অস্থায়ী তবুও আপনি আমার মন থেকে মুছে যাননি। কারণ, সেই সময়ে আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। এটা খুবই বিরল ঘটনা। অবশ্যই, দশ বছর আগেও, আমি মানুষের প্রতি কদাচিৎ কৃতজ্ঞ ছিলাম। এমনকি যখন প্রাপ্তবয়স্করা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করতো; আমি ভাবতাম এমন ব্যবহার করাটাই তাদের নিয়ম। সুতরাং আমি ভাবতাম তাদের বন্ধুত্ব খাঁটি নয়। হ্যাঁ, আমি আকর্ষণহীন এক শিশু ছিলাম। এরকম বাচ্চাদের বাড়ি ছেড়ে

পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। যখন আমার বয়স আট অথবা নয় ছিল; ঠিক কবে ভুলে গিয়েছি, আমার মায়ের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলাম। আমরা ঠিক কী নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম আমার এখন মনে নেই। নিশ্চিতভাবেই কোনো ফালতু বিষয়ই হবে।”

আমি বৃদ্ধা মহিলার পাশে বসে বেঞ্চের পেছনে হেলান দিয়ে, দূরের তোরণ এবং নীল আকাশের মেঘের দিকে তাকালাম।

“আগপিছু চিন্তা করিনি আমি। তো আমি ক্যান্ডির দোকানে গেলাম সময় কাটানোর জন্য। আমার বয়সের কোনো বাচ্চা, দিনের ওই সময়ে একা-একা বাইরে ঘোরাফেরা করার মতো সময় ছিল না এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তাই আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি বাসায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই?” বাবা-মায়ের সাথে বাকবিতণ্ডার পরে, আপনাকে উল্টাসিধা কিছু একটা বলেছিলাম। আপনি সেটা শুনে রেজিস্টারের পেছনের একটা দরজা খুলে দিয়ে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন। ভেতর থেকে কিছু ক্যান্ডি এবং চা নিয়ে এলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে, আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে একটা কল এলো আর যখন উনারা জিজ্ঞেস করলেন আমি ওখানে আছি কিনা। আপনি উত্তর দিয়েছিলেন “ও আছে, কিন্তু ধরে নিন আরও এক ঘণ্টার জন্য নেই” এবং ফোনটা রেখে দিলেন। হয়তো এই স্মৃতির কোনো অর্থ আপনার কাছে তেমন কিছুই মনে হবে না। কিন্তু আমার কাছে এই অভিজ্ঞতা বিশেষ অর্থ বহন করে; তার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।”

“আপনি কি আমার সাথে আরও কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে যেতে চান?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বৃদ্ধ মহিলা চোখ বন্ধ করল। মনে হচ্ছে অত্যধিকরকম শক্ত হয়ে গিয়েছেন উনি।

“আপনি যদি আমাকে ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনি হিমনোকেও ভুলে গিয়ে থাকবেন। আমি সবসময় ওর সাথেই দোকানে আসতাম। ওর নামের অর্থ বোঝানোর মতোই, ও ছিল রূপকথা থেকে উঠে আসা রাজকন্যা। আমি আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু ওর সৌন্দর্যের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যা এই শহরের সাথে ঠিক খাপ খায় না। আমি এবং হিমনো দুজনেই স্কুলে কুলাঙ্গার ছিলাম। আমাকে ঘৃণা করার কারণ ছিল সম্ভবত আমি উন্নাসিক ধরনের ছিলাম বলে। কিন্তু হিমনোকে ঘৃণা করতো কারণ, ও সবার থেকে ভিন্ন ছিল বলে। আমি জানি

এটা আমার পক্ষে উদ্ধত হয়ে যায়, কিন্তু আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ অনুভব না করে পারি না। কারণ, গ্রুপ থেকে বের হয়ে যাওয়ার ফলেই, হিমেনো এবং আমি একজোট হতে পেরেছিলাম। আমি তখন ভাবতাম শুধু হিমেনো পাশে থাকলে, আমি সকলের কাছ থেকে সকল অপবাদ সামলাতে পারবো। যেভাবেই হোক, ওরা আমার এবং হিমেনোর সাথে একই আচরণ করতো।”

প্রতিবার যখন আমি ‘হিমেনো’ বলি, বৃদ্ধ মহিলা খুব অল্প পরিমাণে প্রতিক্রিয়া দেখায়। এতে আনন্দিত হয়ে আমি কথা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

“ফোর্থ গ্রেডের গ্রীষ্মে হিমেনোকে স্কুল পরিবর্তন করতে হয়েছিল। কারণ, ওর বাবা-মা চাকরি পরিবর্তন করেছিল। সেটাই ওর ভাবমূর্তিকে আমার দৃষ্টিতে দেবতারোপ করার ট্রিগার হিসাবে কাজ করেছিল। ‘যদি বিশ বছরের মধ্যে আমরা কাউকে খুঁজে না পাই; তাহলে দু’জনে একসাথ হবো’ ওর এই কথাটাকে অবলম্বন করে আমি পুরো দশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি মাত্র সেদিন জানতে পারলাম, আমার প্রতি হিমেনোর একসময়ের অনুরাগ মারাত্মক ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। ও এমনকি আমার চোখের সামনে আত্মহত্যা করার পরিকল্পনাও করেছিল। এরপরে, আমার হঠাৎ মনে পড়ল হিমেনোর সাথে দেখা হওয়ার আগে, আমি টাইম ক্যাপসুল তুলতে গিয়েছিলাম। যেটা আমাদের পুরো ক্লাস চিঠি দিয়ে ভর্তি করে এলিমেন্টারি স্কুলের পিছনে পুঁতে রেখেছিল। আমি জানি আমার সত্যিই কাজটা করা উচিত হয়নি। কিন্তু কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি খুব দ্রুতই মারা যাবো। তাই আমি ভেবেছি আমার অন্তত এইটুকু করার অনুমতি পাওয়া উচিত।”

এখন।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিলে কেমন হয়।

“সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, হিমেনোর চিঠি ওখানে ছিল না। আমি ধরে নিয়েছিলাম সেদিন হিমেনো ক্লাসে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম, আমি যা ভাবছি সেটা সম্ভব নয়। চিঠিগুলো আমাদের শিক্ষিকা যথেষ্ট সময় নিয়ে আমাদের প্রস্তুত করতে দিয়েছিলেন। শিক্ষিকা এমন মানুষ ছিলেন না যে, কেউ একজন উপস্থিত ছিল না বলে তার চিঠি ছাড়াই টাইম ক্যাপসুল পুঁতে ফেলবেন। খুব সহজেই অনুমান করা যায়, আমার আগেই কেউ টাইম ক্যাপসুল খুলেছিল এবং হিমেনোর চিঠিটা সরিয়ে ফেলেছিল। যদি তাই ঘটে; হিমেনো ছাড়া আর কেউ কাজটা করতে পারে বলে আমার মনে হয় না।”

আমি আসলে এটা প্রথমে বুঝতে পারিনি।

এরপরেই, সবকিছু আমার মনে বানের জলে মতো ভেসে আসতে লাগল। “আমার যখন সতেরো বছর বয়স, আমি হিমেনোর কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। চিঠি বিশেষত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা ছিল না। আমি ছিলাম প্রাপক, আর হিমেনো হচ্ছে প্রেরক। এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। অন্যদের চিঠি দেওয়া কিংবা ফোন করার মতো মেয়ে ছিল না হিমেনো, ও যতই বন্ধুত্বপূর্ণ হোক না কেন। তো যে মুহূর্তে ওর কাছ থেকে চিঠি এসেছিল আমার বুঝা উচিত ছিল।”

হ্যাঁ।

আমার অনেক অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।

“সেই চিঠিটা ছিল হিমেনোর পক্ষ থেকে এক প্রকার সাহায্যের আবেদন। ও নিশ্চয় চিঠিটার মাধ্যমে আমার সাহায্য চেয়েছিল। অনেকটা আমার মতো যখন ও কোণঠাসা হয়ে পড়ল। ও অতীত আঁকড়ে ধরতে চাইল। তাই টাইম ক্যাপসুল খুঁড়ে বের করেছিল এবং তার একমাত্র ছোটবেলার বন্ধুর কথা মনে পড়ল। আর আমাকে চিঠি লিখল। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে, আমি সেই পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হইনি। আমি হিমেনোকে হারিয়েছি। ও ব্যর্থ হলো, এবং যে মুহূর্তে আমি সেটা বুঝতে পারলাম, আমিও ব্যর্থ হয়ে গেলাম। খুব শীঘ্রই হিমেনো আত্মহত্যা করবে, আর আমিও অল্প কিছুদিন পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বো। ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য এটা সঠিক সময় না। কিন্তু বিষণ্ণ গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনাকে এভাবে বসিয়ে রাখার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।”

চলে যাওয়ার জন্য আমি উঠে দাঁড়াতেই, বৃদ্ধ মহিলা বলে উঠলেন “বিদায়”। এমন কণ্ঠে যা ঠোঁট থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই বিলীন হয়ে গেল।

এই খাপছাড়া শব্দটাই একমাত্র কথা যা তিনি আমাকে বললেন।

“আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বিদায়।” ক্যান্ডির দোকানটা পিছনে ফেলে এসে, আমি উত্তর দিলাম।

অতীতের বন্ধুরা আমাকে ভুলে গিয়েছে বলে আমার খুব একটা কষ্ট হয়নি। স্মৃতির দ্বারা প্রতারণিত হতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমি।

একইসাথে, আমি সম্পূর্ণভাবে অন্য একটা সম্ভাবনা উপেক্ষা করে গিয়েছি। যে মেয়েটা সবসময় আমার পাশে আছে। আমার প্রতিটি হতাশার অভিজ্ঞতায় আমাকে সমর্থন যু-গয়ে যাচ্ছে।

যে মেয়েটা আমার মতো হতাশ, কিন্তু তবুও আয়ুষ্কালের বদলে সময় বিক্রি

করা বেছে নিয়েছে, যে কারণে ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

সে মেয়েটি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়েছি আমি।

“মি. কুসুনোকি? মি. কুসুনোকি”

আমি বাইক চালাচ্ছিলাম। মিয়াগি আমাকে পিছন থেকে খোঁচাতে লাগল। মিয়াগি বাইকে চড়ার সময় আমাকে জড়িয়ে ধরতে দ্বিধা করছে না আর

বাইকের গতি কমিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কী?”। যেন সে আমাকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ও বলল, “আপনাকে একটা কাজের কথা বলি।”

“আমার হঠাৎ মনে পড়ল। এই রাস্তা দিয়ে অনেক অনেক দিন আগে একবার এসেছিলাম। আমি পর্যবেক্ষক হওয়ার অনেকদিন আগে। যদি আপনি এই রাস্তা ধরে আরেকটু এগিয়ে যান, তারপরে ডান দিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে যান, আপনি তারা খচিত হৃদে উপস্থিতি হবেন।”

“তারা খচিত হৃদ?”

“যে হৃদের কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম। ওই যে মৃত্যুর আগে যে হৃদে ঘুরে আসতে চাই। আনুষ্ঠানিকভাবে সেটাকে কী নামে ডাকা হয় আমার জানা নাই।”

“ওহ। হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে।”

“এটা দারুণ না?”

“হ্যাঁ। ভালোই” আমি স্বীকার করে নিলাম। মেজাজটা কিছুটা হালকা করার চেষ্টা করলাম। “আমাদের নিশ্চয় যাওয়া উচিত।”

“আপনার বাইকে পর্যাপ্ত গ্যাস আছে নাকি?”

“কোনো এক জায়গা থেকে ভরে নিবো।”

পরবর্তী গ্যাস স্টেশন থেকে পুরো গ্যাস ভরে মিয়াগির নির্দেশনা অনুসারে চলতে লাগলাম।

ইতোমধ্যে মাঝরাত পার হয়ে গিয়েছে। আমরা পাহাড়ি রাস্তা ধরে চললাম। যখন প্রয়োজন ইঞ্জিন বন্ধ করলাম এবং ও যে হৃদটাকে তারা খচিত হৃদ নামে ডাকছিল প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে সেখানে পৌঁছালাম।

কাছের একটা কনভেনিয়েন্স স্টোর থেকে কাপ রামেন কিনে, বাইরের বেঞ্চে বসে সেটা খেলাম। কাবটা পার্কিং এরিয়াতে রেখে প্রায় অন্ধকার রাস্তা ধরে হেঁটে চললাম।

মিয়াগি যখন চারপাশের বিল্ডিংয়ের দিকে কোমলভাবে তাকাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে ও আমাকে বারবার সতর্ক করে দিয়ে বলল, “আপনার এখনই তাকানো উচিত না।” দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে আমি সত্যিই দারুণ তারকাখচিত রাত দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু মিয়াগির কথামতো মাথা নিচু করে রাখলাম।

“আমি যা বলি মন দিয়ে শুনুন।” মিয়াগি বলল। “আমি আপনাকে পথ দেখাবো। আমি চাই আমি বলার আগ পর্যন্ত আপনি চোখ বন্ধ রাখবেন।”

“তুমি একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে আমাকে দেখতে দিতে চাও না?”

“হ্যাঁ। এত কষ্টের পরে, আপনি কী চান না তারাগুলো একদম সঠিক অবস্থায় দেখতে, মি. কুসুনোকি? এখন চোখ বন্ধ করুন।”

আমি চোখ বন্ধ করলাম। মিয়াগি আমার হাত ধরে ধীরে-ধীরে “এই দিকে” বলে পথ দেখাতে লাগল। চোখ বন্ধ করে হাঁটার ফলে আমি এমন সব শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম যা আগে কখনো শুনিনি।

আগে মনে করতাম গ্রীষ্মে ডাকা পোকাগুলোর সবগুলোর আওয়াজ একই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি চারটা ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের আওয়াজ আলাদা করতে পারলাম। নিচু স্বরে গুনগুন করা পোকা, তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকা পোকা, পাখির মতো ডাকা পোকা, কানে তালা লেগে যাওয়া ব্যাঙের ডাকের মতো পোকা।

মৃদুমন্দ বাতাস এবং ক্ষীণ ঢেউয়ের শব্দও শুনতে পাচ্ছি আমি। এমনকি মিয়াগির পায়ের শব্দ থেকে আমার পায়ের শব্দও আলাদা করতে পারছি।

“মি. কুসুনোকি, বলুন তো। আমি যদি আপনাকে ধোঁকা দিই এবং ভয়ানক কোনো জায়গায় নিয়ে যাই আপনি কী করবেন?”

“ভয়ানক, কীভাবে?”

“ভ্রম... যেমন ধরুন ক্লিফ অথবা কোনো ব্রিজ। এমন কোনো জায়গা যেখান থেকে আপনার পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।”

“আমি এটা চিন্তা করিনি এবং করবোও না।”

“কেন?”

“তোমার এরকম কিছু করার কোনো কারণ দেখছি না।”

“তাই নাকি” মিয়াগি বলল। বিরক্ত মনে হচ্ছে ওকে।

পায়ের তলায় পিচ-ঢালা রাস্তার কোনো অস্তিত্ব পেলাম না, বালুর ও না। তারপরে হঠাৎ কাঠের অস্তিত্ব পেলাম। আমার ধারণা আমরা কাঠের জেটিতে পৌঁছেছি।

“দাঁড়ান, চোখ বন্ধ রাখুন।” মিয়াগি বলল আমার হাত ছেড়ে দিয়ে। “সাবধানে পা ফেলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। তারপরে আপনি চোখ খুলতে পারবেন।”

আমি নিচু হয়ে সবধানে পিঠটা মেঝেতে ছোঁয়ালাম। একটা গভীর দম নিয়ে চোখ খুললাম।

আমার জানা “আকাশভরা তারা”র যে সংজ্ঞা আমি জানতাম; সেটার সাথে এই দৃশ্যের মিল নেই।

হয়তো এভাবে বললে ভালো হয়; সেদিন প্রথমবারের মতো আমি জানতে পারলাম তারা দেখতে কেমন হয়।

বই এবং টিভিতে আমি তারা “দেখেছিলাম”। আমি এমন একটা আকাশকে চিনি যেখানে আমার ট্রায়াজাল আছে, যার মধ্যে দিয়ে মিল্কিওয়ে বিচরণ করে। যা কিনা অসীমের মধ্যে এক বিন্দুর মতো।

কিন্তু সেসব লাইনের রেফারেন্স দিয়ে, এমনকি রং এবং আকৃতি দেখেও, আমি সত্যিই সেটার আকার কল্পনা করতে পারিনি।

আমার চোখের সামনের দৃশ্যটা আমি যা কল্পনা করেছিলাম, এরচেয়েও অনেক অনেক বড়।

আমার পাশে থাকা মিয়াগিকে বললাম, “আমার মনে হচ্ছে আমি এখন বুঝতে পেরেছি কেন তুমি মৃত্যুর আগে আবারো এটা দেখতে চেয়েছিলে।”

“সত্যি নাকি?” ও বলল আত্মতুষ্টি নিয়ে।

জেটির উপর শুয়ে থেকে অনেকক্ষণ ধরে তারার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

আমরা তিনটা তারাকে খসে পড়তে দেখলাম। আমি ভাবছিলাম পরবর্তী তারাটা খসে পড়তে দেখলে কী চাইবো।

সে মুহূর্তে আমার আয়ুষ্কাল ফিরে পাওয়ার কোনো চিন্তা মাথায় ভর করেনি। আমি হিমেনোর সাথে দেখা করতে চাই না। সময়কে পেছনে ফেরত নিতেও চাই না। নতুন করে সবকিছু শুরু করার মতো শক্তি ছিল না আমার।

আমি শুধু এখানে শান্তিতে মরতে চাই। ঠিক ঘুমিয়ে যাওয়ার মতো করে। এটাই আমার চাওয়া। এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়ার মানে হবে আমার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে থেকে খুব বেশি কিছু চেয়ে ফেলা।

মিয়াগি কী চাইতে পারে এ-নিয়ে এমনকি চিন্তাও করার প্রয়োজন ছিল না।

পর্যবেক্ষকের চাকরি ছেড়ে দেওয়াই ছিল ওর ইচ্ছা। যাতে ওকে আর অদৃশ্য হিসাবে না থাকতে হয়।

ও যাদের পর্যবেক্ষণ করে তারা ছাড়া বাকি সবাই ওর অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে। এক বছরের মধ্যে আমি ওর নিশ্চিত মৃত্যু দেখতে পারছি। যতটুকু সহনশীলতা মিয়াগি দেখিয়েছে তার মানে এই নয় ও আগামী ত্রিশ বছর এভাবে চালিয়ে যেতে পারবে।

“মিয়াগি” আমি বললাম, “তুমি আমার খাতিরে মিথ্যা বলেছিলে, তাই না? যেমন ধরো হিমেনো আমাকে কদাচিৎ মনে রেখেছে।

মিয়াগি শুয়ে থেকেই আমার দিকে ফিরল। জবাব দেওয়ার বদলে বলল, “আমারও একজন ছোটবেলার বন্ধু ছিল।”

আমি মনে করার চেষ্টা করে বললাম, “কে ‘তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ’ সেই লোকটা? যার কথা তুমি একবার বলেছিলে?”

“হ্যাঁ। আপনার মনে আছে দেখি।”

আমি চুপ করে রইলাম। মিয়াগি বলতে শুরু করল।

“এক সময় আমার জীবনে এমন একজন ছিল ঠিক মিস. হিমেনো আপনার কাছে যেরকম। আমরা বাস্তব জগতে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হতে পারিনি। তাই আমরা দু’জন দু’জনের উপর ভরসা করতাম। আমাদের নিজস্ব জগতে পারস্পারিক নির্ভরতার উপরে বাস করতাম। পর্যবেক্ষক হওয়ার প্রথমদিনে যে কাজটা করলাম তা হলো, ওকে দেখতে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম আমার অন্তর্ধান নিয়ে ও বেশ দুঃখ পাবে। ও নিজেকে ওর খোলসে আবৃত করে ফেলবে, আর আমার ফিরে আসার অপেক্ষা করবে। এই নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। যাহোক, আমাকে ছাড়া কয়েক সপ্তাহ যাওয়ার পরে, ও খুব দ্রুত আমি-বিহীন জগতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলো। না, তাও না। আমি গায়েব হয়ে যাওয়ার অল্প কয়েক মাস পরেই, যারা আমাদের ‘ভিনু’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের জগতে মিশে গেল।”

মিয়াগি আবারো আকাশের দিকে তাকাল, ওর ঠোঁটে একটা উষ্ণ হাসি দেখা গেল।

“সেই সময় আমি বুঝতে পারলাম। ওর কাছে, আমি ছিলাম ক্ষুদ্র বেড়ি। সত্যি বলতে, আমি ওকে অসুখী দেখতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম ও দুঃখ পাক, হতাশ হোক, এবং ওর খোলসে বন্দি হয়ে থাক। আমার ফিরে আসার

অপেক্ষা করুক। যা আদতে কখনই সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও কোনোমতে শ্বাস
নিক। ও সুখী কিংবা দুঃখী যাই হোক না কেন, এটা শুধু আমাকে বিষণ্ণ ই
করবে।”

“মৃত্যুর আগে তুমি কি শেষ পর্যন্ত ওর সাথে দেখা করতে চাও?”

“হ্যাঁ, কারণ আমি আর কোনো কিছু সম্পর্কে জানি না। শেষ পর্যন্ত, একমাত্র
এটাকেই আঁকড়ে ধরতে পারি।”

মিয়াগি উঠে হাঁটু উঁচু করে বসল। “তাই আপনি কেমন অনুভব করছেন
আমি অনেকটা বুঝতে পারছি। যদিও আপনি চান না আমি তা বুঝি।”

“নাহ” আমি বললাম। “বোঝার জন্য ধন্যবাদ।”

“ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই” মিয়াগি চাপা হেসে বলল।

আমরা আশপাশের ভেড়িং মেশিনের ছবি তুলে, বাসায় ফিরে এলাম।

“যেহেতু আজকে খুব ক্লান্ত তাই শুধুমাত্র আজকের জন্য” এই অযুহাতে
মিয়াগি আমার বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। যখন আমি মিয়াগির দিকে গোপনে এক
পলক তাকালাম, দেখা গেল সে-ও একই কাজ করছে। আমরা দ্রুত চোখ সরিয়ে
নিলাম এবং দুজন দুজনের দিকে পিঠ গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি খসে পরা তারার দিকে তাকিয়ে অন্তত এইটুকু ইচ্ছা প্রকাশ করতে
পারতাম; যেন সবকিছু এভাবেই চলে।

পরেরদিন যখন আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি মিয়াগি চলে গিয়েছে। শুধু ওর
নোটবুকটা বিছানার পাশে রাখা।

চ্যাপ্টার ১২ : অ্যা লায়ার অ্যান্ড অ্যা লিটল প্রেয়ার

মিয়াগি যখন পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রথম আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল, আমি ওর চাহনী দেখে বিচলিত হয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল “যদি আমার পর্যবেক্ষক ঠিক ওর বিপরীত হতো; কুৎসিত, নোংরা এবং মধ্যবয়সী কেউ তবে আমি নিশ্চিত, আমি আরও বেশি আয়েশ করতে পারতাম এবং যা করার দরকার ঠিক সেটাই করতে পারতাম।”

মিয়াগির বদলে আমার সামনে যে পর্যবেক্ষক দাঁড়িয়ে আছে তিনি বলতে গেলে সেরকমই।

লোকটি খাটো, মাথায় টাক, মুখটা লাল আর তেলতেলে; যেন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রয়েছে। লোকটি ঘনঘন চোখ পিটপিট করে। শ্বাস নিতে গেলে হেসাধ্বনি করে। কথা বলতে মনে হয় গলায় গ্লোম্বা জমে রয়েছে।

“মিয়াগি কোথায়?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“ছুটিতে গিয়েছে” লোকটি স্পষ্টভাবে বলল। “আমি আজকে আর আগামীকাল ওর জায়গায় ডিউটি করবো।”

বুকের উপর হাত রাখে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পর্যবেক্ষকরা শিফট অনুযায়ী কাজ করে না; সেজন্য কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম। দুই দিন পরেই মিয়াগি চলে আসবে।

“তাহলে পর্যবেক্ষকরাও ছুটি নেয়” আমি বললাম।

“অবশ্যই নিতে হয়। আপনার মতো তো না। আমাদের অনেক বছর বাঁচতে হবে” লোকটি ব্যঙ্গাত্মক স্বরে উত্তর দিলো।

“হুহ, যাক, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দুদিন পরে ওর ছুটি শেষ হবে। আর সবকিছু আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে?”

“হ্যাঁ, এটাই যন্ত্রণা” লোকটি বলল।

আমি ঘুমাকাতুরে চোখ ডলে কর্ণারের লোকটির দিকে আবারো তাকালাম। লোকটি আমার অ্যালবাম হাতে ধরে আছে। আমার ভেড়িং মেশিনের ছবির সকল

অ্যালবাম।

“কী বালের জিনিস এগুলো?” লোকটি জিজ্ঞেস করল।

“আপনি কি ভেন্ডিং মেশিন সম্পর্কে জানেন না?” আমি রসিকতা করে বললাম।

“খ্যাত। আমি বলতে চাচ্ছি ছবিগুলো কেন তুলেছেন?”

“একই কারণে, যে কারণে যারা আকাশ পছন্দ করে বলে আকাশের ছবি তোলে। যারা ফুল পছন্দ করে বলে ফুলের ছবি তোলে। ট্রেন পছন্দ করে বলে যারা ট্রেনের ছবি তোলে। আর আমি ভেন্ডিং মেশিন পছন্দ করি।”

লোকটি বিরক্তি নিয়ে কয়েক পাতা উল্টালো। তারপরে “আবজানা” ঘোষণা করে অ্যালবাম আমার দিকে ছুড়ে দিলো।

তারপরে সে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা পেপার ক্রেইনে দিকে তাকিয়ে নাক সিটকালো।

“এভাবেই আপনি দিন কাটাচ্ছেন, অ্যাঁহ। বেকুব কোথাকার। এর চেয়ে ভালো কিছু করার মতো পাননি।”

লোকটার আচরণ মোটেই আমার কাছে বিরক্তিকর লাগল না। সত্যি বলতে গেলে আমি যা ভেবেছিলাম, লোকটার সাথে কাজ করা বেশ সহজ ছিল। কোণা থেকে একটা বস্তুর মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেউ, এটাকেই আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

“হয়তো পেতাম। কিন্তু আমি যদি এর চেয়ে মজার কিছু করতাম, আমার শরীর হয়তো সেটা নিতে পারতো না” আমি হেসে বললাম।

একইভাবে লোকটা সব কিছুতে খুঁত ধরার চেষ্টা করল। আমি ভাবতে লাগলাম, এই পর্যবেক্ষকটা বেশি আক্রমণাত্মক।

লাঞ্চেটের পরে যখন ফ্যানের নিচে শুয়ে মিউজিক শুনছিলাম, তখন জানতে পারলাম কেন লোকটা এতটা আক্রমণাত্মক।।

“এই যে, আপনাকেই বলছি” লোকটি বলল, আমি উনার কথা না শোনার ভান করলাম। লোকটি গলা পরিষ্কার করে বলল, “আপনি ওই মেয়েটাকে কোনো কষ্ট দিচ্ছেন নাতো?”

“ওই মেয়েটা” বলতে কাকে বোঝাচ্ছে হিসাব করে দেখলাম তা একজনের দিকেই ইঙ্গিত করে। মিয়াগি সম্পর্কে এভাবে কথা বলবে সেটা আমি লোকটার কাছে আশা করিনি। তাই দেরিতে উত্তর দিলাম।

“সেই মেয়েটা বলতে, আপনি মিয়াগিকে বোঝাচ্ছেন?”

“আর কে?” লোকটি ভূ কুঁচকালো যেন ওর নাম নেওয়াতে নাখোশ হয়েছে। সেটা বুঝতে পেরে, লোকটার প্রতি কিছুটা কোমল হলাম। তাহলে আপনি আমার মিত্র।

“ধরে নিচ্ছি, আপনার সাথে মিয়াগির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“...না। সেরকম কিছু না। আমাদের খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।” লোকটার গলা হঠাৎ স্তিমিত হয়ে এলো। “কাগজপত্রের মাধ্যমে শুধুমাত্র অল্প কয়েকবার কথা হয়েছিল, শুধু এইটুকুই। ওর সময় কেনা মানুষটা হচ্ছে আমি, তো সেজন্য অনেক অনেক দিন আগে, ওর সাথে দশ মিনিট কথা হয়েছিল। তখন দেখেছিলাম।”

“তো কী মনে হয়েছিল ওকে দেখে?”

“দুর্ভাগা মেয়ে” লোকটি বলল। “সত্যিই, ওর জন্য করুণা হয়।”

লোকটা মনে হলো সত্যি সেটা বুঝিয়েছে।

“আমার আয়ুষ্কাল ওর আয়ুষ্কালকালের সমমূল্যের। বেচারি, তাই না?”

“চুপ করুন। আপনি এমনিতেই কয়েকদিন পরে মরে যাবেন।”

“সবকিছু সঠিকভাবে দেখার এটাই সম্ভবত সঠিক উপায়।” আমি সম্মত হয়ে বললাম।

“কিন্তু মেয়েটা, ও এমন জিনিস বিক্রি করেছে যা বিক্রি করা ঠিক হয়নি। ওর বয়স তখন মাত্র দশ বছর ছিল। ওটুকু মেয়ের কাছ থেকে যুক্তিসঙ্গত সমাধানের আশা করাও যায় না। আর এখন বেচারি মেয়েটাকে আপনার মতো মরিয়া লোকজনের সাথে থাকতে হবে।”

“যাহোক, আগের কথাই ফিরে যাই। আপনি ওকে কোনো প্রকার কষ্ট দিচ্ছেন নাতো? আমার প্রশ্নের উত্তরের উপর ভিত্তি করে আপনার জীবনের শেষ কয়েকটা মাস; অনেক আরামদায়ক হতে পারে আবার নরকের আগুনের মতো জ্বলতে পারে।”

আমি ধীরে-ধীরে লোকটাকে আরও বেশি পছন্দ করে বসেছি।

“আমার মনে হয় আমি ওকে বেশ কষ্ট দিয়েছি” আমি সত্যি কথাই বললাম।

“আমি ওকে এমন কথা বলেছি যেন ও কষ্ট পায়। প্রায় বলতে গেলে শারীরিক আঘাতের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। তারও কিছুটা আগে আমি প্রায় ওকে

ধর্ষণও করে ফেলেছিলাম।”

লোকটার মুখের ভাবভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে গেল। যখন মনে হচ্ছিল লোকটা যে কোনো মুহূর্তে আমার টুটি চেপে ধরবে; আমি মিয়াগির নোটবুকটা উনার দিকে ছুড়ে দিলাম।

“এটা কী?” লোকটি জিজ্ঞেস করল, নোটবুকটা তুলে নিয়ে।

“ওখানেই আপনার সবকিছু বিস্তারিত পেয়ে যাওয়ার কথা। এটা মিয়াগির পর্যবেক্ষণ লগ। যাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে; সে নিশ্চয় এটা পড়তে পারবে না, তাই না?”

“পর্যবেক্ষণ লগ?” লোকটি থুতু দিয়ে আঙ্গুল ভিজিয়ে নোটবুকটা খুলল।

“আপনাদের চাকরির হিসাব-নিকাশ কিভাবে হয় আমি জানি না। আর আমার মনে হয় না আপনাদের নিয়ম-কানুন খুব কড়া। কিন্তু হতে পারে এটা ফেলে দাওয়ার দরুন মিয়াগির শাস্তি হতে পারে। আমি আসলে সেটা চাচ্ছি না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ওর পক্ষে আছেন। তাই আপনাকে দিলাম।”

লোকটি পাতা উল্টিয়ে যেতে লাগল। দুই মিনিটের মধ্যে তিনি শেষ পাতায় পৌঁছে গেলেন। আর তার পরে মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দই বললেন, “ওহ হো।”

ওখানে কী ছিল আমার জানা নেই। কিন্তু এরপর থেকে, লোকটাকে তুলনামূলক কম আক্রমনাত্মক মনে হলো।

মিয়াগি নিশ্চয় আমার সম্পর্কে ভালো কথাই লিখেছে। পরোক্ষ প্রমাণ পেয়ে আমি খুশিই হলাম।

আমার যদি সেই মুহূর্তে নোটবুক কেনার আইডিয়া মাথায় না আসতো, আমি এখন এই লেখাটা লেখতাম না।

লোকটাকে মিয়াগির নোটবুক দেখানোর পরে, আমার নিজের একটা নোটবুক থাকার খায়েশ হলো। আমি স্টেশনারী দোকানে গিয়ে সুবামে বি-৫ নোটবুক কিনলাম। সাথে একটা সস্তা ফাউন্টেনপেন। তার পরে চিন্তা করতে লাগলাম কী লেখা যায়।

আমি জানি এই বিকল্প পর্যবেক্ষক থাকার এই দুই দিনই আমার জন্য সুযোগ। মিয়াগি সাথে থাকা অবস্থায় যা করতে পারি না; সেটা করার এখনই সময়।

প্রথম দিকে আমি বিকৃতরুচির কিছু নিয়ে ভেবেছিলাম। কিন্তু মিয়াগির সাথে পরবর্তীতে দেখা হলে এমনকি আমি যদি ধরা নাও খাই, নিজেকে অপরাধীই

মনে হবে। মিয়াগিকে দেখাতে চাই না এমন কিছুই করলাম আমি। কিন্তু আরও ভালো উপায়ে।

পুরাতন বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠা থেকে কিভাবে চারতলায় আমার আয়ুষ্কাল বিক্রি করে দিয়ে এসেছিলাম, সেটা থেকে বর্তমান পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সব লিখে রাখলাম।

প্রথম পাতায় স্কুলের শেখা নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে লিখলাম। চিন্তা না করেই আমি জানি পরবর্তী পাতায় আমার কী লেখা উচিত।

প্রথম দিন জীবনের মূল্য সম্পর্কে আমি কি ভাবতাম। একদিন বিখ্যাত কেউ হবো সে-সময়ের আমার সেই বিশ্বাস। হিমেনোর সাথে আমার প্রতিজ্ঞা। বইয়ের এবং সিডির দোকানে আয়ুষ্কালের ব্যবসা সম্পর্কে জানা। সেখানে মিয়াগির সাথে দেখা হওয়া।

শব্দগুলো এক নাগাড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। ধূমপান করতে গিয়ে, খালি ক্যানকে অ্যাশট্রে বানালাম। আর গল্পের মোড় ঘুরাতে লাগলাম।

ফাউন্টেনপেন কাগজের উপরে বেশ আরামদায়ক শব্দ করতে লাগল। ঘরে প্রচুর গরম, গরমে ঘাম চুইয়ে পড়ে অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে উঠল।

“কী লিখছেন আপনি?” লোকটি জিজ্ঞেস করল।

“এই মাসে যা যা ঘটেছে সব লিখে রাখছি।”

“মানে কী? কে পড়বে এটা?”

“জানি না। তাতে কিছু যায় আসে না। লেখালেখি আমাকে সবকিছু ঠিকঠাক করতে সাহায্য করে। সবকিছু আমি যৌক্তিকভাবে চিন্তা করতে পারি।”

এমনকি গভীর রাতেও, আমার হাত চলতে লাগল। এটা সুন্দরতম গদ্য হলো না। কিন্তু কী রকম সহজে লিখতে পারছি দেখে আমি নিজেও বিস্মিত হয়ে গেলাম।

ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে, অবশেষে আমি হঠাৎ করে থামলাম। আজকে আর এরচেয়ে বেশি লিখতে পারবো বলে আমার মনে হয় না।

ফাউন্টেনপেন টেবিলে রেখে কিছুটা তাজা বাতাসের জন্য বাইরে গেলাম আমি। লোকটি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে আমার পেছন-পেছন আসতে লাগল।

বাইরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে, আমি কোথায় জানি তাইকো ড্রামের আওয়াজ শুনলাম। সম্ভবত কোনো ফেস্টিভ্যালের জন্য অনুশীলন করছে।

“যেহেতু আপনি একজন পর্যবেক্ষক, আপনিও আপনার সময় বিক্রি করেছেন?” আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

“আমি যদি হ্যাঁ বলি, আপনি কি আমার প্রতি সহানুভূতিও দেখাবেন নাকি?” লোকটি হেসে ধ্বনি করে হাসল।

“হ্যাঁ। দেখাবো।”

লোকটি আমার দিকে অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকাল। “আসলে, পারলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতাম। কিন্তু সত্যি বলতে আমি কোনো আয়ুষ্কাল, কোনো সময়, কোনো স্বাস্থ্য বিক্রি করিনি। আমি চাকরিটা করছি কারণ, ‘আমি কাজটা করতে চাচ্ছি তাই।’

“বাজে অভিজ্ঞতাই বলতে হবে। এতে মজার কী আছে?”

“খুব মজার কিছু তা বলবো না। এটা অনেকটা মানুষের কবর ভ্রমণ করার মতো। আমিও কোনো একদিন মারা যাবো। যতদিন পারি আরও বেশি মৃত্যু দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিতে চাই।”

“একেবারে বুড়ো লোকজনের ধ্যান-ধারণা।”

“হ্যাঁ, কারণ, আমি বুড়ো।” লোকটি বলল।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আমি গোসল করলাম। বিয়ার খেললাম, দাঁত মাজলাম, তার পরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আবারো পাশের ঘরে থেকে আওয়াজ আসতে লাগল। তিন কিংবা চারজন লোক জানালা খুলে কথা বলছে।

মনে হচ্ছে ওখানে রাত-দিন সবসময় অতিথি থাকে। আমার রুমের সাথে তুলনা করতে গেলে যা বিশাল পার্থক্য গড়ে দিবে; যেখানে আমার রুমে আছে শুধু পর্যবেক্ষক।

আমি হেডফোনের মতো দেখতে কানবন্ধনী পরলাম। বাতি নিভিয়ে বন্ধ করলাম চোখ।

হয়তো আমার মস্তিষ্কে ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ, ওটা সাধারণত আমি ব্যবহার করি না। একবারের জন্যও না জেগে, আমি পাক্কা এগারো ঘণ্টা ঘুমালাম।

পরেরদিনও আমি নোটবুক লিখে কাটলাম। রেডিয়োতে বেসবল নিয়ে কথা হচ্ছিল। সন্ধ্যার মধ্যে আমি বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে এলাম।

হাত থেকে কলম খসে পড়তেই আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। কবজি এবং হাতের মাসল ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। মাথা ব্যথা করতে লাগল আমার। ঘাড়ের

ব্যথায়ুক্ত স্থানে ডলতে লাগলাম।

তবুও কোনো কিছু সম্পন্ন করার অনুভূতি অতটা খারাপ লাগল না। সেই সাথে, স্মৃতিগুলো শব্দের মাধ্যমে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়াতে স্মৃতিগুলো জমা করতে সুবিধা হবে, আর খারাপ স্মৃতিগুলো মেনে নেওয়া সহজ হবে।

আমি সেখানেই শুয়ে পড়লাম। তার পরে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটা বড় কালো দাগ দেখতে পেলাম, জানিনা সেটা কিভাবে ওখানে এলো। একটা পেরেক দেয়াল থেকে বেরিয়ে আছে। এমনকি কর্ণারে মাকড়সার জালও দেখা গেল।

স্থানীয় মাঠে মিডেল স্কুলের একটা বেসবল খেলা দেখার পরে, মার্কেটের একটা মেলা ঘুরে দেখে, একটা ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে লেফট-ওভারিস ডিনার খেললাম।

ভাবতে লাগলাম, মিয়াগি আগামীকাল ফিরে আসবে।

আমি তাড়াতাড়ি বিছানায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। খোলা নোটবুকটা বন্ধ করে বুকসেলফে রেখে বিছানায় গিয়ে উঠলাম।

তখন বদলি পর্যবেক্ষক কথা বলে উঠল।

“এটা আমি প্রায় সবাইকেই জিজ্ঞেস করি, যে টাকা পেয়েছেন সেটা দিয়ে কী করেছেন?”

“পর্যবেক্ষণ লগে বলা নেই?”

“বিস্তারিত পড়িনি”

“রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতে হাতে সবাইকে বিলি করে দিয়েছি” আমি উত্তর দিলাম। “জীবনযাপনের জন্য কিছুটা ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নির্দিষ্ট একজনকে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু সে পালিয়ে গিয়েছে, তাই সিদ্ধান্ত নিলাম অপরিচিত লোকজনকে বিলিয়ে দিবো।”

“হাতে হাতে?”

“হ্যাঁ। হেঁটে হেঁটে ১০,০০০ ইয়েনের বিল বিলিয়েছি।”

লোকটি অটহাসিতে ফেটে পড়ল।

“মজার, তাই না?” আমি বললাম। কিন্তু লোকটি মৃদু হেসে উত্তর দিলো, “না। আমি একারণে হাসিনি।”

হাসিটা ছিল অদ্ভুত। মনে হচ্ছে না লোকটি মজা পেয়ে হাসছে।

“আসলেই আপনি আয়ুষ্কাল বিক্রির সম্পূর্ণ টাকা অচেনা মানুষজনকে মুফতে

বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন?”

“তাই করেছি আমি।” আমি বললাম।

“আপনার মতো গাধাকে নিয়ে কোনো আশা নেই।”

“ঠিক। এরচেয়ে অনেক অনেক ভালো উপায় ছিল টাকাটা ব্যবহার করার।
৩০০,০০০ ইয়েন দিয়ে অনেক কিছুই করা যেত।”

“না। একারণেও আমি আপনার সাথে মজা নিচ্ছি না।”

লোকটির কথার মাঝে কিছু একটা ছিল।

তার পরে অবশেষে সে বলল।

“আপনি সত্যি সত্যি বলুন তো, আপনি সত্যিই ভেবেছিলেন আপনার
আয়ুষ্কালের মূল্য ৩০০,০০ ইয়েন?”

প্রশ্নটা আমাকে একদম ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিলো।

“কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?”

“আর কী বলবো? আমি যা বলেছি সেটাই বুঝাচ্ছি। আপনাকে কি সত্যিই
বলা হয়েছিল আপনার আয়ুষ্কালের দাম ৩০০,০০০ ইয়েন? আর আপনি, অ্যা,
অ্যা, হাহ। একদম ঠিক, পুরো ৩০০,০০০ ইয়েন নিয়ে নিলেন?”

“হুহ... হ্যাঁ। প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম খুব কম।”

লোকটা হাসতে-হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

“ঠিক, ঠিক, আসলে, আমি কিছুই বলতে চাই না, কিন্তু...” লোকটি পেট
ধরে, এখনো হাসতে লাগল।

“পরেরবার মেয়েটার সাথে দেখা হলে, ওকে জিজ্ঞেস করবেন। আপনার
আয়ুষ্কাল কী সত্যিই ৩০০,০০০ ইয়েন নাকি?”

আমি লোকটাকে আরও প্রশ্ন করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু লোকটি দেখা গেল
আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আগ্রহী না।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ঘরে ঘুমাতে না পেরে, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম
আমি।

লোকটার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করতে লাগলাম।

“শুভ সকাল, মি. কুসুনোকি।”

জানালা দিয়ে আসা সূর্যের আলোতে আমার ঘুম ভেঙে যেতেই মিয়াগি বলে
উঠল।

রুমের কোণা থেকে আমাকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দেওয়া মেয়েটা আমার সাথে

মিথ্যা বলেছে।

“আজকের দিন কিভাবে কাটাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?”

মুখ থেকে কথা বের হতে গিয়েও কথাগুলো গিলে ফেললাম আমি। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি এমন ভান করবো যেন কিছুই জানি না। আমি জানি সত্যটা মিয়াগিকে বিপদে ফেলে দিবে।

“যেভাবে সাধারণত কাটাই” আমি উত্তর দিলাম।

“ধরে নিচ্ছি ভেন্ডিং মেশিন ট্যুর দিয়ে” মিয়াগি খুশি-খুশিভাবে বলল।

আমরা বলতে গেলে সর্বত্র ঘুরে বেড়ালাম। নীল আকাশের নিচে, ধান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে, আঁকাবাঁকা গ্রামীণ পথ দিয়ে।

আমরা রাস্তার পাশের একটা স্টেশন থেকে সল্ট-ব্রয়েল্ট কার এবং সফট-সার্ড আইসক্রিম খেলাম। তার পরে দরজাওয়ালা অনেকগুলো বিল্ডিং এবং অনেকগুলো ভেন্ডিং মেশিন-সহ, একইসাথে জনমানবহীন একটা অদ্ভুত রাস্তায় ছবি তুললাম।

চোখের পলকে রাত নেমে এলো।

আমরা একটা ছোট বাঁধের সামনে কার থামালাম। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে একটা হাঁটা-পথে উঠে এলাম।

“আপনি কোথায় যাচ্ছেন?”

আমি হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম, “যদি আমি তোমার সাথে প্রতারণা করে ভয়ানক কোথাও নিয়ে যাই, কী করবে তুমি?”

“মানে আপনি এমন কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন সেখান থেকে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়?” মিয়াগি বুঝদারের মতো বলল।

“তুমি ভুল বুঝেছ” আমি বললাম। কিন্তু ও যা বলেছে আসলে সেটাই সত্যি।

একবার যখন আমরা ছোট একটা ব্রিজ পার হলাম, নদীর পাশ-ঘেঁষে একটা ছোট ঝোপ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। ও আমার উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে।

মনে হচ্ছে, ও দৃশ্যটা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছে।

“প্রশ্নটা শুনে মনে হতে পারে মূল বিষয়টা এড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু জোনাকি পোকা সত্যি আলো বিলায়, তাই না।”

“হ্যাঁ, এগুলো জোনাকি” আমি হাসলাম, কিন্তু ও কী বলতে চাইছে সেটা ধরতে পেরেছি। মিয়াগি সম্ভবত একইরকম অনুভব করছে যেমনটা আমি হৃদের

পাড়ে অনুভব করেছিলাম।

আমরা জানি এরকম জিনিসের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত সেটার সৌন্দর্য যে অন্য কিছু থেকে বেশি হতে পারে সেটা জানা যায় না।

আমরা সরু পথটা দিয়ে আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগলাম। অসংখ্য সবুজ জোনাকি আশপাশে জ্বলছে আর নিভছে।

এগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে যে কারো দৃষ্টি সরে যাবে এবং কিছুটা মাথা ঘুরাবে।

“এই প্রথমবার আমি জোনাকি পোকা দেখলাম।” মিয়াগি বলল।

“ইদানীং এগুলো খুব কম দেখা যায়। সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় না গেলে এগুলোর দেখা পাওয়া কঠিন। পরেরবার এলে আমিও হয়তো আবার এগুলো দেখা পাবো না।”

“আপনি কি এখানে প্রায়ই আসেন নাকি, মি. কুসুনোকি?”

“না। আমি শুধু একবার মাত্র এসেছিলাম, গত বছর এসময়ে। মাত্রই গতকাল মনে পড়ল।”

জোনাকির আলোর বিচ্ছুরণ একদম চরম পর্যায়ে চলে এসেছে। আমরা যে পথে গিয়েছিলাম সে পথেই ফিরে আসলাম।

“...আমি কি এটাকে সেদিনের হৃদ দেখানোর পরিবর্তে ধন্যবাদস্বরূপ ভেবে নিবো?” মিয়াগি জিজ্ঞেস করল।

“আমি সেদিন গিয়েছিলাম কারণ, আমি নিজেই দেখতে চেয়েছিলাম। তবে তুমি যা খুশি ভেবে নিতে পারো।”

“বুঝেছি। আমি আমার ইচ্ছেমতো ভেবে নিবো।”

“আমাকে ছোটখাটো বিষয় বলতে হবে না।”

সেদিনের মতো ছবি তোলা শেষ করে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেলাম।

বিছানায় যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম আমি। মিয়াগির “শুভ রাত্রি”র প্রতিউত্তর দিলাম। ঠিক বাতি নিভানোর আগে, আমি ওর নাম ধরে ডাকলাম।

“মিয়াগি।”

“হ্যাঁ? কী হয়েছে?”

“তুমি কেন মিথ্যা বলেছ?”

মিয়াগি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

“আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।”

“আরেকটু সহজ করে দিই। আমার আয়ুষ্কালের দাম কি সত্যিই ৩০০,০০০ ইয়েন?”

সে চাঁদনী রাতে, আমি মিয়াগির চোখের রং পরিবর্তন হতে দেখলাম। “অবশ্যই” ও উত্তর দিলো। “অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আপনার দাম খুব বেশি হয়নি। আমি ভেবেছিলাম আপনি অনেক আগেই আপনার ভাগ্য মেনে নিয়েছেন।”

“আসলে, আমি মেনে নিয়েছিলাম। গতকাল রাতের আগ পর্যন্ত।” আমি বললাম।

মিয়াগি মনে হচ্ছে বুঝতে পেরেছে আমি কী ধারণা করছি।

“আমার বিকল্প যে এসেছিল উনি কি কিছু বলেছিলেন?” সে জিজ্ঞেস করল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

“উনি শুধু বলেছেন তোমার সাথে মিলিয়ে নিতে। শুধু এটাই। এরচেয়ে বেশি কিছু বলেনি উনি।”

“হ্যাঁ, তো ৩০০,০০০ ইয়েন তো ৩০০,০০০ ইয়েন-ই।” ও না জানার ভান করল।

“যখন আমি প্রথমে শুনেছিলাম তুমি আমার সাথে মিথ্যা বলেছ। আমি প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম তুমি আমার পাওনা টাকা থেকে কিছু টাকা মেরে দিচ্ছ।”

মিয়াগি আমার দিকে চোখ তুলে চাইল।

“আমি ভেবেছিলাম এটা হয়তো ৩০ মিলিয়ন অথবা ৩ বিলিয়ন, আর আমাকে একটা মিথ্যা মূল্য বলে তুমি আমার টাকা আত্মসাৎ করেছ। এটাই ছিল আমার প্রাথমিক ভাবনা। কিন্তু আমি এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি এটা বিশ্বাস করতে চাইছিলামও না যে, তুমি একদম প্রথম থেকেই আমাকে বোকা বানিয়ে আসছ। তুমি তোমার হাসির পেছনে মিথ্যাটা লুকিয়ে রেখেছ। আমি চিন্তা করতে লাগলাম এটা প্রাথমিক কোনো ভুল নাকি। আমি সারারাত চিন্তা করলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতে পারলাম আমি একদম গোঁড়া থেকেই ভুল করে বসে আছি।”

আমার শিক্ষিকা আমাকে ইতোমধ্যে দশ বছর আগেই বলেছিলেন।

আমি চাই তুমি সেটা বাদ দিয়ে চিন্তা করো।

“কেন আমি বিশ্বাস করেছি বছরে ১০,০০০ ইয়েন হচ্ছে সবচেয়ে কম মূল্য? কেন আমি বিশ্বাস করেছি সাধারণ আয়ুষ্কাল দশ কিংবা একশত মিলিয়ন হওয়া

উচিত? হয়তো আমি আমার দিক থেকে খুব বেশি চিন্তা করছি। নিজের জীবন অন্যদের চেয়ে বেশি মূল্যবান এটা সম্ভবত সবাই গভীরভাবে বোকার মতো বিশ্বাস করতে চায়। যেভাবেই হোক, এক্ষেত্রে সাধারণ বিচারবুদ্ধির তুলনায় আমি একটু বেশিই চিন্তা করে ফেলেছি। আমার আরও নমনীয় হয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন ছিল।”

“তো সত্যি করে বলো, আমার মূল্য কত?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

একটা নীরবতা আমাদের ঘিরে ধরল।

“...ত্রিশ ইয়েন” মিয়াগি ফিসফিস করল।

“ত্রিশ মিনিটের ফোনকল” আমি হাসলাম। তোমার ৩০০,০০০ ইয়েন এভাবে ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত।”

“একদম। আমি আশা করেছিলাম আপনি সেগুলো আপনার নিজের জন্য খরচ করবেন।”

মিয়াগির কথার মধ্যে রাগের আভাস পাচ্ছিলাম। কিন্তু কণ্ঠ ছিল একদম শান্ত।

“আমি বুঝতে পারছি আপনি কেমন বোধ করছেন, মি. কুসুনোকি। সম্ভবত যে কারণে আমি আপনাকে ৩০০,০০০ ইয়েন দিয়েছি আর আপনি সেটা অপরিচিত লোকজনের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন, দুটোর কারণ একই। আমি একাকী, বিমর্ষ, শূন্য, মরিয়া অনুভব করেছিলাম। তাই আমি অযৌক্তিকভাবে পরোপকারী কিছু একটা করতে গিয়েছিলাম। যদিও, এখন চিন্তা করে দেখলে মনে হয়, আমি যদি আপনাকে ৩০০,০০০ ইয়েনের মিথ্যাটা না বলে সত্যিটা বলে দিতাম, সম্ভবত আপনি কিছুই বিক্রি করতেন না। তাহলে অন্ততপক্ষে আপনি আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারতেন। আমি যা করেছি তার জন্য দুঃখিত।”

হাঁটু গেড়ে বসে, চিবুক হাঁটুর মাঝে রেখে, নখের দিকে তাকিয়ে মিয়াগি বলল।

“হয়তো শুধুমাত্র একবারের জন্য, আমি কাউকে কিছু একটা দিতে চেয়েছিলাম। আমি সেটা নিজেকেই দিতে চেয়েছিলাম। সম্ভবত আমি এমন কাউকে দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম যে কিনা আমার মতো করুণ অবস্থায় আছে। যে অবস্থায় আমাকে কেউ কোনো সাহায্য করেনি। অন্যভাবে বলতে গেলে, ঘটনাটা ছিল আমার ভালো কিছু করতে চাওয়ার ফসল। আমি দুঃখিত।”

“এটা সত্যি নয়” আমি অস্বীকার করলাম। “যদি তুমি প্রথমেই বলতে ‘আপনার মূল্য ৩০ ইয়েন’ আমি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গিয়ে সবকিছুই বিক্রি করে দিতাম; তিন মাস তো দূরের কথা, তিন দিনও বাকি রাখতাম না। তুমি যদি মিথ্যে না বলতে আমি ভেঙিং মেশিনের ট্যুরে যেতে পারতাম না। ক্রেইন বানাতে পারতাম না। তারা দেখতে যেতে কিংবা জোনাকি দেখতে যেতে পারতাম না।”

“আপনার হতাশ হওয়ার কোনো কারণই ছিল না। ত্রিশ ইয়েন হচ্ছে একটা মূল্য যা উপরের দিকের লোকজনের সিদ্ধান্তে হয়েছে” মিয়াগি দৃঢ়তার সাথে বলল। “অন্তত আমার কাছে, মি. কুসুনোকি, আপনি এমন কেউ যার মূল্য ৩০ মিলিয়ন অথবা ৩ বিলিয়ন ইয়েন।”

“চুপ করো, এটা হাস্যকর রকমের সান্ত্বনা” আমি হেসে বললাম।

“এটাই সত্যি!”

“তুমি যদি আমার প্রতি খুব বেশি দয়া দেখাও, আমি নিজেকে করুণা করা শুরু করবো। আমি জানি তুমি খুব ভালো একটি মেয়ে। এরচেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই।”

“আপনি খুব বেশি জ্বালান। চুপ করে থাকুন আর আপনাকে অনুপ্রেরণা দিতে দিন।”

“আগে কেউ একথা বলেনি।”

“তাছাড়া, এটা সান্ত্বনা কিংবা দয়া দেখানো নয়। আমি আপনাকে তাই বলছি যা অনেকদিন ধরেই বলতে চেয়েছিলাম। আপনি এই নিয়ে কী ভাবলেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না” মিয়াগি কিছুটা বিব্রত হয়ে, মাথা নিচু করে বলল।

তারপরে ও সবকিছু খুলে বলল।

“প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, আপনি ৩০ ইয়েনের-ই উপযুক্ত। যখন আমি আপনাকে ৩০০,০০০ ইয়েন দিলাম, সেটা ছিল সম্পূর্ণ আমার নিজের আত্মতুষ্টির জন্য। এটা আপনি বা অন্য কেউ হলেও কিছু যেতো আসতো না, মি. কুসুনোকি। কিন্তু ধীরে-ধীরে, আপনার সম্পর্কে আমার মতামত বদলে যেতে লাগল। ট্রেন স্টেশনের সেই ঘটনার পরে আপনি আমার গল্পটা হৃদয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন, তাই না? আমার সময় বিক্রি করার পরিস্থিতি নিয়ে আপনি সহানুভূতি অনুভব করেছিলেন। সেসময় থেকে, মি. কুসুনোকি, আপনি আমার কাছে পর্যবেক্ষণ করার বস্তু ছিলেন না। এটা একটা মাত্র ঘটনা, কিন্তু এরপরে আরও অনেক কিছুই ঘটেছে।”

“আমি জানি এটা আপনার কাছে খুবই তুচ্ছ। কিন্তু আপনি আমার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলছেন দেখে খুবই ভালো লেগেছিল। কারণ, আমি সবসময়ই অদৃশ্য ছিলাম। উপেক্ষিত হওয়া আমার চাকরির একটা অংশ। এমনকি রেস্টুরেন্টে খাওয়া এবং কথা বলার মতো তুচ্ছ বিষয়, কেনাকাটা করতে যাওয়া, শহরজুড়ে হেঁটে বেড়ানো, হাতে হাত রেখে নদীর পাড়ে হেঁটে যাওয়া। এগুলো সবই আমার কাছে স্বপ্ন ছিল। আপনিই প্রথম ব্যক্তি যে কিনা আমার সাথে এমন আচরণ করেছেন। যে কোনো সময়, যে কোনো পরিস্থিতিতে।”

কিভাবে উত্তর দিবো আমি বুঝতে পারছিলাম না।

আমি কখনই ভাবতে পারিনি কেউ আমার প্রতি এতটা কৃতজ্ঞ হবে।

“তোমার পছন্দ হলে আমি সেগুলো এখনো করে যেতে পারি।” আমি রসিকতা করে বললাম। মিয়াগি মাথা নাড়ল।

“আমার ভালোই লাগবে, যেহেতু... আমি আপনাকে পছন্দ করি।”

যদিও খুব দ্রুত মারা যাবে এমন কাউকে পছন্দ করার মাঝে কোনো ফায়দা নেই।

ও করুণভাবে হাসল।

আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখ নাড়াতে পারলাম না। যেন সবকিছু স্থবির হয়ে গিয়েছে। আমি কিছু বললাম না। এমনকি চোখের পাতাও ফেলতে পারলাম না।

“জানেন, মি. কুসুনোকি। আপনাকে আমি আরও অনেক মিথ্যা বলেছি।” মিয়াগি বলল কিছু গম্ভীর স্বরে। “আপনার আয়ুষ্কালের মূল্য এবং হিমেনো ছাড়াও। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোনো ঝামেলা পাকান তাহলে আপনার আয়ুষ্কাল শেষ করে দেওয়া হবে, ওটা মিথ্যা ছিল। আবার যদি আপনি আমার থেকে ১০০ মিটার দূরে চলে যান তাহলে আপনার মৃত্যু হবে, সেটাও মিথ্যে ছিল। নিজেকে রক্ষা করার এর চেয়ে আর কোনো পথ ছিল না আমার কাছে। মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।”

“সত্যি নাকি?”

“যদি আপনার রাগ হয়, আপনার যা ইচ্ছে আমার সাথে করতে পারেন।”

“যে কোনো কিছু?” আমি বললাম।

“হ্যাঁ। যত ভায়ঙ্কর ইচ্ছাই হোক।”

“তাহলে সানন্দে...”

আমি মিয়াগির হাত ধরে দাঁড় করলাম। তার পরে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম।

ঠিক কতক্ষণ আমরা এভাবে ছিলাম নিশ্চিত নই আমি।

আমি সবকিছু মনে গেঁথে রাখতে চেষ্টা করলাম। ওর নরম চুল, ওর সুগঠিত কান, ওর সরু গ্রীবা, ওর কাঁধ এবং পিঠ, ওর সুগঠিত বুক, ওর মসৃণ বাঁকানো ঠোঁট।

আমি আমার সম্পূর্ণ চেতনাকে কাজে লাগিয়ে সবকিছু স্মৃতিতে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

যা-ই ঘটুক না কেন; আমি যেন মনে করতে পারি। যেন আমি কখনই ভুলে না যাই।

“এটা খুবই ভয়ঙ্কর ছিল” মিয়াগি বলল, নাক টেনেটেনে। “এই কাজ করার পরে, এখন আমি জানি আমি কখনই আপনাকে ভুলতে পারবো না।”

“ঠিক আছে। আমার মৃত্যুতে অনেক শোক করো তাহলে” আমি বললাম। “যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে, তাহলে আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত করবো সেটা।”

তার পরে মিয়াগি হাসল।

একমাত্র তখনই অবশেষে আমার শেষ কয়েক উদ্দেশ্যহীন মাসের জন্য একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেলাম।

মিয়াগির কথাগুলো আমার মাঝে এক অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে এলো।

দুই মাসও বাকি না থাকলেও, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম; যা-ই ঘটুক না কেন, আমি মিয়াগির ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করবো।

আমি, যার জীবনের মূল্য দিয়ে একটা জুসের বক্সও কেনা যাবে না।

আমার মনে হয় আমি এটা বলতে পেরেছি কেবল এই কারণে যে, আমি আসলে আমার অবস্থান সম্পর্কে জানি না।

চ্যাপ্টার ১৩ : অ্যা ভেরি রিয়েল ওয়ে

গল্প প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে। লেখালেখির জন্য হাতে খুব কম সময় আছে, তাই আমি জানি না গল্পটা শেষ করার আগেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় কিনা।

আমার মনে হয় আগের মতো বিস্তারিত লেখা যাবে না। কাটছাঁট করে লিখতে হবে।

যদিও মিয়াগির ঋণ শোধ করবো বলে ঠিক করেছি, কিন্তু আমার মূর্থতা এত সহজে নিরাময় করার যোগ্য না। অন্ততপক্ষে যখন কোনো কিছু অনুসরণ করতে হয়, সম্ভবত তখন আমার নেওয়া ভুল সিদ্ধান্তকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই।

কার্যত, প্রথমদিকে এটা অসম্ভব মনে হয়েছিল। ওর ঋণ ছিল এক সময়ে হিমেনোর বলা চাকরিজীবীর আয়-ব্যয়ের সমষ্টির চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কলেজের কোনো স্টুডেন্টের পক্ষে দুই মাসে এত টাকা যোগাড় করা বলতে গেলে অসম্ভব।

কিন্তু সময়ের সাথে-সাথে, আমি উপায় খুঁজতে লাগলাম। এক্ষেত্রে ভালো কোনো কাজ করা সম্পূর্ণ অবাস্তব চিন্তা। যত কঠোর পরিশ্রমই করি না কেন, দুই মাসের মধ্যে যা পাবো সেটা, পাথর নিংড়ে পানি পাওয়ার মতোই হবে।

তর্কসাপেক্ষে ধরে নিলাম মিয়াগির দেয়া ৩০০,০০০ ইয়েন আমি রোজগার করতে পারলাম। কিন্তু আমার মনে হয় না ও চাইবে আমি শেষ কটা মাস এভাবে কামলা খেটে মরি। সেইসাথে ও নিশ্চয় চাইবে না টাকা উপার্জন করতে গিয়ে আমি জোচ্ছুরি, ডাকাতি, প্রতারণা অথবা অপহরণের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ি।

আর যেহেতু আমি ওর জন্যই টাকাটা উপার্জন করতে চাই, অবশ্যই ও চাইবে না এমন কোনো উপায়ে আমি টাকা উপার্জনের চেষ্টা করি।

জুয়া কথাও ভেবে দেখলাম। এমনকি বোকামি করে হলেও ওসব করার কথা মাথায় তুললাম না। আমি জানি আমার ফাটা কপাল নিয়ে ফুটো পয়সাও

জিততে পারবো না। জুয়া হচ্ছে এমন খেলা, এটা তারাই জেতে যারা পয়সা খরচ করতে পারে।

সৌভাগ্যের দেবীকে ধরতে গেলে, সে পালিয়ে যাবে। এর জন্য শক্ত হতে হবে এবং তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে কখন দেবী নিজ থেকে ধরা দেয়। তার পরে সঠিক সময় বুঝে ধরতে হবে। কিন্তু সেজন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা আমার হাতে নেই। আর সঠিক সময় সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই।

এটা অনেকটা মেঘ ধরার মতো। দুই মাসের মধ্যে যদি সারাজীবনের টাকা উপার্জনের দারুণ কোনো পথ থাকতো, সকলেই সেটা করতো। সত্যি বলতে আমি যা করতে চেষ্টা করছি তা শুনলে সকলেই অসম্ভব বলে ঘোষণা দিতো।

আমার একমাত্র “অস্ত্র” ছিল, বাকি আয়ুষ্কালটুকু। কিন্তু টাকার জন্য জীবন উৎসর্গ করা ব্যক্তি আমিই প্রথম নই। আর আমি নিশ্চিতভাবেই বলে দিতে পারি তাদের জন্য পরিকল্পনা মোটেও কাজে দেয়নি।

তবুও, বেরোয়াভাবে আমি চিন্তা করে যেতে লাগলাম। আমি জানি, এর আগে কেউ যদি সফল নাও হয়, আমাকেই প্রথম সফল হতে হবে।

নিজেকে বারবার বলে যেতে লাগলাম, চিন্তা করো, চিন্তা করো, চিন্তা করো। কিভাবে বাকি দুই মাসে আমি ঋণটা শোধ করতে পারি? মিয়াগি নিশ্চিত্তে ঘুমানোটা কীভাবে নিশ্চিত করতে পারি? আমার মৃত্যুর পরেও মিয়াগি একা হয়ে যাবে না নিশ্চিত করবো কীভাবে?

শহরজুড়ে হেঁটে বেড়াতে-বেড়াতে আমি চিন্তা করতে লাগলাম। আমার বিশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে এইটুকু অভিজ্ঞতা অন্তত হয়েছে যে, কোনো প্রশ্নের সঠিক কোনো উত্তর জানা না থাকলে হাঁটতে-হাঁটতে চিন্তা করাই সবচেয়ে ভালো।

আমি পরের দিনও হাঁটতে লাগলাম, এবং এরপরের দিনও। আশা করছি উত্তরটা আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়বে।

সে সময়ে আমি খুব একটা বেশি কিছু খাইনি।

আবারো অভিজ্ঞতার কথা বলতে হয়। আমি জানি ক্ষুধার্ত থাকার একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। আর আমি সেটার উপরই ভরসা করছি।

আরেকবার দোকানে যাওয়ার চিন্তা মাথায় আসতে খুব বেশি সময় লাগল না।

আমার শেষ ভরসা ছিল পুরাতন দুর্গন্ধযুক্ত বিল্ডিংটা। যেটা একসময়

আমাকে হতাশার সাগরে ছুড়ে ফেলেছিল। তবুও আমাকে আরও দুবার কেনাবেচা করার সুযোগ দিচ্ছে।

একদিন আমি মিয়াগিকে জিজ্ঞেস করলাম, “তোমাকে ধন্যবাদ মিয়াগি, আমি এখন আগের চেয়ে অনেক সুখী। যদি ধরে নেওয়া যায় আমি আবারো আমার আয়ুষ্কাল সেই দোকানে বিক্রি করতে চাই। সর্বোচ্চ কত টাকা হবে?”

“আপনি যা ধারণা করেছেন, মূল্যটা কিছু-কিছু বিষয়ের উপর উঠা-নামা করে।” মিয়াগি নিশ্চিত করল। “কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আয়ুষ্কালের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানসিক সুখ খুবই অল্প প্রভাব রাখতে পারে। তাদের লক্ষ্য থাকে সুখের বাস্তব পরিমাপের উপর। যদিও বিষয়টা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে।”

“তাহলে, কিসে মূল্য সবচেয়ে বেশি বাড়বে?”

“সামাজিক আবদান, জনপ্রিয়তা। আমার বিশ্বাস ওরা এমন সব বিষয়কে প্রধান্য দেয় যার খুব সহজে বাস্তব মানে খুঁজে পাওয়া যায়।”

“সহজে চেনা যায় এমন, তাই না?”

“মি. কুসুনোকি?”

“কিছু বলবে?”

“দয়া করে উল্টাপাল্টা কিছু চিন্তা করবেন না” মিয়াগি চিন্তিত সুরে বলল। “আমি উল্টাপাল্টা কিছু চিন্তা করছি না। এই মুহূর্তে সচরাচর যা চিন্তা করা প্রয়োজন সেটাই চিন্তা করছি।”

“আমার মনে হয় আমি হালকা-পাতলা জানি আপনি কী চিন্তা করছেন,” মিয়াগি বলল। “বেশিরভাগই হচ্ছে কিভাবে আমার ঋণ পরিশোধ করা যায় তা নিয়ে, ঠিক? যদি তাই হয়, তাহলে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কৃতজ্ঞ হলেও আমার বলতেই হবে, আমি চাই না আপনি আপনার বাকি সময়টুকু নষ্ট করুন। আপনি যদি আমার সুখের চিন্তা করে থাকেন... আমি খুবই দুঃখিত, নিশ্চিতভাবেই সেটা হবে ভুল ধারণা।”

“শুধুমাত্র জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি মিয়াগি, কিসে তোমার সুখ?”

“আমার দিকে নজর দিন” মিয়াগি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল। “ইদানীং আপনি আমার সাথে খুব একটা কথা বলেননি, বলেছিলেন কি?”

মিয়াগি ঠিকই বলেছে। আমি যা করছি সেটা আমার দিক থেকে ভুলভাবে চিন্তা করছি।

কিন্তু তার মানে এই না এত সহজে আমি হাল ছেড়ে দিবো। আমি সংকল্প

নিয়ে নিয়েছি। আমার উচিত সহজে চেনা যায় এমন জিনিস যেমন সমাজে অবদান রাখা এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করা।

একবার সেটা করতে পারলে আমার জীবনের মূল্য বেড়ে যাবে। আপাতত এটাই মনে হচ্ছে। সাহস করে বলেই ফেলি, আমি আশা করছি আমি এতটা জনপ্রিয় হয়ে যাবো যে সবাই আমাকে এক নামে চিনবে।

আমি সত্যিই জানি না কোনটি বেশি বাস্তবসম্মত; টাকা উপার্জন করা, না-কি এমন মানুষে রূপান্তরিত হওয়া যার আয়ুষ্কাল বেশি দাম বিক্রি করা যাবে।

চিন্তা করে দেখলাম দুটোই সমানভাবে অবাস্তব। কিন্তু আমার আর কোনো উপায় নেই। আমাকে অন্ততপক্ষে একটা চেষ্টা করে দেখতে হবে।

আমি আমার চিন্তাভাবনার একদম শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছি। আমার অন্যের কল্পনা শক্তির সাহায্য প্রয়োজন। প্রথমে আমি পুরাতন বইয়ের দোকানে গেলাম। কারণ, বিপদে পড়লেই কেবল ওখানে যাওয়ার ঝোঁক তৈরি হতো আমার। উদ্দেশ্যহীনভাবে সমস্যার সাথে সম্পর্কহীন বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান মাথায় আসে। আমি বুঝতে পারলাম, এবারে কাজটা খুব সহজ হবে না। কিন্তু সেদিন আমি, শুধু বইয়ের উপর ভরসা করলাম না।

আমি বৃদ্ধ মালিকের খোঁজ করলাম। যিনি কিনা পেছনে চারপাশের বইয়ের টালের সারি দ্বারা আবদ্ধ হয়ে রেডিয়োতে বেসবল রিলে শুনছে। আমার ডাকে তিনি মাথা তুললেন।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আয়ুষ্কালের দোকান সম্পর্কে কোনো কথাই তুলবো না। যদিও উনি দোকানটা সম্পর্কে ঠিক কতটুকু জানেন সেটা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা গত কয়েক মাসে যা যা ঘটেছে সবকিছু বলতে চাচ্ছিলাম আমি।

কিন্তু যদি আমি কথা বলিই, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমার বাকি দুই মাসের কথা উঠে আসবে, আর উনি হয়তোবা নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারে।

তাই আমি আয়ুষ্কাল নিয়ে কোনো কথাই বললাম না। উনার সাথে অর্থহীন কথাবার্তা বললাম। শুধু এবারের জন্য আমি এমনভাবে অভিনয় করলাম যেন মিয়াগির অস্তিত্ব নেই।

আবহাওয়া নিয়ে, বই নিয়ে, বেসবল নিয়ে, ফেস্টিভ্যাল নিয়ে কথা বললাম। উল্লেখ করার মতো কোনো কথা হলো না। আশ্চর্যজনকভাবে কথোপকথনটা

আমাকে প্রশান্তি এনে দিলো। সম্ভবত আমি দোকানটি এবং বৃদ্ধ লোকটিকে পছন্দ করি বলেই।

মিয়াগি যখন বুকশেলফের দিকে তাকাতে ব্যস্ত ছিল, আমি বৃদ্ধের কানে কানে ফিসফিস করে একটা প্রশ্ন করলাম।

“কিভাবে কেউ নিজের মূল্যবৃদ্ধি করতে পারবে?”

দোকানের মালিক অবশেষে রেডিওর ভলিউম কমিয়ে দিলো।

“হুম। ধরে নিতে হবে তোমাকে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতে হবে। যদিও আমি সেটা করতে পারবো না; তারপরেও, আমার মনে হয় তোমাকে যা করতে হবে সেটা ‘তুমি’ ঠিকই দেখতে পারবে। আর সেটা করার ক্ষেত্রে তোমাকে সেরা হতে হবে। অন্তত আমার এই বয়সে এটাই ভাবি আমি।”

“আচ্ছা।” আমি মাথা ঝাকাললাম।

“কিন্তু” লোকটি একটু আগে যা বলছিল সেটা অস্বীকার করার মতো করে বলল, “এটার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আছে। আর তা হচ্ছে আমার মতো কারো উপদেশে বিশ্বাস করো না। এমন কেউ যে জীবনে কিছুই অর্জন করতে পারেনি সে সফলতা নিয়ে কথা বলছে মানে নিজের ব্যর্থতায় চোখ বন্ধ করে রেখেছে। আমার উদাহরণ অনুসরণ করো না। আমি এমনকি বুঝতেও পারছি না কেন আমি ব্যর্থ হয়েছি। এরকম লোকের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা দেখানোর প্রয়োজন নেই।”

“যে সকল মানুষ অনেকবার ব্যর্থ হয়েছে তারা সেসব ব্যর্থতা নিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে এমনভাবে কথা বলে যেন আরেকবার জীবন পেলে তারা সফল হবে। সকল ধরনের কষ্ট সহ্য করার পরে তারা ভাবে আর কোনো গড়বড় করবে না তারা। কিন্তু তারা সবাই একটা মৌলিক ভুল করে; এমনকি আমি নিজেও। ব্যর্থরা ব্যর্থতা সম্পর্কে অনেক জানে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যর্থতা সম্পর্কে জানা সফলতা সম্পর্কে জানার চেয়ে হাজারগুণ ভিন্ন। ব্যর্থতা ঠিক কাটিয়ে ওঠা মানে এই নয় যে সে সফল হবে; আসলে নতুন করে শুরু করার জন্য একটা পয়েন্ট পাবে। এটাই ব্যর্থরা বুঝতে চায় না।”

আমার কাছে বিষয়টা হাস্যকর মনে হলো যখন মনে পড়ল মিয়াগি এরকম কিছু একটা বলেছিল।

“তারা শুধুমাত্র স্টার্টিং লাইনে পৌঁছেছে। অনেকগুলো হারের পরে তারা কেবলই মাত্র আত্মসংযম পুনরুদ্ধার করেছে। সেটাকে সবকিছু উলটপালট করে

দেওয়ার সুযোগ মনে করা মানেই ভুল করা।“

শেষে উনি বললঃ

“তুমি কি আবারো আয়ুষ্কাল বিক্রির কথা ভাবছ নাকি?”

“মানে কী?” আমি নিষ্পাপভাবে হেসে বললাম।

বইয়ের দোকান থেকে বের হয়ে আগের মতোই, সিডির দোকানে প্রবেশ করলাম। সচরাচর যে থাকে; সেই সোনালি চুলের ক্লার্কটা আমাকে স্বাগত জানালো।

এখানেও, আমি আয়ুষ্কাল নিয়ে কোনো কথা বললাম না। কেবলমাত্র ইদানীং যেসব সিডি শুনেছি সেসব নিয়ে খাজুরে আলাপ করলাম।

শেষে, মিয়াগি শুনতে পাবে না এমন সময় বেছে নিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলামঃ

“কম সময়ের মধ্যে কোনো কিছু অর্জন করার যায় কিভাবে?”

ক্লার্কের উত্তর এলো খুব দ্রুত। “ধরে নিন আপনাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে, ভায়া। কারণ, একা একজন ব্যক্তি কিছুই করতে পারবে না, তাই না? সত্যি বলতে, তার মানে হচ্ছে আপনাকে অন্যের সাহায্য নিতে হবে। আমার নিজের উপরে এতটা ভরসা নেই। যদি এমন কোনো সমস্যায় পড়ি, যা আমি মোকাবেলা করতে পারবো না; আমি সোজা অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য চলে যাই।”

উপদেশটা কি আমি শুনবো না-কি শুনবো না; নিশ্চিত হতে পারছিলাম না।

বাইরে হঠাৎ ভারী বৃষ্টিপাত হতে লাগল। গ্রীষ্মে যা হয়

বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম আমি। কিন্তু ক্লার্ক আমার হাতে একটা ভিনাইল ছাতা ধরিয়ে দিলো।

“আমি জানি না আপনার সাথে কী ঘটছে। কিন্তু আপনি যদি কোনো কিছু অর্জন করতে চান আপনার স্বাস্থ্যের কথা ভুলবেন না।” সে বলল।

লোকটাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর, ছাতা মাথায় দিয়ে মিয়াগির সাথে বাসার উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরলাম। ছাতাটা ছোট বিধায় আমাদের কাঁধ ভিজে একাকার হয়ে গেল।

লোকজন আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারা একটা নির্বোধকে ভুল জায়গায় ছাতা ধরতে দেখছে।

“আমার ব্যাপারটা পছন্দ হয়েছে।” মিয়াগি হাসতে লাগল।

“কেন তোমার পছন্দ হয়েছে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আসলে... অন্য সবার কাছে কী রকম হাস্যকর দেখাচ্ছে জানা সত্ত্বেও, আপনি আপনার কাঁধ ভিজতে দিচ্ছেন। আমার এরকম ব্যাপার খুব পছন্দের।”

“ওহ...” আমি বললাম। আমার চিবুক হালকা লাল হয়ে গেল।

“আপনি একজন বেহায়া লাজুক পুরুষ” আমার কাঁধে একটা খোঁচা দিয়ে মিয়াগি বলল।

কিন্তু এক্ষেত্রে, মানুষ আমাকে নিয়ে কী ভাবছে তা গ্রাহ্য করি না। মানুষ আমার সম্পর্কে কী ভাবছে তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কারণ, আমি যা করছি সেটা মিয়াগিকে খুশি করছে। আমাকে যতটা হাস্যকর লাগছে, মিয়াগি ঠিক ততটাই হাসছে।

বৃষ্টি থেকে বাঁচতে একটা দোকানের ছাউনিতে আশ্রয় নিলাম আমরা। দূরে ব্রজপাতের গর্জন শুনতে পেলাম। নর্দমা থেকে বৃষ্টির পানি উপচে পড়ে আমার ভেজা জুতার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

সেখানে, আমি একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম। মানুষটি গাঢ় নীল রঙের ছাতা মাথায় দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে থামল সে।

ছেলেটা আমার ডিপার্টমেন্টের। ওকে আমি চিনি কারণ, আমাদের মাঝে প্রায়ই অভ্যর্থনা আদান-প্রদান হতো।

“অনেক দিন হয়ে গেল” ছেলেটা ঠান্ডা চোখে বলল। “এতদিন ধরে কোথায় ছিলে? বেশ অনেকদিন ধরে তোমাকে ক্যাম্পাসে দেখছি না।”

আমি মিয়াগির কাঁধে একটা হাত দিয়ে বললাম, “আমি এই মেয়েটার সাথে ঘোরাঘুরি করছি। ওর নাম মিয়াগি।”

“মজা করো না” সে বলল। স্পষ্টতই নারাজ হয়েছে সে। “এমনিতে তুমি উদ্ভট একটা ছেলে।”

“তোমাকে দোষ দিতে পারি না।” আমি উত্তর দিলাম। “আমি নিশ্চিত তোমার জায়গায় আমি থাকলেও একই কথা বলতাম। কিন্তু মিয়াগি এখানেই আছে, ঠিক আছে। আর ও সত্যিই অনেক কিউট। তুমি যদি বিশ্বাস না করো আমি সেটাকে সম্মান করবো। আমি চাই তুমিও আমার ব্যাপারটাকে সম্মান করো।”

“আমি সবসময়ই জানতাম। কিন্তু তুমি, তুমি সত্যি মানসিক বিকারগ্রস্ত, কুসুনোকি। মানুষের সাথে মেলামেশা করার বদলে তুমি সবসময়ই তোমার

খোলসের ভিতরে লুকিয়ে থাকতে, তাই না? বাইরের জগতে একটু উঁকি দিয়ে দেখলে কেমন হয়?”

তারপরে ছেলেটা হতাশ এবং স্তব্ধ হয়ে চলে গেল।

আমি বেঞ্চে বসে বৃষ্টি পড়া দেখতে লাগলাম। দ্রুতই সবকিছু পরিষ্কার হতে শুরু করল।

“ধন্যবাদ” আমার দিকে হেলান দিয়ে মিয়াগি বলল।

আমি ওর মসৃণ চুলে আঙুল চালিয়ে বিলি কেটে দিলাম।

আমি বইয়ের দোকানের বৃদ্ধের উপদেশ জোরে উচ্চারণ করলাম। যদিও তিনি বলেছিলেন, উনাকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না, এখন কথাগুলোর মানে বুঝতে পেরেছি।

হয়তো ওর ঋণ ফিরিয়ে দেয়া ছিল খুব বেশি অতিরঞ্জিত। ভেবে দেখলাম, মিয়াগিকে খুশি করার জন্য আমি অন্য একটা জিনিস করতে পারি

এটা অনেকটা ওর বলা কথার মতো; “ওর দিকে মনোযোগ দেয়া”। আমার চারপাশের লোকজনের কাছ থেকে ছিটখস্তের মতো আচরণ পাওয়াটা ওকে বিলম্বিত আনন্দ দিবে।

এটা ঠিক আমার চোখের সামনেই ছিল। তাহলে কেন আমি এতদিন এটা করিনি?

মিয়াগি এমন সময়ে কথা বলে উঠল যেন ও আমার মনের চিন্তা-ভাবনা ধরতে পেরেছে।

“মি. কুসুনোকি? আমি সত্যি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি যে, আপনি আপনার বাকি থাকা অল্প আয়ুষ্কাল আমাকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করার চিন্তা করছেন। কিন্তু এর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, আপনি অনেক আগেই আমাকে বাঁচিয়েছেন। এমনকি আপনাকে ছাড়া এক দশক কাটিয়ে ফেললেও আমি বিশ্বাস করি, আপনার সাথে কাটানো সময়গুলোর কথা আমার মনে থাকবে। আমি সেগুলো মনে করে হাসবো, কাঁদবো। আমি বিশ্বাস করি এটুকু স্মৃতি যে কারো বেঁচে থাকা সহজ করে দিবে। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। ঋণের ব্যাপারে ভুলে যান।”

“তার বদলে,” মিয়াগি বলল, ওর গায়ের ভর আমার দিকে চাপিয়ে দিয়ে।

“তার বদলে আমাকে স্মৃতি দিন। আপনি চলে যাওয়ার পরে যখন আমি একাকী অনুভব করবো, নিজেকে বারবারে উষ্ণ রাখার জন্য যতগুলো সম্ভব স্মৃতি দিন।”

মিয়াগি এবং আমি বড় পুকুরওয়ালা পার্কের উদ্দেশ্যে বাসে উঠলাম।

ওখানে আমি কী করেছিলাম সেটা যদি কেউ শোনে তাহলে বেশিরভাগই চোখ কপালে তুলবে অথবা হাসতে-হাসতে গড়াগড়ি খাবে।

হুদে আমি একটা নৌকা ভাড়া নিলাম। যেখানে সাধারণ বৈঠাওয়ালা নৌকা ছিল, আমি হাস্যকর সোয়ান বোট নেওয়ার সাহস দেখালাম।

যেহেতু আমাকে একাই দেখা যাচ্ছিল, ডকের ক্লার্ক আমার দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় চাহনী দিল; হয়তো বলতে চাইছে “একা?”

সাধারণত কপোত-কপোতী জোড়া অথবা মেয়েদের যুগল এসবে ওঠে আমি ঘুরে মিয়াগির দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, “ঠিক আছে, চল তাহলে!”

ক্লার্কের চেহারা কুঁচকে গেল। ব্যাটার চোখে আতঙ্ক দেখা গেল।

পুরোটা সময় নৌকাতে আমাদের দেখতে কেমন লাগছে মনে করে মিয়াগি কিছুতেই হাসি আটকাতে পারল না।

আমরা ধীরে-ধীরে হুদটা ঘুরতে লাগলাম। পানির শব্দের মধ্যে, মিয়াগি “স্ট্যান্ড বাই মি”-এর শিস দিল। দিনটি ছিল গ্রীষ্মের শান্ত বিকেল।

হুদের সীমানার চারপাশের মধ্যে ইয়োশিনো চেরি গাছ লাগানো হয়েছে। বসন্তে নিশ্চিতভাবেই হুদটা চেরির পাপড়ি দিয়ে ভরে যাবে।

অন্যদিকে শীতকালে, হুদটার বেশিরভাগ অংশ জমে যাবে এবং সোয়ান বোটকে অবসরে যেতে হবে। সত্যিকারের রাজহাঁস তার জায়গা নিবে।

একজন মানুষ হিসাবে চিন্তাটা অনেকটা বিষণ্ণ, যে কিনা আর কখনই বসন্ত কিংবা শীত দেখবে না। কিন্তু আমার পাশে মিয়াগিকে হাসতে দেখে খুব দ্রুতই চিন্তাটা বন্ধ হয়ে গেল।

নৌকার মাঝেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ রইল না। পরের কয়েকটা দিন আমি একটার-পর-একটা হাস্যকর কাজ-কারবার করতে লাগলাম। সহজ কথায় বলতে গেলে, একা-একা করা যায় না-এমন সবকিছুই করলাম আমি। অবশ্যই, সবকিছু মিয়াগির সাথেই করেছিলাম। কিন্তু সবাই ব্যাপারটা সেভাবে দেখল না।

এক-একা ফেরি হুইলে চড়লাম। একা-একা মেরি-গো রাউন্ডে চড়লাম। একা-একা পিকনিক করলাম। একা-একা অ্যাকুরিয়াম ঘুরতে গেলাম। একা-একা চিড়িয়াখানা ঘুরতে গেলাম। একা-একা পুলে গেলাম, বারে একা-একা টোস্ট করলাম। একা-একা বারবিকিউ করলাম।

একা-একা করলে বিব্রত হওয়া লাগে এমন প্রায় সবকিছুই আমি করলাম। আর যখনই আমি সেগুলো করছিলাম, আমি সবসময়ই সানন্দে মিয়াগির নাম উচ্চারণ করেছিলাম। ওর সাথে হাতে হাত ধরে হাঁটাহাঁটি করা, চোখে চোখ রাখা, এবং ওর অস্তিত্বকে সাধারণভাবে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

টাকা-পয়সা শেষ হয়ে এলে, আমি কয়েকদিন পার্ট-টাইম জব করতাম। তার পরে আবারো মাস্তি করা শুরু করতাম।

সেসময়ে খেয়াল করিনি যে আমি ধীরে-ধীরে ছোট শহরটার কুখ্যাত সেলিব্রেটিতে পরিণত হচ্ছিলাম।

স্বাভাবিকভাবেই কেউ-কেউ আমাকে টিটকারি দিলো, কেউ-কেউ স্পষ্টভাবেই এড়িয়ে চলল, তাদের ড্রা কুঁচকাতো; কিন্তু অন্যদিকে, কেউ-কেউ ভাবতো আমি মূক অভিনয়ের প্রতিভা দেখানোর চেষ্টা করছি অথবা আমার কাজ কারবারকে মননশীল কোনো ব্যায়াম বলে বিবেচনা করত।

না, শুধু তাই নয়; সম্ভবত কিছু-কিছু মানুষের হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয় আমাকে দেখলে। আমি আসলেই মানুষকে খুশি করতাম।

আশ্চর্যজনকভাবে, যারা আমাকে খারাপ বলে জানতো এবং যারা ভালো বলে জানতো; তাদের দু'দলের অনুপাত সমান ছিল।

কেন অর্ধেক লোক আমার আহাম্মকি কাজ-কারবার দেখে ভালো অনুভব করতো? কারণটা ছিল হয়তো বিস্ময়করভাবে খুবই সাধারণ।

কারণ, আমাকে দেখে মনে হচ্ছিল, আমি আমার জীবনের সেরা সময় কাটাচ্ছি।

সম্ভবত সেটাই ঘটেছে।

একদিন সকালে মিয়াগি আমাকে জিজ্ঞেস করল, “মি. কুসুনোকি, আপনি কি চান আমি আপনার জন্য কিছু একটা করি?”

“হঠাৎ করে কী হলো আবার?”

“আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে সবকিছুই দিচ্ছেন। আমিও অল্প হলেও আপনাকে কিছু দিতে চাই।”

“এরকম কিছু এই মুহূর্তে আমার মনে আসছে না। বিষয়টা আমার মাথায় থাকবে” আমি বললাম “মিয়াগি, তুমি চাও এমন কিছু কি আছে যা আমি তোমার জন্য করতে পারি?”

“এরকম কিছু নেই। আমার ইচ্ছা হলো আপনার ইচ্ছে সম্পর্কে জানা।”

“তাহলে আমার ইচ্ছে হলো তোমার ইচ্ছে সম্পর্কে জানা।”

“আপনার ইচ্ছে জানাটাই আমার একমাত্র ইচ্ছে, মি. কুসুনোকি”

উদ্দেশ্যহীনভাবে চার-পাঁচবার এভাবে পুনরাবৃত্তি করার পরে, মিয়াগি হার মানল।

‘কয়েকদিন আগে, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার যদি বেঁচে থাকার কয়েক মাস থাকতো তাহলে আমি কি করতাম। আমি আপনাকে তিনটা উত্তর দিয়েছিলাম, তাই না?’

“তারা খচিত হৃদ, তোমার কবর, ছোটবেলার বন্ধু।”

“হ্যাঁ।”

“তুমি তোমার ছোটবেলার বন্ধুর সাথে দেখা করতে চাও তাহলে?”

মিয়াগি ক্ষমা প্রার্থনার মতো করে মাথা নাড়ল। “চিন্তা করে দেখলাম, আমি কবে মারা যাবো জানি না। সেহেতু, আমি ভেবেছি যত দ্রুত সম্ভব ওর সাথে দেখা করতে চাই। আমি এখনো জানি ও কোথায় থাকে। যদিও আমাদের দেখা হবে না। আমি শুধু ওকে দেখবো। আপনি কি আমার সাথে যাবেন?”

“হ্যাঁ, অবশ্যই।”

“দয়া করে আপনার ইচ্ছের কথা আমাকে দ্রুত বলবেন, মি. কুসুনোকি।”

“একবার মনে আসলেই বলবো।”

ওর গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য যে যানবাহনের প্রয়োজন আমরা দ্রুত সেটা সম্পর্কে খোঁজ-বর নিলাম। এবং মিয়াগির হোমটাউনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম।

পাহাড়ি রাস্তা ধরে বাস যাওয়ার সময়, ও স্মৃতিকাতর হয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল।

“আমি জানি আমি হতাশ হবো। আমার ইচ্ছেটা খুবই অবাস্তব, স্বার্থপর এবং শিশুতোষ। ‘আমি কিছুই পরিবর্তন করতে চাই না’ ইচ্ছেটার কথা হতে পারে কেউ কখনো শোনেনি। কিন্তু আমার স্মৃতিও প্রতারণা করতে পারে। আমার মনে হচ্ছে আমি এখন সব সইতে পারবো। কারণ, আপনি পাশে আছেন, মি. কুসুনোকি।”

“কারণ, যন্ত্রণা সঙ্গী ভালোবাসে।”

“আমি এটা বুঝাইনি, আপনি কি গাধা নাকি?”

“আমি জানি। আমার ভুল হয়েছে” বললাম আমি। তারপরে মিয়াগির মাথার বিলি কেটে বললাম, “ঠিক এভাবে?”

“হ্যাঁ, এভাবে।’ মিয়াগি মাথা নাড়ল।

শহরটা খুবই ছোট। শপিং ডিস্ট্রিক্টের সবগুলো দোকান ছিল যন্ত্রপাতির। ছোট চেইন সুপারমার্কেটের রেজিস্টারে বিশাল লম্বা লাইন। কোথাও না যেতে পেরে স্টুডেন্টরা কমিউনিটি সেন্টারে জড় হয়েছে; এরকম একটা শহর।

অস্বাভাবিকভাবে, সেদিন মিয়াগি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওর ছোটবেলার বন্ধু যে শহরে বাস করে সেটা ও চিনতো। কিন্তু কোন বাসায় বাস করে সেটা জানতো না।

আমি এমন জায়গা খুঁজতে লাগলাম সেখানে ছেলেটা থাকতে পারে। মিয়াগি বলল, মনে হয় ওর নাম ছিল এনিশি।

আমরা যখন এনিশিকে খুঁজে পেলাম, মিয়াগি ঠিক তখনই ওর কাছে গেল না। প্রথমে, ও আমার পিছনে লুকালো। ভয়ে ভয়ে ওর মাথা বের করল, এবং আস্তে আস্তে ওর সামনে এগিয়ে গেল।

সেটা এতই ক্ষুদ্র একটা স্টেশন ছিল যেখানে একসাথে দশজন থাকলে বন্ধী বন্ধী লাগে। এনিশি কোণের একটা বেঞ্চে বসে বই পড়ছিল।

তার চেহারা এবং অঙ্গ-ভঙ্গিতে সুখী-সুখী ভাব ছিল। বিশেষ করে তার অভিব্যক্তির কথা বলতেই হয়।

একটা আয়েশি অভিব্যক্তি। অনেকটা আত্মবিশ্বাসকে চাপা দেওয়ার কৌশল। এরকম অভিব্যক্তি তৈরি করতে কি প্রয়োজন সেটা সম্প্রতি আমি বুঝতে শিখেছি।

সংক্ষেপে, এই অভিব্যক্তি তৈরি করা তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা কাউকে ভালোবাসার এবং ভালোবাসা পাবার আস্থা অর্জন করতে পারে।

এনিশিকে দেখে আমি বলে দিতে পারি সে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে না, বরং কোনো একজনের আসার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি বুঝতে পারলাম মিয়াগি সেই “কেউ একজন”কে দেখতে চায় না। আমি সময় দেখলাম। তারপরে ফিসফিস করে বললাম, “আমার মনে হয় আমাদের চলে যাওয়াই ভালো।” মিয়াগি মাথা নাড়ল।

“ধন্যবাদ, আমি দেখতে চাই ও কোন ধরনের মেয়েকে ভালোবাসে।”

একটা সাবওয়ে ট্রেন এসে থামল। ট্রেনে থেকে নামা বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জারই স্টুডেন্ট। এদের মধ্যে একজন বিশ বছর বয়সি মেয়েকে দেখা গেল।

এমনকি ওরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি ছুড়ে দেওয়ার আগেই আমি এখান থেকেই বলে দিতে পারি যে এনিশি মেয়েটার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

মেয়েটার হাসি সহজাত। এতটাই সহজাত যে এটাকে হাসিও বলা যায় না। যতই সহজাত হোক না কেন, বেশিরভাগ মানুষের হাসি অন্ততপক্ষে কিছুটা হলেও জোর করে হয়। কিন্তু ওর হাসিতে এরকম কোনো আভাস দেখা গেল না। হয়তো সবসময়ই হাসার ফল এটা।

যেহেতু কোনো প্রকার কথাবার্তা ছাড়া ওরা স্বাভাবিকভাবে কাছে এলো, মনে হচ্ছে ওরা বেশ অনেকদিন ধরেই ডেটিং করছে। ওদের চেহারায় তাৎক্ষণিক যে খুশির ঝিলিক দেখলাম, মনে হচ্ছিল ওদের প্রথমবার দেখা হয়েছে।

খুশির ঝিলিকটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। তারা যে সুখী সেটা জানার জন্য ওইটুকুই যথেষ্ট।

মিয়াগিকে ছাড়া এনিশি সুখেই আছে।

মিয়াগি ওদের দিকে আবেগশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

হয়তোবা একমাত্র আমিই এখানে বেশি বিরক্ত হচ্ছি। এনিশি এবং ওর গার্লফ্রেন্ডের মধ্যে আমি নিজেকে এবং হিমনোকে দেখতে পাচ্ছি। যদিও খুবই অল্প সময়ের জন্য হলেও, আমি এমন একটা সুখী ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করলাম।

এনিশি এবং ওর গার্লফ্রেন্ড চলে গেল। ভিতরে শুধু মিয়াগি এবং আমি রয়ে গেলাম।

“ও আমাকে দেখবে না জেনেও, আমি বেশ কিছু জিনিস করার চিন্তা করেছিলাম।” মিয়াগি বলল। “কিন্তু আমি মত পাল্টেছি।”

“যেমন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“যেমন ওকে জোর করে জড়িয়ে ধরা। এরকম কিছু একটা।”

এরকম কিছু, অ্যা। আমি যদি সে জায়গায় থাকতাম তাহলে আরও বেশি কিছু করতাম।”

“যেমন?”

মিয়াগি শব্দ দুটো শেষ করার আগেই, আমার হাত দুটো ওর হিপ জড়িয়ে ধরে ওকে ‘আরও বেশি’র নমুনা দেখিয়ে দিলাম।

আমরা ওভাবে মিনিট দুইয়ের মতো ছিলাম।

যদিও প্রথমদিকে মিয়াগি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। আস্তে-আস্তে ও স্থির হয়ে

গিয়ে আমার সাথে সাড়া দিতে লাগল।

আমাদের ঠোঁট আলাদা হলে আমি ওকে বললাম, “যদি কেউ আমাকে দোষ দিতে না চায়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমি এরকম স্বার্থপর কাজ করবোই।

“অবশ্যই, কেউ আপনাকে দোষ দিবে না” মিয়াগি অবশেষে বলল, ওর মাথা তখনো নিচু।

চ্যাপ্টার ১৪ : দ্যব্লু পিরিয়ড

আমার আয়ুষ্কালের মেয়াদ পঞ্চাশ দিনের নিচে চলে আসতেই একটা পরিবর্তন টের পেতে শুরু করলাম।

আগে যেমনটা বলেছিলাম, অনেক মানুষই আমার কার্যকলাপে খুঁত খুঁজে পেতো। যা কিনা একই সাথে বিখ্যাত এবং কুখ্যাত। অনেক মানুষই আমাকে অদৃশ্য কারো সাথে কথা বলতে দেখে আনন্দ পেতো। আমাকে এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়া লোকজনকে শুনিয়ে জোরে-জোরে নিষ্ঠুর কথাবার্তা বলতো।

অবশ্যই আমার নালিশ করার মতো কোনো অধিকার নেই। যেহেতু আমিই ওদেরকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছি।

একদিন বারে আমার সাথে তিনজন লোকের একহাত হয়ে গেল। তারা প্রাপ্ত সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেদের কত কঠোরভাবে উপস্থাপন করা যায় সেটা নিয়ে উচ্চস্বরে কথা বলতে লাগল। তাদের সংখ্যা এবং দৈহিক উচ্চতা দেখে বুঝলাম এদের না ঘাঁটানোই আমার জন্য ভালো।

সম্ভবত শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে যখন আমাকে একা একা ড্রিস্ক করতে এবং পাশের খালি সিটের সাথে কথা বলতে দেখল; তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার পাশে বসে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল। আমাকে খেপানোর চেষ্টা করতে লাগল ওরা।

হয়তো এক সময় আমি দাঁড়িয়ে নিজের পক্ষে কিছু বলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এর জন্য আর কোনো শক্তি ক্ষয় করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন ওরা বিরক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু ওদের মাঝে বিরক্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ওদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবো না বুঝতে পেরে ওরা সুযোগটা নিলো। ওদের অঙ্গভঙ্গি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগল।

আমি বার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করে দেখলাম। কিন্তু ওদের হাতে অফুরন্ত সময় আছে দেখে ভাবলাম ওরা সম্ভবত আমাকে অনুসরণ করতে

পারে।

“ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে যাচ্ছে।” মিয়াগি বলল চিন্তিতভাবে।

যেই মুহূর্তে কী করবো চিন্তা করছিলাম; সেই মুহূর্তে পিছন থেকে একটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম, “আরে মি. কুসুনোকি নাকি?”

কণ্ঠটা একজন পুরুষের। কেউ আমার সাথে এই স্বরে কথা বলতে পারে বলে মনে পড়ছে না। তাই আমি বেশ অবাক হয়েছি। এরপরে লোকটার কথোপকথন যে দিকে গেল সেটা আমাকে এবং মিয়াগিকে স্তব্ধ করে দিলো।

“আপনি কি আজকেও মিস. মিয়াগির সাথে আছেন নাকি?”

লোকটাকে দেখার জন্য ঘুরলাম আমি। দেখা গেল লোকটাকে আমি চিনি।

লোকটা আমার পাশের অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। মিয়াগির সাথে বাইরে যাওয়া আসার সময় আমার দিকে বিরক্তিকরভাবে তাকাতো সেই লোকটা।

লোকটার নাম শিনবাসি।

শিনবাসি ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপরে আমাকে বিরক্ত করা একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি দুঃখিত, দয়া করে কি আপনি অন্য চেয়ারে বসবেন?”

তার কথাগুলো ছিল নম্র, কিন্তু গলার স্বর ছিল কঠোর। শিনবাসির উচ্চতা ছয় ফুটের উপরে এবং লোকটার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন সে অন্যদের শাসিয়ে অভ্যস্ত। সুতরাং লোকটার কথা বলার ভঙ্গি দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেল।

শিনবাসি আমার পাশে বসে, আমার দিকে না তাকিয়ে সোজা মিয়াগির দিকে তাকাল। “আমি সবসময়ই মি. কুসুনোকির কাছে আপনার কথা শুনেছি। কিন্তু আমি নিজে কখনো আপনার সাথে কথা বলিনি। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল। আমি শিনবাসি।”

প্রচণ্ড বিস্ময়ে মিয়াগির চেহারা জমে গেল। কিন্তু শিনবাসি এমনভাবে মাথা নাড়ল যেনবা মিয়াগি তার কথার উত্তর দিয়েছে। “হ্যাঁ। একদম ঠিক। আপনি মনে করতে পেরেছেন জেনে কৃতজ্ঞ হলাম। অ্যাপার্টমেন্টে চলতি পথে আমাদের অনেকবার দেখা হয়েছে।”

এটাকে ঠিক কথোপকথন বলা যায় না। যদিও এটা নিশ্চিত শিনবাসি মিয়াগিকে আসলে দেখতে পারছে না। হয়তো লোকটা মিয়াগিকে দেখার ভান করছে, আমি ভাবলাম।

আমাকে জ্বালাতন করা লোকগুলো দেখা যাচ্ছে শিনবাসির উপস্থিতিতে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওরা তিনজন চলে যাওয়ার পরে শিনবাসি স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর উনার মুখের নম্র হাসি ছুড়ে ফেলে স্বাভাবিক গোমড়া মুখে ফিরে গেল।

“প্রথমেই বলে নেই” শিনবাসি ব্যাখ্যা করল। “মিয়াগি মেয়েটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজন নেই আমার।”

“আমি জানি। আপনি কেবলই সাহায্য করছেন, তাই না?” আমি বললাম।
“ধন্যবাদ, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।”

সে মাথা নাড়ল। “না, এটা সত্যিই তেমন কিছু না।”

“তাহলে কী?”

“আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্তত এটাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় আপনি এক প্রকার অভিনয় করছেন, মিয়াগির অস্তিত্ব সত্যি-সত্যি আছে এমনটা বিশ্বাস করিয়ে যতজনকে পারা যায় বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন। অভিনয়ের মাধ্যমে আপনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে চাইলেই সাধারণ মানুষের কাণ্ডজ্ঞানকে একটু হলেও নাড়া দেওয়া যায়। আর আপনি আমার ক্ষেত্রে কিছুটা সফল হয়েছেন।”

“আপনি বলতে চাচ্ছেন, আপনি আশপাশে মিয়াগির উপস্থিতি অনুভব করতে পারছেন?”

“আমার স্বীকার করতে ইচ্ছে করছে না তবুও আমি বিশ্বাস করি” শিনবাসি বলল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে। “আমি আসলে এই ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহী। ভাবছি যদি আমি সত্যি সত্যি মিস. মিয়াগির অস্তিত্ব মেনে নিই, যেমনটা আপনি আমাকে বাধ্য করাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত উনাকে সত্যি সত্যি দেখতে পারবো?”

“মিয়াগি” আমি বলতে শুরু করলাম, “ঠিক অতটা লম্বা নয়। আমার মতে ও অনেকটা পলকা। সচরাচর ওর চোখগুলো গম্ভীর ধরনের। কিন্তু মাঝে-মাঝে

ওর হাসিটা বিনয়ী মনে হয়। ওর চোখের জ্যোতিতে একটু সমস্যা আছে। যখন ওর ছোট অক্ষর পড়ার দরকার হয়, ও সরু ফ্রেমে গ্লাস পরে। আর সেগুলো ওকে দারুণভাবে মানিয়ে যায়। ওর চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। চুলগুলো একদম শেষের দিকে কিছুটা কোঁকড়ানো।”

“আমি জানি না কেন” শিনবাসি বলল, মাথাটা কাত করে। “আমি যেভাবে মিয়াগিকে কল্পনা করেছি এর সাথে আপনার বলা প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মিলে

গিয়েছে।”

“মিয়াগি ঠিক আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়?”

শিনবাসি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করল। “এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।”

“ও আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করতে চায়” আমি বললাম। “আপনার ডান হাত তুলে ধরুন।”

সে তাই করল। তার চেহারা দ্বিধা দেখতে পেলাম। মিয়াগি তার হাতের দিকে সানন্দে তাকিয়ে দুই হাত দিয়ে তা ধরল।

নিজের হাতকে উপরে নিচে উঠা-নামা করতে দেখে, শিনবাসি বলল, “আমি কি ধরে নিবো মিস. মিয়াগি আমার হাত নাড়াচ্ছে?”

“হ্যাঁ। আপনি ভাবছেন আপনি হাতটা নাড়াচ্ছেন, কিন্তু আসলে মিয়াগি নাড়াচ্ছে সেটা। ও মনে হচ্ছে অনেক খুশি হয়েছে।”

“আপনি কি মি. শিনবাসিকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিবেন?” মিয়াগি অনুরোধ করল।

“মিয়াগি আমাকে বলেছে ওর পক্ষ থেকে আপনাকে ‘অনেক-অনেক ধন্যবাদ’ জানাতে।” আমি বললাম।

“কিভাবে যেন আমার মনে হয়েছিল উনি এটাই বলবেন” শিনবাসি বলল বিস্মিত হয়ে।

আমাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে, মিয়াগি এবং শিনবাসি বেশ কিছু কথা আদান-প্রদান করল।

উনার নিজের টেবিলে ফিরে যাওয়ার আগে শিনবাসি আমার দিকে ফিরে বলল, “আমার কিছুটা সন্দেহ আছে যে একমাত্র আমিই মিস. মিয়াগির অস্তিত্ব টের পাচ্ছি কিনা। আমার মনে হয় সবাই সাময়িকভাবে সেটা অনুভব করেছে। কিন্তু খুব সহজে বিভ্রম বলে খারিজ করে দিয়েছে। যদি তাদের অনুভূতিটা বিভ্রম নয় বলে প্রমাণ করার সুযোগ পাওয়া যায়, মিস. মিয়াগির অস্তিত্ব খুব দ্রুত সবাই মেনে নিলে আমি বিস্মিত হবো না। অবশ্যই আমি যা বলছি তার কোনো ভিত্তি নেই। তবে আমি আশা করছি আমি সঠিক কথাই বলছি।”

শিনবাসি ঠিকই বলেছিল।

এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর কিন্তু সেই ঘটনার পরে, আমাদের চারপাশের মানুষজন মিয়াগির অস্তিত্ব মেনে নিতে শুরু করেছিল।

অবশ্যই এমন নয় যে মানুষজন সত্যি-সত্যি অদৃশ্য কারো অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছে। এটা ছিল অনেকটা এরকম যে, মানুষ আমার অর্থহীন কথাবার্তা মেনে নিয়েছে, ঠিক পারস্পারিক সম্মতি এবং একই সাথে তাল মিলিয়ে

মিয়াগির অস্তিত্ব ঠিক ‘অনুমেয় অস্তিত্ব’এর পর্যায়ে পৌঁছেনি। কিন্তু তবুও, এটা ছিল অনেক বড় পরিবর্তন।

আমরা বারে-বারে শহরের বিনোদনের জায়গাগুলোতে, হাই স্কুলের কালচারাল ফেস্টিভ্যালে এবং স্থানীয় ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত হতে লাগলাম। এতে আমি কিছুটা বিখ্যাত হয়ে গেলাম।

হাস্যরসাত্মক আনন্দ উপভোগ করার ব্যক্তি হিসাবে, আমাকে অভাগা কৌতূহলোদ্দীপক মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হলো।

আমার কাল্পনিক গার্লফ্রেন্ডের সাথে হাত মেলাতে এবং জড়িয়ে ধরতে, বেশ অনেকজন মানুষ আমাকে দেখতে এলো।

একরাতে, আমাকে এবং মিয়াগিকে শিনবাসির ঘরে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

“আমার অ্যাপার্টমেন্টে কিছুটা অ্যালকোহল আছে। বাড়িতে যাওয়ার আগে পুরোটা শেষ করতে হবে। মি. কুসুনোকি, মিস. মিয়াগি আপনারা কি আমার সাথে ড্রিন্ক করবেন?”

আমরা পাশের রুমে যেতেই দেখলাম সেখানে ইতোমধ্যে ওর আরও তিনজন বন্ধু ড্রিন্ক করছে। একজন পুরুষ, দুজন মেয়ে।

মাতালরা ইতোমধ্যে শিনবাসির কাছ থেকে আমার সম্পর্কে শুনেছে। তারা মিয়াগির ব্যাপারে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগল। আমি ওদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

“তাহলে ছোট মিয়াগি ঠিক এখানেই আছে?” লম্বা এবং কড়া মেকআপ দেওয়া সুজুমি জিজ্ঞেস করল। যে কিনা মাতালভাবে মিয়াগির হাত স্পর্শ করতে লাগল। “আপনি বলার পরে, আমার মনে হচ্ছে ও এখানেই আছে।”

সে আসলে স্পর্শ করে কিছুই অনুভব করতে পারছে না। কিন্তু তাতে মিয়াগির উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়নি।

মিয়াগি ধীরে-ধীরে সুজুমির হাত ধরল।

আসাকুরা যে কিনা দ্রুত চিন্তা করতে পারে, অসঙ্গতি খুঁজে বের করার চেষ্টায় মিয়াগির ব্যাপারে আমার কাছে কিছু প্রশ্ন করল।

কিন্তু যেভাবে সবকিছু খাপে খাপে মিলে গিয়েছে; তাতে তার কাছে জিনিসটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগল। এবং সে অদ্ভুত কাজ-কারবার করা শুরু করল। যেমন সে যে কুশনটা ব্যবহার করছিল সেটা মিয়াগি যেখানে ছিল সেখানে ছুড়ে দিলো, মিয়াগির দিকে এক গ্লাস অ্যালকোহল এগিয়ে দিলো।

“আমি এরকম মেয়ে পছন্দ করি” আসাকুরা বলল। “মিস. মিয়াগিকে আমি দেখতে পারছি না এক হিসাবে সেটা ভালোই হয়েছে, না হলে আমি ওর প্রেমে পড়ে যেতাম।”

“কোনো লাভ নেই। মিয়াগি আমাকে পছন্দ করে।”

“এভাবে সবাইকে বলে বেড়াবেন না তো” মিয়াগি বলল, আমাকে কুশন দিয়ে আঘাত করে।

রিকো, ছোটখাটো সুশ্রী চেহারার মেয়েটা সবচেয়ে বেশি মাতাল ছিল। মেঝেতে শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জড়ানো কণ্ঠে বলল, “মিস্টার... কুসুনোকি, মিস্টার... কুসুনোকি, আপনি মিস. মিয়াগিকে কতটুকু ভালোবাসেন আমাদের দেখান তো!”

“আমিও দেখতে চাই” সুজুমি সম্মতি দিলো। শিনবাসি এবং আসাকুরা আমার দিকে প্রত্যাশার চাহনী দিলো।

“মিয়াগি?” আমি ডাকলাম।

“হ্যাঁ?”

আমি মিয়াগির হালকা লালছে গালে চুমু দিলাম। মাতালরা আমাকে হর্ষধ্বনি দিলো।

কী রকম হাস্যকর একটা কাজ করেছি চিন্তা করে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। এখানকার একজন মানুষও সত্যিকারভাবে মিয়াগির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। ওরা নিশ্চয় আমাকে পাগল, সুখী গর্দভ ভাবছে।

কিন্তু এতে ভুল কী আছে?

সে গ্রীষ্মে আমি ছিলাম শহরের সেরা ভাঁড়। ভালো কিংবা খারাপ অর্থে।

এরপরে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন রৌদ্রোজ্জ্বল বিকালে আমার ডোরবেল বেজে উঠলে আমি শিনবাসির কণ্ঠ শুনতে পেলাম। দরজা খোলার পরে, সে আমার দিকে কিছু একটা ছুড়ে দিলো। ওটা ছিল আসলে গাড়ির চাবি।

“আমি বাড়িতে যাচ্ছি” শিনবাসি বলল। “আপাতত কয়েকদিন গাড়িটা লাগবে না। আপনি চাইলে গাড়িটা ধার নিতে পারেন। মিস. মিয়াগির সাথে

পাহাড় কিংবা সমুদ্র তীরে ঘুরে আসলে কেমন হয়?”

আমি তাকে বারবার ধন্যবাদ জানালাম। চলে যাওয়ার আগে শিনবাসি আমাকে বলল,

“জানেন, আমি কিছুতেই মানতে পারছি না আপনি মিথ্যা বলছেন। আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না মিস. মিয়াগি মূক অভিনয়ের গালগল্প। হয়তো কোনো এক ঘটনাচক্রে আপনি এমন একটা পৃথিবী দেখতে পান; যা আমরা দেখি না। আবার এমনও হতে পারে আমাদের এই পৃথিবীতে সত্যি-সত্যি যা কিছু রয়েছে এটা তার একটা অংশ। আমাদের শুধুমাত্র এইটুকু দেখার অনুমতি আছে।”

উনাকে বাসে চড়ে চলে যেতে দেখে, মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। সবসময়ের মতো, সূর্য কিরণ দিচ্ছে। বাতাসে শরতের ক্ষীণ আভাস পেলাম।

গ্রীষ্মের শেষ ঘোষণা করে ঘুরুরে পোকা একযোগে ডাকতে লাগল।

রাতে, বিছানায় আমি মিয়াগির পাশে ঘুমালাম। মাঝের বর্ডারটা কিভাবে কিভাবে যেন বিলীন হয়ে গেল। মিয়াগি আমার দিকে মুখ করে ঘুমাচ্ছে। বাচ্চার মতো শান্তিপূর্ণ, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ও। ঘুমের মাঝে আমি ওর মুখে আদর করতে লাগলাম। কাজটা করতে কখনই বিরক্ত কিংবা ক্লান্ত হই না।

আমি সাবধানে বিছানা ছাড়লাম, যাতে ওর ঘুম না ভেঙে যায়। রান্নাঘর থেকে পানি পান করলাম। যখন আমার রুমে ফিরে এলাম, ড্রেসিং রুমের দরজার সামনে একটা স্কেচবুক পড়ে থাকতে দেখলাম।

ওটা তুললাম, সিংকের পাশের লাইটটা জ্বালিয়ে ধীরে-ধীরে প্রথম পাতা খুললাম।

আমার প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি কিছুই ছিল সেখানে।

স্টেশনের ওয়েটিং রুম। নারসের সাথে দেখা করার সেই রেস্টুরেন্ট। টাইম ক্যাপসুল পুঁতে রাখা সেই এলিমেন্টারি স্কুল। আমার এবং হিমেনোর গোপন আস্তানা। হাজার খানেক পেপার ক্রেনে প্লাবিত রুম। পুরাতন লাইব্রেরি। আমার ফেস্টিভ্যালের জাঁকজমক। হিমেনোর সাথে দেখা করার আগের দিন যে নদীর তীরে আমরা হেঁটেছিলাম। অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম। আমরা যে কমিউনিটি সেন্টারে থেকেছিলাম। কাব, ক্যান্ডির দোকান, ভেন্ডিং মেশিন, পাবলিক ফোন, তারা খচিত হৃদ, পুরাতন বইয়ের দোকান, সোয়ান বোট, ফেরিস হুইল।

এবং ঘুমানো আমি।

আমি একটা নতুন পাতা উলটিয়ে তাতে মিয়াগি ঘুমিয়ে থাকার ছবি আঁকা শুরু করলাম।

প্রায় অনেক বছর হয়েছে আমি টানা ছবি আঁকিনি।

আঁকাআঁকি, যা কিনা আমি শুধুই হতাশা হিসাবে ধরে নিয়েছিলাম।

যখন আমি সম্পূর্ণ হওয়া ড্রয়িংয়ের দিকে তাকালাম, আমি বিস্মিতভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু কিছু একটা ভুল করার ছোট অনুভূতি মনকে খোঁচাতে লাগল।

খুব সহজে উপেক্ষা করা যায়। এতই ছোট একটা ভুল যে আমিও ক্ষণিকের জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম।

আমি এটাকে উপেক্ষা করে যেতে পারতাম। স্কেচবুক বন্ধ করে মিয়াগির বিছানার পাশে রেখে, সুখীভাবে সকালে ওর প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা করে ঘুমাতে পারতাম।

আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলাম। ভুল খুঁজে পাওয়ার জন্য আমার ইন্দ্রিয়শক্তির উপর জোর দিলাম।

অন্ধকার, ঝড়ো সমুদ্রে ভেসে বেড়ানোর অন্ধরের মতো আমি ভুলটা খুঁজে চলেছি। সেটাকে ধরতে যেতেই আমার হাত ফস্কে পড়ে যেতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে আমি যখন পরাজয় বরণ করে হাত সরিয়ে নিলাম। সেটা ঠিক আমার হাতের তালুতে এসে পড়ল।

আমি খুব-খুব সতর্কতার সাথে সেটাকে পানি থেকে তুললাম, এবং হঠাৎ, আমি বুঝতে পারলাম।

পরমুহূর্তে, যেন আমি আবিষ্ট হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পেন্সিলটা স্কেচবুকে ঘোরাতে লাগলাম।

সারারাত ধরে কাজটা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

কয়েকদিন পরে, আমি মিয়াগিকে আতশবাজি দেখাতে নিয়ে গেলাম। অস্তগত সূর্য আর ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে, রেইলরোড পার হয়ে, শপিং ডিস্ট্রিক পাশ কাটিয়ে, আমরা এলিমেন্টারি স্কুলে পৌঁছালাম।

এটা ছিল স্থানীয় বিখ্যাত আতশবাজি প্রদর্শন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান এত বিশাল হবে যা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। এত বেশি অতিথি ছিল যে, আমি চিন্তা করতে লাগলাম; শহরে এত লোকের থাকার জায়গা এলো কোথা থেকে।

বাচ্চারা যখন আমাকে মিয়াগির হাত ধরে হাঁটতে দেখল, তারা হাসতে

হাসতে বলল, “আরে এটা কি মি. কুসুনোকি নাকি?”

তাদের হাসিটা ছিল অনুমোদনের। মিয়াগির ধরে থাকা হাতটা উঁচু করলাম ওদের বিদ্রোপের জবাব হিসাবে।

আমি যখন গ্রিলড চিকেনের জন্য লাইনে দাঁড়ালাম, হাই স্কুলের একদল ছেলে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে উত্থাপিত করতে লাগল, “দারুণ একটা মেয়ে বাগিয়েছেন আপনি!”

“দারুণ, তাই না? কিন্তু তোমরা ওকে পাবে না” আমি বললাম, মিয়াগির কাঁধ ধরে। ওরা অউহাসিতে ফেটে পড়ল।

ব্যাপারটা দেখে আমি খুশি হলাম। এমনকি যদিও তারা আমার কথা বিশ্বাস করেনি, তবুও সবাই আমার “মিয়াগি ঠিক এখানেই আছে” অর্থহীন কথাটা বিশ্বাস করল।

কোনো গার্লফ্রেন্ড না থাকার চেয়ে বরং কাল্পনিক গার্লফ্রেন্ড আছে মনে করাটাই বেশি ভালো।

একটু পরে ঘোষণা এলো শো শুরু হতে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরে, প্রথম আতশবাজিটা আকাশের দিকে উড়ে গেল। কমলা আলোতে আকাশ ছেয়ে গেল। জনতা উল্লাস করে উঠল। এবং দেরি করে আসা শব্দে বাতাস প্রকম্পিত হয়ে গেল।

অনেকদিন হলো এত কাছ থেকে আতশবাজি দেখেছি। আমার প্রত্যাশার তুলনায়, এগুলো ছিল অনেক বড়, অনেক বেশি রঙিন, এবং খুব দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।

আমি এও ভুলে গিয়েছি যে বড় আতশবাজি ছড়িয়ে পড়তে কয়েক মিনিট সময় লাগে। কল্পনাও করতে পারিনি বিস্ফোরণের শব্দ পাকস্থলিতে কী রকম প্রতিধ্বনি করতে পারে।

কয়েক ডজন আতশবাজি আকাশে উড়ে গেল। একা-একা থাকার জন্য আমরা একটা বিন্ডিংয়ের পিছনে শুয়ে আতশবাজি দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ, মিয়াগির মুখের দিকে চুপিসারে দেখতে ইচ্ছে হলো। আকাশে আলো ছড়িয়ে পড়তেই আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে মনে হলো মিয়াগি’ও একই চিন্তা করছে। আমাদের চোখ মিলিত হলো।

“জুটি হিসাবে আমরা বেশ ভালো” আমি হেসে বললাম। “এটা আগেও ঘটেছে, বিছানায়।”

“ঘটেছে তো ঘটেছে” মিয়াগি লাজুকভাবে হেসে বলল। “আপনি আমাকে যখন খুশি তখন দেখতে পারবেন, মি. কুসুনোকি। এখন আপনার উচিত আতশবাজি দেখা।”

“আপাতত সেটা নাও ঘটতে পারে।”

হয়তো আমার টাইমিং আরও ভালো হতে পারতো।

আমি আতশবাজি দেখতে দেখতে কথাটা বলতে পারতাম।

“আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার আগামীকাল ছুটি। কিন্তু আমি পরের দিনই চলে আসবো। গতবারের মতো দু’দিন না, একদিন পরেই আসবো আমি।”

“সেটা সমস্যা না।”

“তাহলে কী সমস্যা?”

“...মিয়াগি। আমি এখন শহরে বেশ খানিকটা জনপ্রিয়। অর্ধেক লোক আমার দিকে টিটকারির হাসি দেয়। কিন্তু বাকি অর্ধেক লোক আমাকে পছন্দের হাসি দেয়। যে কোনো প্রকারের হাসিই হোক না কেন, আমি এই নিয়ে গর্বিত আমি নিশ্চিত ভালো কিছু ঘটবে।”

আমি উঠে বসলাম। হাত মাটিতে রেখে মিয়াগির দিকে নিচু হয়ে তাকালাম।

“আমি যখন এলিমেন্টারি স্কুলে ছিলাম, একটা ছেলে ছিল যাকে আমি ঘৃণা করতাম। ছেলেটা সত্যিই স্মার্ট ছিল। কিন্তু সে সেটা লুকিয়ে রেখেছিল এবং বোকার মতো আচরণ করতো; যেন মানুষ ওকে পছন্দ করে। ইদানীং আমি বুঝতে পেরেছি। আমি ওর প্রতি হিংসা না করে পারছি না। আমার মনে হয় ও প্রথম থেকেই যা করে আসছিল আমি সেটাই করতে চাইতাম। তোমাকে ধন্যবাদ মিয়াগি, সেটা সম্ভব হয়েছে। আমি মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে পেরেছি।”

“এটা কি ভালো না?” মিয়াগি নিজেও উঠে একইভাবে বসলো। “...আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?”

“সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ” আমি বললাম। “আমি সত্যিই জানি না এছাড়া আর কী বলা যায়।”

“আর সবকিছু বলতে?” মিয়াগি প্রশ্ন করল। “আপনার এখনো এক মাস বাকি আছে। ‘সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ’ বলার জন্য একটু তাড়াতাড়িই হয়ে গেল না।”

“আসলে, মিয়াগি? তুমি বলেছিলে তুমি আমার ইচ্ছা জানতে চাও। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ভেবে তোমাকে জানাবো।”

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো।

“হ্যাঁ, আমার সাধের মধ্যে যা থাকে সব করবো।”

“ঠিক আছে তাহলে। আমি তোমার সাথে সত্যি কথাই বলবো। আমি মারা গেলে, আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেও। এটাই আমার ছোট্ট ইচ্ছা।”

“না।”

ওর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পরে, মনে হলো মিয়াগি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে।

ও বুঝতে পারলো কালকে আমি কি করতে যাচ্ছি।

“...উম, মি. কুসুনোকি। আমি জানি আপনি আমার কথা শুনবেন না। কিন্তু দয়া করে উল্টাপাল্টা কিছু করবেন না। আমি আপনার কাছে হাতজোড় করছি।”

আমি মাথা নাড়লাম।

“ভেবে দেখ। মাত্র ত্রিশ ইয়েন মূল্যের আমার জীবনটা শেষ দিনগুলোকে এতটা চমৎকার হবে কে ভেবেছিল? সম্ভবত কেউ ভাবেনি। মূল্য নির্ধারণ কিংবা যেটাই তোমরা দেখ না কেন; সেটা দেখে, এমনকি তুমিও কোনো পূর্বাভাস পাওনি। কল্পনারও বাইরে বাজে জীবন কাটানো উচিত ছিল আমার, কিন্তু আমি দারুণ কিছু সুখের মুহূর্তের দেখা পেয়েছি। তোমার ভবিষ্যৎ একদম অনিশ্চিত মিয়াগি। হয়তো উপযুক্ত কেউ তোমার জীবনে আসবে এবং তোমাকে এর চেয়েও বেশি সুখী করবে।”

“কেউ আমাকে সুখী করতে পারবে না।”

“কিন্তু তোমারও আমার জীবনে আসার কথা ছিল না, মিয়াগি। তো সুতরাং...”

“কেউ আমাকে সুখী করতে পারবে না।”

কোনো উত্তর দেয়ার সুযোগ না দিয়েই, মিয়াগি আমাকে মাটিতে ফেলে দিলো।

আমি শুয়ে পড়তেই, ও আমার হাতের ভিতরে নিজেকে লুকালো।

“...মি. কুসুনোকি, আমি আপনার কাছে হাতজোড় করছি।”

এই প্রথমবারের মতো আমি ওকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে কথা বলতে দেখলাম। “আমি আপনার কাছে হাতজোড় করছি, অন্তত শেষ মাসটা আপনি আমার সাথে থাকে থাকুন। আমি বাকি সবকিছু সহ্য করতে পারবো। আপনি খুব দ্রুতই মারা

যাবেন, আমার ছুটির দিনগুলোতে আপনাকে দেখতে পারবো না, আমাদের হাত ধরা অন্য কেউ দেখতে পারবে না, আমাকে আরও ত্রিশ বছর একা-একা থাকতে হবে। সবকিছুই আমি সহ্য করে নিতে পারবো। কিন্তু অন্তত যতক্ষণ আপনি আমার সাথে আছেন, নিজেকে বিলিয়ে দিবেন না। আমি আপনার কাছে হাতজোড় করছি।”

ও আমার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে মিয়াগি এবং আমি হাত ধরাধরি করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

শেষ মুহূর্তের জন্যও ওর কান্না থামেনি।

মাঝরাতে মিয়াগি অ্যাপার্টমেন্টে ছেড়ে চলে গেল।

সামনের দরজায় আমরা দু’জন দু’জনকে আবারো জড়িয়ে ধরলাম। আমাকে বিষণ্ণ হাসি এবং অনুতাপের আভাস দিয়ে ও চলে গেল।

“বিদায়। আপনি আমাকে সুখী করেছেন।”

এটা বলেই, ও আমাকে দিকে বো করে ঘুরে চলে গেল।

ও ধীরে-ধীরে হারিয়ে গেল জ্যোৎস্নারাতে।

পরেরদিন সকালে, আমার বিকল্প অবজার্ভারকে সাথে নিয়ে সেই পুরাতন বিন্ডিংয়ে গেলাম।

যেখানে মিয়াগি এবং আমার প্রথম দেখা হয়েছিল।

সেখানে, আমি আমার ত্রিশ দিন বিক্রি করে দিলাম।

সত্যি বলতে, আমি সম্পূর্ণটাই বিক্রি করে দিতাম। কিন্তু ওরা শেষ তিন দিন বিক্রি করতে দেয়নি।

পর্যবেক্ষক ফলাফলের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় হয়ে গেল।

“আপনি কি ফলাফল জেনেই এখানে এসেছিলেন নাকি?”

“হ্যাঁ।” আমি উত্তর দিলাম।

কাউন্টারের ত্রিশোর্ধ্ব মহিলা আমার দিকে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল।

“আমি সত্যিই আপনাকে এটা করতে উৎসাহিত করবো না। এই অবস্থায়, টাকা কোনো বিষয় হতে পারে না, পারে নাকি? দিন শেষে... পরবর্তী ত্রিশ দিনে, আপনি এমন একটা ছবি আঁকতে যাচ্ছিলেন যেটা কয়েক বছর পর টেক্সট বইয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতো।”

মহিলাটি হাতে ধরে রাখা স্কেচ বুকটার দিকে তাকিয়ে রইল

“খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনি যদি এটা না করেন, তাহলে একান্তভাবে ছবি আঁকার জন্য আপনি ত্রিশ দিন পাবেন। এই সময়ে, আপনার পর্যবেক্ষক আপনার পাশে থাকবে। আপনাকে সাহস যোগাবে। ও কিছুতেই আপনার বেছে নেওয়াটাকে দোষ দিবে না। আপনার মৃত্যুর পরে, আপনার নাম আর্টের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। আপনার তো এসব জানার কথা, তাই না?...কি জন্য আপনি এত অসন্তুষ্ট? আমি বুঝতে পারছি না।”

“আমার মৃত্যুর পরে টাকা যেমন অর্থহীন ঠিক তেমনি খ্যাতিও অর্থহীন।”

“আপনারা কি অমর হতে চান না?”

“এমনকি আমি-বিহীন এই পৃথিবীতে অমর হলেও, খুশি হওয়ার কিছু নেই”
আমি বললাম।

“পৃথিবীর সবচেয়ে মূসণ ছবি।”

আমার ছবিগুলো সম্পর্কে এটাই বলা হতো। যদিও এটা বেশ বিতর্ক ছড়াতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগুলো সবচেয়ে বেশি দামে বিকোতো।

তবে যেহেতু আমি ত্রিশ দিন বিক্রি করে দিয়েছি, এটা এখন আর “সম্ভাবনা না, বরং এখন এটা এমন একটা ঘটনা যা কখনো ঘটেনি।”

আমি এটাই ভেবে নিয়েছি। হয়তো আমার একদম আসল জীবনে, অনেক বছর পরে আমার আঁকাআঁকির ক্ষমতা ধীরে-ধীরে প্রস্ফুটিত হতো। আর সেটা হবার আগেই, বাইক এক্সিডেন্টের কারণে আমার সে সুযোগটা হারানোর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আয়ুষ্কাল বিক্রির পরে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মিয়াকিকে পাওয়ার পরে, যে বিপুল পরিমাণ সময় আমি পাইনি যেটা কমে চরম আকারে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আমার আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার আগে অন্তত আমার প্রতিভার বিকাশ ঘটতো, সেজন্য ধন্যবাদ

আমি এটাই ভেবেছিলাম।

আমি আঁকাআঁকিতে বেশ দক্ষ ছিলাম।

আমার সামনের যে কোনো দৃশ্য আমি হুবুহু নকল করতে পারতাম। যেন তেমন কোনো ব্যাপারই না বিষয়টা। যে কোনো দৃশ্য এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে রূপান্তর করার জন্য বিচারবুদ্ধিকে খুব সহজে প্রয়োগ করতে ওস্তাদ ছিলাম আমি। আর এজন্য কেউ আমাকে কিছু শেখানোর কোনো প্রয়োজন

পড়েনি।

গ্যালারিতে আমি পেইন্টিংয়ের দিকে তাকিয়েই খুব সহজে বুঝতে পারতাম। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে মূল ভাষা থেকে সম্পূর্ণ অন্য ভাষাতে। কেন “কোন কিছু ওভাবে আঁকা হয়নি” কেন “কোনো কিছু এভাবে আঁকা হয়েছে” এসব আরকি। আমার কোনো কিছুর প্রতি দেখার ভঙ্গি যে একদম ঠিক ছিল তা না। আসল ঘটনা হচ্ছে কোনো কিছু মনে করার ক্ষেত্রে আমার দারুণ প্রতিভা ছিল।

সতেরো বছর বয়সের এক শীতে, আমি আঁকাআঁকি ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম আমি যেভাবে চালিয়ে নিচ্ছিলাম, সেভাবে হিমেনোকে করা প্রতিজ্ঞার মতো বিখ্যাত হতে পারবো না। আমি আরও বেশি সফল হলে “সকল কাজের কাজি” ধরনের শিল্পী হতে পারবো।

যদিও অনেকের চোখে এটাও বিবেচনাযোগ্য সাফল্য হতে পারতো। কিন্তু হিমেনোর প্রতি আমার প্রতিজ্ঞা রাখার জন্য আমাকে অনেক বেশি অসাধারণ হতে হতো। আমার অমূল পরিবর্তন দরকার ছিল। যেন আমি মুহূর্তের উপর নির্ভর করে আঁকার জন্য নিজের উপর নির্ভর না করি।

পরেরবার আমি যখন পেইন্ট ব্রাশ হাতে তুলে নিবো সবকিছুই আমার নিজ থেকে আসতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্য সবাই যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে; সেটা বাদ নিয়ে ভিন্নভাবে জগতটা আয়ত্বে আনতে না পারছি, আমি আঁকাআঁকি করবো না। এটাই ছিল আমার সিদ্ধান্ত।

হয়তোবা সিদ্ধান্তটায় কোনোভুল ছিল না। কিন্তু আমার বয়স উনিশ হওয়ার গ্রীষ্মে, তখনো দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না। তো হাতে সময় কম বিধায়, আমি আবারো ব্রাশ তুলে নিলাম।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি বুঝে গেলাম যে আঁকাআঁকির জন্য একদম উপযুক্ত সময় তখনো আসেনি।

ফলশ্রুতিতে, আমি আঁকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম। আমি এমনকি একটা আপেলও সঠিকভাবে আঁকতে পারছিলাম না। যখন কোনো কিছু আঁকার চিন্তা করতে লাগলাম, নিদারুণ দ্বিধায় ভুগতাম আমি। মনে হতো যেন আমি চিৎকার দিয়ে উঠবো।

রাতে শূন্যে হাঁটার মতো দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হলাম আমি। কোন লাইন এবং কোন রং প্রয়োজন সে সম্পর্কে কোনো প্রকার বিচারবুদ্ধি রইল না।

আমি বুঝতে পারলাম আমি আমার প্রতিভা হারিয়ে ফেলেছি। তার উপরে,

সেটা ফিরে পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। একদম প্রথম থেকে শুরু করার জন্য খুব বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে। আমি ব্রাশ তুলে রাখলাম, প্রতিযোগিতা থেকে পালিয়ে এলাম, এবং নিজেকে আবদ্ধ করে ফেললাম।

এক সময়, বাকি সবার দ্বারা আমার আর্ট অনুমোদিত হওয়ার জন্য এতটা মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার মনে হয় এটাই আমার দ্বিধার প্রথম কারণ।

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ছিল মারাত্মক ভুল। যখন ভুলটা একদম চরম পর্যায়ে পৌঁছাল; তখন আর আঁকার পরিস্থিতি রইল না।

সার্বজনীনত্ব মানুষের অনুকূলে নিয়ে আসে না। আপনি যা চান তাই পাবেন; যদি সেটার একদম গভীরে যেতে পারেন। তারপরে কিছু ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য পরিশ্রম করেন, এবং এমন কিছু সৃষ্টি করেন যা এক নজরে আলাদা কিছু বলে মনে হয়।

সেটা লক্ষ্য করার জন্য আমার সব চিন্তা-ভাবনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন ছিল। এবং শুধু আনন্দের জন্য, আমার নিজেরও আঁকার প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে মিয়াগি আমাকে সে সুযোগটা করে দিয়েছে। ওকে “বিষয়” হিসাবে ব্যবহার করে, আমি আগে যা “আঁকাআঁকি” বলে মনে করতাম; সেটা থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম কিছু আঁকলাম।

এরপরে, সারারাত আমি প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকে কাটলাম। যেটা কিনা আমি পাঁচ বছর বয়স থেকে প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে দেখতাম।

যে জগতে আমি বসবাস করতে চাইতাম, সে স্মৃতি কখনই আমার হওয়া সম্ভব ছিল না এবং এমন কোনো জায়গা যেখানে আমি কখনই যাইনি, এমন কিছু দিন যা অতীত কিংবা ভবিষ্যতের কোনো একদিন হতে পারে।

আমি আগে বুঝতে পারিনি, কিন্তু অনেকদিন ধরেই সেগুলো জমে ছিল। মিয়াগির ছবি আঁকার পরে, আমি বুঝতে পারলাম কিভাবে সেগুলো প্রকাশ করতে হবে।

হয়তো আমি এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যদিও সেটা আমার মৃত্যুর মাত্র অল্প কিছুদিন আগে। অবশেষে আমার প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে।

আমার মূল্য নির্ধারণ করা মহিলার কথা অনুযায়ী, শেষ ত্রিশ দিনে আমি যে ছবিটা আঁকতাম সেটা “এমনকি ডি চিরিকো ও খুব বেশি আবেগ তাড়িত বলে বিবেচনা করতেন।”

একমাত্র এই ব্যাখ্যাটাই দিলেন তিনি।

হ্যাঁ, শুনে মনে হচ্ছে আমি এরকম কিছু করতেই পারি।

যে দিনগুলোতে আমি আঁকাআঁকি করে ইতিহাসের ছোট কণ্ঠারে আমার নাম লেখাতে পারতাম, জীবনের সে অংশটুকু বিক্রি করে যে অসম্ভব মূল্য পেলাম, সেটা দেখে চোখ কপালে উঠে গেল।

মাত্র ত্রিশ দিনেই, আমি মিয়াগির ঋণ মওকুফের জন্য অল্প কিছু বাদে বাকিটা দেওয়ার মতো টাকা পেয়ে গেলাম। তবুও, ওকে আরও তিন বছর কাজ করতে হবে।

“ত্রিশ বছর থেকে ত্রিশ দিন বেশি মূল্যবান, হুহ?” আমরা আলাদা হয়ে যাওয়ার সময় পর্যবেক্ষক বলল।

এবং এভাবেই আমি অমরত্ব কে অস্বীকার করলাম।

সেই গ্রীষ্মে হিমেনো যা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল সেটার খুব কাছে চলে এলাম।

যদিও ওর ভবিষ্যৎবাণীতে অর্ধেক ভুল ছিল।

শেষ মুহূর্তে আমি ধনীও হইনি, কিংবা বিখ্যাত কেউ হইনি।

কিন্তু ওর ভবিষ্যৎবাণী অর্ধেক সত্যি হয়েছিল।

“সত্যিই ভালো কিছু” ঘটেছে। এবং যেমনটা ও বলেছিল, একদম অন্তরের অন্তস্থল থেকে, আমি “বেঁচে ছিলাম” বলে কৃতজ্ঞ।

চ্যাপ্টার ১৫ : দ্য গিফট অভ দ্য ম্যাজাই

এটা ছিল শেষ তিন দিনের প্রথম দিনের সকাল।

আমার উপরে আর কোনো পর্যবেক্ষকের চোখ থাকবে না।

সুতরাং, মিয়াগি ও চলে গিয়েছে।

কিভাবে শেষ তিনদিন কাটানো যায় সেই বিষয়ে কিছুক্ষণ আগে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। সকালে নোটবুকের কাজটা শেষ করে ফেললাম।

গতকালের ঘটনাগুলো লেখা শেষ হয়ে গেলে কলম তুলে রেখে কয়েক ঘণ্টা ঘুমালাম।

ঘুম থেকে উঠে, ধূমপান করার জন্য বাইরে গেলাম। তারপরে একটা ভেন্ডিং মেশিন থেকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সিডার কিনে আনলাম।

আমি বিছানার দিকে তাকালাম।

একশ' সাতাশি ইয়েন। আমার একমাত্র সম্বল। আর এর মধ্যে ষাট ইয়েন হচ্ছে ১ ইয়েনের কয়েন।

তিনবার গুণলাম আমি। তিনবারই একশ' সাতাশি ইয়েন হলো।

অদ্ভুত মিল বুঝতে পেরে, আমার চিবুক জ্বালা করতে লাগল। তিন দিন এগুলো দিয়ে কাটানো একপ্রকার অনিশ্চিত বলে মনে হলো; তার পরেও এখন পর্যন্ত আমি এই পরিস্থিতি বেশ ভালোই উপভোগ করছি।

নোটবুকে তাকিয়ে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারিত যোগ করে কাবে উঠে পড়লাম এবং মিয়াগির সাথে যেসব জায়গায় গিয়েছিলাম সেসব জায়গায় ঘুরতে লাগলাম। এবার আমি সত্যিই একা ছিলাম।

নীল আকাশের নিচ দিয়ে কাব চালিয়ে গেলাম আমি যেন সেখানে মিয়াগির ঘ্রাণ রয়ে গিয়েছে।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে মিয়াগি কি কাউকে পর্যবেক্ষণ করছে?

প্রার্থনা করি ওরা হতাশ হয়ে যেন মিয়াগিকে আক্রমণ না করে বসে।

প্রার্থনা করি মিয়াগি যেন ওর ঋণ পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত কাজ করে

যেতে পারে। এবং আমাকে ভুলে গিয়ে সুখী জীবনযাপন করতে পারে।

প্রার্থনা করি আমার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাউকে যেন মিয়াগি খুঁজে পায়। সে-ও যেন মিয়াগিকে আমার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারে।

পার্ক হেঁটে যাওয়ার সময়, বাচ্চারা আমার দিকে হাত নাড়ল। হঠাৎ আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল, আমি ভান করতে লাগলাম যেন মিয়াগি আমার সাথেই আছে।

আমি হাত বের করে কাল্পনিক মিয়াগির হাতে হাত রেখে বললাম, “দেখো, মিয়াগি!”

সবার জন্য এটাই খুব স্বাভাবিক। “আহ, সেই গর্দভ কুসুনোকি ওর কাল্পনিক গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।”

কিন্তু এটা আমার জন্য অন্যরকম ছিল। সত্যি বলতে, একটুও মিল ছিল না বললেই চলে।

নিজের সাথে এরকম করতে গিয়ে, আমাকে এতটাই বিষণ্ণতা চেপে ধরল যে, আমি কোনোমতে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিয়াগির অনুপস্থিত আগের চেয়েও বেশি বুঝতে পারলাম।

আমার একটা তত্ত্ব আছে।

যদি একদম শুরু থেকে পুরোটাই আমার বিভ্রম হয়ে থাকে?

আমি প্রায় নিশ্চিত আমার জীবন তিনদিন পরে শেষ হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছি আমার জীবনের একটা অংশ খরচ করা হয়ে গিয়েছে। এই অনুভূতিটা মিথ্যা হতে পারে না।

কিন্তু মিয়াগি নামের মেয়েটার অস্তিত্ব কি সত্যি আছে? শুধু ওর অস্তিত্বই না, আয়ুষ্কাল নিয়ে লেনদেন করা দোকানের অস্তিত্ব কি আসলেই আছে? নাকি আমার মৃত্যু সন্নিহিতে বুঝতে পেরে নিজেই এসব কল্পনা করে নিয়েছি?

আমার পক্ষে এখন আর এসব জানার কোনো উপায় নেই।

আমি একটা ফোয়ারার কিনারে মাথা নিচু করে বসে ছিলাম। মিডেল স্কুল পড়-য়া একটা ছেলে আর একটা মেয়ের ডাকে মাথা তুললাম। ওরা নিষ্পাপ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “মি. কুসুনোকি, মিস. মিয়াগি কেমন আছে?”

“মিয়াগি আর আমার সাথে নেই” আমি বললাম।

মেয়েটা বিস্ময়ে মুখে হাত চাপা দিলো।

“কী বলেন? কী হয়েছে? আপনারা কি ঝগড়া করেছেন?”

“ওরকমই কিছু একটা। তোমরা দুজনও কি ঝগড়া করো না?”

ওরা দুজনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।
“আসলে, আমি জানি না... এমনকি মি. কুসুনোকি আর মিস. মিয়াগিও তর্ক করে নাকি?”

“যদি তোমরা দুজনে এত ভালোভাবে মিলেমিশে থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া করতে পারো তাহলে আমরাও যে এরকম করবো না, তা কী করে হয়।”

আমি বলতে চেয়েছিলাম “জানো, এটাই সত্যি।” কিন্তু শব্দটা বের হলো না।

কিছু বুঝে উঠার আগেই আমি বাঁধ ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়লাম। যতই আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, মিয়াগি আমার পাশে বসে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে; ততই অশ্রু ঝরতে লাগল আমার।

ওরা দুজনে আমার পাশে বসে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল।

তার পরে আশ্চর্যজনকভাবে, আমি দেখতে পেলাম, আমি যা ভেবেছিলাম এরচেয়েও বেশি লোক আমার সম্পর্কে জানে।

সকল বয়সের লোকজন আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখতে লাগল যেন তারা বলতে চাচ্ছে “কুসুনোকি নতুন কিছু একটা করছে।”

শিনবাসির বন্ধু সুজুমি এবং আশাকুরাও ওখানে ছিল। ‘কী হয়েছে?’ সুজুমি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

কিভাবে উত্তর দিবো আমি বুঝতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি ওদের বললাম আমি আর মিয়াগি ঝগড়া করেছি। আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। আমি একটা গল্প বানালাম, কিভাবে ও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং আমাকে পরিত্যাগ করেছে।

“মিয়াগি হয়তো কুসুনোকিকে পছন্দ করতো না?” একটা তীক্ষ্ণ চোখের হাই স্কুলের মেয়ে রেগেমেগে বলল। ও এমনভাবে কথা বলছিল যেন সে সত্যি সত্যি ও মিয়াগির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

“এরকম কিছু কেন ঘটল?” ওর পাশের একজন লোক জিজ্ঞেস করল। আমি লোকটাকে চিনতে পারলাম।

ঠিক। লোকটি ছিল ফটো স্টুডিও’র মালিক। মিয়াগির অস্তিত্বে স্বীকৃতি দেয়া প্রথম ব্যক্তি উনি।

“মেয়েটাকে তো এরকম নিষ্ঠুর মনে হয়নি?”

“এর মানে কি ও একেবারেই চলে গিয়েছে?” সুজুমি জিজ্ঞেস করল।

ট্যাংক-টপ পরা একজন যুবক আমাকে বলল পেছনে মৃদু থাপ্পড় দিয়ে,
“মিয়াগি মেয়েটা কোনো কাজের না। এরকম একটা ছেলেকে ধোঁকা দিয়েছে ও!”

আমি ছেলেটার দিকে ঘুরলাম কিছু বলার জন্য, কিন্তু মুখ দিয়ে কিছুই বের
হলো না।

...ঠিক তখনই, পেছন থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো।

“অবশ্যই। যেখানে উনি একজন ভালো মানুষ।”

আমি কণ্ঠটা চিনতে পারলাম। এক দুই দিনে কিছুতেই কণ্ঠটা ভুলবো না।

কণ্ঠটা ভুলতে আমার ত্রিশ বছর, তিনশ’ বছর, তিন হাজার বছর লাগবে।

কণ্ঠটা যে দিক থেকে এসেছিল আমি সেদিকে ঘুরলাম।

আমার কিছুতেই ভুল শোনার কথা না।

কিন্তু নিজ চোখে দেখার আগ পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করবো না।

ও মুখ টিপে হাসতে লাগল।

“সেই মিয়াগি মেয়েটা সত্যিই কোনো কাজের না।”

মিয়াগি ওর হাত আমার গলায় রেখে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

“আমি ফিরে এসেছি মি. কুসুনোকি। আমি আপনার খোঁজ করছিলাম।”

আমি সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ওকে পাল্টা জড়িয়ে ধরে ওর চুলের
ঘ্রাণ নিতে লাগলাম। এই ঘ্রাণটা “মিয়াগি” ছাড়া আর কারো হওয়ার কথা না।

একমাত্র আমারই পরিস্থিতিটা হজম করতে সমস্যা হচ্ছিল না। হয়তোবা
আমার চারপাশের সবারই একইভাবে বিমূঢ় এবং অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তারা
সম্ভবত ভাবছিল, “মিয়াগি মেয়েটার না অস্তিত্বহীন হওয়ার কথা ছিল?”

আমি ওদের সবার প্রতিক্রিয়া দেখে স্তব্ধ হয়ে চুপ হয়ে গেলাম। সবাই
মিয়াগিকে দেখতে পারছে।

“আপনি নিশ্চয় মিস. মিয়াগি?” জার্সি পরিহিত একজন লোক ত্রস্তভাবে
জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ। আমিই সেই অকাজের মিয়াগি।” মিয়াগি উত্তর দিলো।

লোকটা আমার কাঁধে চাপড় দিলো।

“সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া!” লোকটা হাসতে লাগল। “কে জানতো, ওর
সত্যি সত্যি অস্তিত্ব আছে। আর আপনি সত্যি খুব সুন্দরী, মিস. মিয়াগি! আমি
ঈর্ষান্বিত!”

কিন্তু আমি তখনো বুঝতে পারছিলাম না কী ঘটছে।

মিয়াগি এখানে কী করছে? কেন অন্যান্য লোকজন ওকে দেখতে পারছে?

“তাহলে, মিস. মিয়াগি... সত্যি মিস... মিয়াগি” হাই স্কুলের মেয়েটা বড় বড় চোখে বলল। “...হ্যাঁ। কিভাবে যেন, আমি আপনাকে যেভাবে কল্পনা করেছিলাম আপনি ঠিক সেরকমই।”

আশাকুরা ভিড়ের পিছন থেকে আমাদের একা থাকতে দেওয়ার পরামর্শ দিলো সবাইকে। তো লোকজন আমাদের নিয়ে তামাশা করে এবং অভিনন্দন জানিয়ে একজন দু’জন করে চলে যেতে লাগল।

আমি আশাকুরাকে ধন্যবাদ জানালাম।

“আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম আমি যে ধরনের মেয়েদের পছন্দ করি মিয়াগি সত্যিই সেই ধরনের মেয়েই হবে” আশাকুরা হেসে বলল। “তোমরা দুজনে, সুখী হও।”

এরপরেই আমরা একা হয়ে গেলাম।

মিয়াগি আমার হাত তুলে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে লাগল।

“অদ্ভুত, তাই না? কিভাবে আমি এখানে আসলাম? কিভাবে সবাই আমাকে দেখতে পাচ্ছে?...খুবই সহজ। আমি একই কাজ করেছি যা আপনি করেছিলেন।”

“একই কাজ?”

কয়েক মুহূর্ত পরে, আমি বুঝতে পারলাম ও কি বোঝাতে চাচ্ছে।

“কত দামে... তুমি বিক্রি করেছো?”

“একই দামে। আমি সবটুকুই বিক্রি করে দিয়েছি। তিনদিন বাদে সবগুলো দিন।”

আমার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

“আপনি আপনার আয়ুষ্কাল বিক্রির পরেই, অন্য পর্যবেক্ষকটা আমার সাথে যোগাযোগ করে। সে আমাকে বলল আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করার জন্য আরও আয়ুষ্কাল বিক্রি করেছেন। কথাটা শোনার সাথে সাথেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম। উনিই বাকি আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেছেন।”

আমি নিশ্চিত আমার দুঃখ পাওয়া উচিত।

যে মানুষটাকে রক্ষা করার জন্য আমি সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিলাম, সে আমার ইচ্ছার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং নিজের জীবন ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে। আমার দুঃখ পাওয়া উচিত।

অথচ, আমার সুখী সুখী লাগছে।

ওর বিশ্বাসঘাতকতা, ওর বোকামি, এখন আমার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়েও বেশি প্রিয় লাগছে।

মিয়াগি আমার পাশে বসে, আমার গায়ে হেলান দিলো।

“দারুণ কাজ দেখিয়েছেন, মি. কুসুনোকি। মাত্র ত্রিশ দিনেই আমার বাকি জীবন প্রায় কিনে ফেলেছেন... আমি খুবই দুঃখিত। আপনি আমার জন্য এত কষ্ট করেছিলেন আর আমি সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে এলাম। আমি সত্যি বোকা একটা মেয়ে।”

“বোকা?” আমি বলল। “আমিই বোকা। আমি এমনকি তিনদিনও তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারতাম না, মিয়াগি। আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমি কী করবো।”

মিয়াগি সুখের হাসি দিলো। তার পরে ওর চিবুক আমার কাঁধে রাখল।

“আপনাকে ধন্যবাদ, আমার জীবনের মূল্য কিছুটা বেড়েছিল। তো বাকি ঋণ পরিশোধ করার পরেও, আগামী তিনদিন চলার পরেও বেশ কিছু টাকা থেকে যাবে আমাদের হাতে।”

“তাহলে আমরা এখন ধনী” মিয়াগিকে জড়িয়ে ধরে এবং ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম আমি।

“হ্যাঁ, আমরা ধনী।” মিয়াগি উত্তর দিলো।

আবারো চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে এলো। মিয়াগিও আমার মতো অবস্থা। আমি এতে কিছু মনে করলাম না।

মারা যাওয়ার সময় আমি কিছুই পেছনে ফেলে যাবো না।

হয়তো কিছু কৌতূহলী মানুষ আমাকে বোকা হিসাবে মনে রাখবে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই আমাকে ভুলে যাবে।

এতে আমার কিছু যায় আসে না।

একদা এক সময়ে যে অমরত্ব আমার স্বপ্ন ছিল, সেটার আর কোনো প্রয়োজন নেই আমার।

কেউ যদি আমাকে মনেও না রাখে তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।

কারণ, ও আমার সাথে আছে, পাশে বসে হাসছে।

শুধু একারণেই, আমি অন্য সবকিছুভুলে যেতে পারি।

“তো, মি. কুসুনোকি।”

মিয়াগি সামনে এগিয়ে গিয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে একটা মিষ্টি হাসি

দিলো ।

“এই তিনদিন কিভাবে কাটাবেন বলে ঠিক করেছেন?”

মর্মান্তিক যে ত্রিশ বছর আমাকে কাটাতে হতো, তার সাথে তুলনা করে আমি এই তিনটে দিনকে বিশ্বাস করি ।

যে উপযুক্ত ত্রিশ দিন আমাক কাটাতে হতো, তার সাথে তুলনা করেও এই তিন দিন অনেক, অনেক, অনেক বেশি মূল্যবান ।

(সমাপ্ত)